শ্রীহট্টের অন্তর্গত বেগমপুর নিবাসী

সাধক শরচ্চন্দ্র

একাধারে কবি, স্বদেশ প্রেমিক ও গুপ্তসাধক ৺শরচ্চন্দ্র
চৌধুরী মহাশয়ের জীবনবৃত্ত)

শ্রীফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ কর্ত্তৃক প্রণীত।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

সন ১৩৩৬ সাল

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র

স্বদেশ-প্রেমিক, কবি ও সাধকপ্রবর ৺শরচ্চন্দ্র।

উৎসর্গ পত্র।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুদেব!

জানিনা পূর্ব্বজন্মের কোন্ পুণ্যফলে এ জীবনে আপনার ন্যায় সদ্‌গুরুলাভ ঘটিয়াছিল। আপনি নশ্বর শরীর ত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু এখনও বুঝিতে পারি, আপনি সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

আমার এমন ক্ষমতা নাই, যে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পবিত্র জীবন আমি ব্যাখ্যা করি; কিন্তু যেরূপেই হউক, আপনারই কৃপায়—আপনার যা কিছু কথা জানি বা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। এ জিনিষ আর কাহাকে উৎসর্গ করিব? যিনি আমার হৃদয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন, যিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণকমলে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা, আপনার বড় স্নেহের,
১৯শে মাঘ, ১৩৩৬ সাল। ফণীন্দ্র।

জয় ৺শ্রীশ্রীবিশ্বমাতা।

জয় ৺গুরুদেব।

নিবেদন।

প্রায় তিন বৎসর হইল পরমারাধ্য গুরুদেব পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে ৺শ্রীশ্রীবিশ্বমাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। পূতসলিলা ভাগীরথী কূলে মণিকর্ণিকা তীর্থে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে; এবং তাঁহার পবিত্র আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়াছে।

সেই মাতৃ-সাধক আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র আদর্শ-জীবন সাধারণের শিক্ষার বিষয়ীভূত রহিয়াছে ও থাকিবে। জীবনী লেখার প্রয়োজন সাধারণের শিক্ষালাভ। বিদ্যা-লাভের অদম্য পিপাসা কিরূপে গুরুদেবকে চালিত করিয়াছিল, কত কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, পরে সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে কতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার কবিত্বশক্তির কতদূর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, স্বদেশকে কতদূর প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, দেশের হিতের জন্য কতদূর পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কিরূপ স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন, এই সমস্ত দেখাইবার জন্য, এবং তাঁহার সাধনের

বিষয় যতটুকু আমি বুঝিতে পারিয়াছি এবং যাহাদ্বারা জনসাধারণের কিছু মঙ্গল হইতে পারে, সেই সকল বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

গুরুদেব শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী হইয়াও পশ্চিমবঙ্গে জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছিলেন, সেজন্য এদেশবাসীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক হইয়াছিল। 'শিক্ষাপরিচর' নামক পত্রিকার সম্পাদক ও 'দেবীযুদ্ধ' প্রণেতা বলিয়া বাঙ্গালার বহু সাহিত্যসেবীর সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় আমার নিজের ভাষার উপর দখল নাই, আজীবন সরকারী কার্য্যে সময় কাটাইয়া বৃদ্ধবয়সে এই নূতন কাজের ভার লইতে বাধ্য হইয়াছি। গুরুদেবের নাম স্মরণ করিয়া বহুদিবস পূর্ব্বে এই কার্য্যে ব্রতী হই। তাঁহারই কৃপায় এই কার্য্য শেষ করিতে পারিলাম। এই পুস্তকে কেবল কোনপ্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। উপযুক্ত হস্তে পড়িলে এই জিনিষটাই কত সুন্দর হইত! অল্পদিন হইল গুরুদেবের নিজ হস্তলিখিত কিছু কাগজাদি পাওয়ায়, যতদূর সাধ্য তাঁহার নিজের কথা তাঁহার নিজভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

এ পুস্তক লিখিবার কতক উপকরণ শ্রীহট্টের মাসিক পত্রিকা "কমলা"র শরচ্চন্দ্র সংখ্যা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিতবর সংন্যস্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের চেষ্টাতেই ঐ "শরচ্চন্দ্র" সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি এবং তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পাবনা, তাঁতিবন্দের জমীদার ও গুরুদেবের গুরুভাই শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের ও

পাবনার পণ্ডিত ও গুরুদেবের বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতেও এই পুস্তকের কিছু উপকরণ পাইয়াছি।

জহুরী না হইলে জহর চিনিতে পারে না; গুরুদেব সাধনপথে কঁতদুর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই; এবং তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনাও আমি জানিতে পারি নাই। সেই কারণে সাধুদিগের মধ্যে তাঁহার কিরূপ আসন পাওয়া উচিত, তাহা আমি ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারি নাই। তবে তিনি আমার গুরু ছিলেন, আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তাহাতে আমি তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিব।

এই পুস্তক ছাপা হইবার সময় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি; তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ পরমারাধ্য পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সংন্যস্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের এক ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাহাও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইল।

যদি এই জীবনী পাঠ করিয়া কাহারও কিছু উপকার হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।

৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯শে মাঘ, ১৩৩৬ সাল। শ্রীফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

সাধক শরচ্চন্দ্র চৌধুরী তাঁহার ধর্ম্মজীবনে আমার পরিচিত ছিলেন। আমার সহিত এই ভট্টপল্লী গ্রামেই তাঁহার প্রথম পরিচয়, তিনি তখন উত্তরপাড়ায় অধ্যাপনা করিতেন। আমাদিগকে দেখিবার জন্যই তিনি আমাদিগের গ্রামে শুভাগমন করেন।

মধুর আলাপ, ভক্তিবীণারণিতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের আনন্দপূর্ণতা প্রতি পদে প্রকাশ করিয়াছিল।

আমি তৎপূর্ব্বে ইংরাজীশিক্ষিতের মধ্যে ঐ প্রকার ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

আমার স্মরণ হয়, সে সময়ে তাঁহার 'শিক্ষাপরিচয়' প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার বংশপরিচয় তিনি স্বয়ং দিয়াছেন। শ্রীহট্ট প্রদেশে আমার প্রিয় ছাত্রের বাস, তৎসূত্রেও আমি চৌধুরীবংশের পরিচয় জ্ঞাত আছি। শরচ্চন্দ্র শ্রীহট্টের সুবিখ্যাত সমাজের এক সাধকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাধনার যে স্তরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা একালে সাধারণতঃ দুর্লভ।

এখন মিথ্যাই লোকের সর্ব্বস্ব। কতপ্রকার কৌশলময় মিথ্যার আশ্রয়ে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী, কত ভণ্ড সাধু সাজিয়া ভ্রান্ত জনগণের নিকট হইতে অর্চ্চনা গ্রহণ করিতেছে, যোগের কসরত দেখাইয়া সিদ্ধনাম অর্জ্জন করিতেও দু'চার জনকে অগ্রসর দেখিতেছি;

ত্যাগের আবরণে ভোগ্য আহরণের যত্ন, নিবৃত্তির আচ্ছাদনে দুষ্প্রবৃত্তির পূরণ, ধর্ম্মের জবনিকায় অধর্ম্মের নিগূহন এখন বহুস্থলেই পরিদৃশ্যমান,— এ সময়ে নীরব সাধক শরচ্চন্দ্র—সত্যশ্রদ্ধালু অকপট সাধক শরচ্চন্দ্র— আড়ম্বরহীন তপঃপরায়ণ শরচ্চন্দ্র যে কত দুর্ল্লভরত্ন তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ ব্যতীত অন্যে বুঝিবে না। তাঁহার ভক্তশিষ্য অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি এবং তপঃপূত পিতৃপুণ্যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহাতে আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি।

'যোগের কসরত' কথাটা যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন ইহার একটু ব্যাখ্যা করা ভাল। যোগবলে অভীষ্ট সাধন করা যায়, যোগপ্রভাবে মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত হয়, ইহা সত্য কথা। কিন্তু অধিকারীর স্বরূপ অনুসারে তাহাতে বিপরীত ফলও হয়। যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিভূতিলাভ নহে, আত্মদর্শনই প্রকৃত উদ্দেশ্য, —মুক্তিলাভ তাহারই ফল। প্রকৃত মুমুক্ষু ত্যাগীপুরুষ না হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভূতিদ্বারা লোকের নিকট আত্ম-প্রতিষ্ঠা সাধনই তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। এই প্রকার বিভূতি প্রদর্শনকেই আমি 'যোগের কসরত' বলিয়াছি। দৃষ্টিস্থৈর্য্য ত নীচুদরের কসরত্। দুটী বাঁশ বিশ ত্রিশ হাত অন্তরে মাটীতে প্রোথিত করিয়া দশ হাত বা তদধিক উচ্চে সেই দুটী বাঁশে এক গাছি সরু দড়ি বাঁধিয়া বিনা অবলম্বনে সেই দড়ির উপর দিয়া বাজীকরের সঞ্চরণদর্শনেও লোকে বিস্মিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতির নিদর্শন নহে, ধর্ম্মের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ যোগের দ্বারা বিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদিত হইলেও তাহা বহুস্থলেই আধ্যাত্মিক উন্নতির নিদর্শন নহে, ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, লোকপ্রতিষ্ঠা ও অর্থের সহিতই তাহার সম্বন্ধ। একজন তিব্বত প্রত্যাগত সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি, তিব্বতে

এইরূপ 'কসরত্' বা মুদ্রাদি প্রদর্শনে অর্থার্জ্জন অনেকেই করিয়া থাকে। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সময়ে সাধু হরিদাসের অলৌকিক কার্য্যাবলী যেমন বিস্ময়াবহ এবং অবিশ্বাসীর ধর্ম্মবিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছিল, পরে তাঁহারই অচিন্তিত লাম্পট্য ততোঽধিক বিস্ময় ও অবিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল। সাধু হরিদাস ৪০ দিন মাটিচাপা ছিলেন—এমন প্রাণায়াম-সিদ্ধও কামিনীমোহে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিভূতিপ্রদর্শন-ব্যাপার হইতেই আভ্যন্তরিক কামনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, লাম্পট্যে তাহার পূর্ণবিকাশ। এই প্রকার যে বিভূতিপ্রদর্শন তাহাকেই আমি 'কসরত্' বলিয়াছি, ইহাই বেদিয়ার বাঁশবাজির ন্যায় আধ্যাত্মিকতার পন্থার সহিত একেবারেই নিঃসম্বন্ধ।

সাধক শরচ্চন্দ্রের এরূপ 'কসরত্' দেখান ছিল না। তাঁহার মনে, ভগবদ্ভক্তির একটা পূতধারা সদাই প্রবাহিত ছিল। সত্যভ্রষ্ট সমাজে, বুজরুকের মহিমবিভ্রান্ত দেশে এইরূপ সাধকের জীবনকথা প্রচার আবশ্যক বলিয়াই মনে করি। তাঁহার বাল্যজীবন হইতে মরণ পর্য্যন্ত তাঁহার ইষ্ট দেবী ৺বিশ্বমাতা তাঁহার সংসর্গাদিজনিত আংশিক বৈষম্য কেমন সুকৌশলে দূর করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে উন্নত করিয়াছিলেন,—তাহার একটা ক্রমসূত্র তাঁহার জীবনকথায় অনুস্যূত আছে। সাধক শরচ্চন্দ্রের ভক্ত-শিষ্য শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এই জীবনকথা প্রণয়ন করায় মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে। ভক্তির আতিশয্যে গুরুজীবনীতে একটি অতিরঞ্জিত কথা বা অসত্যসংমিশ্রণ তিনি করেন নাই। সদা সত্যনিষ্ঠ ফণীন্দ্রবাবুর এই যে বৈশিষ্ট্য ইহাই সত্যপরায়ণ শরচ্চন্দ্র জীবনকথা প্রণয়নে সম্যক উপযুক্ততা অর্পণ করিয়াছে। ইহার জন্যই আমি মণিকাঞ্চন যোগ বলিয়াছি। শরচ্চন্দ্রের দেশভক্তি, শরচ্চন্দ্রের কবিত্ব ও শরচ্চন্দ্রের ভাবুকতা—সাধনার অমৃতনির্ঝরে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সাধক

শরচ্চন্দ্রই করিয়াছে,—জীবনীরচয়িতার এই নামকরণেও আমার তৃপ্তি হইয়াছে।

আমার আনন্দ বা আমার তৃপ্তিতে দেশের উপকার নাই, যুবকগণের হৃদয়ে তাঁহাদিগেরই মত ইংরাজশিক্ষিত দেশভক্ত সৎপুরুষের চরিত্রচিত্র যদি অল্পমাত্রও অঙ্কিত হয় তাহা হইলে জাতির কল্যাণের আশা করা যায়। ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণে জাতির কল্যাণ হয় না, ইহাই আমার বিশ্বাস। পরিশেষে আশীর্ব্বাদ করি,—ফণীন্দ্রবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার জীবনে আরব্ধ সাধনার পূর্ণতা লাভ করুন। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

শুদ্ধিপত্র।

(অশুদ্ধ স্থানগুলি সংশোধন করিয়া লইয়া পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিবেন)

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১১	দস্পাতি	দম্পতি
১১	১	ভিক্ষা	শিক্ষা
১৬	১২	আক্রোশের	আক্রোশের
২২	১৮	ত্রুমে	ক্রমে
৩৯	২০	অনিষ্ঠৈই	অনিষ্টেই
৪৮	১৪	জ্বালায়	জ্বালায়
৭৮	১৮	সাধুরনিন্দকং	সাধুরনিন্দকঃ
৮০	২৩	মাই	নাই
৮৭	১০	পুরুষার্থান্	পুরুষোহর্থান্
৯১	১৯	সুখমরোগিনী	সুখমরোগিণী
৯২	৩	গৃহকৃতা	গৃহকৃত্যং
৯২	৪	গৃহদেবতা	গৃহদেবতাং
৯২	৫	গৃহকৃত্যং	গৃহকৃত্যো
৯২	৬	অতিথিন্	অতিথীন্
১৩৫	২	ভা ত	ভারত
১৩৫	১০	কাত্যায়ণী	কাত্যায়নী
২০৭	৯	সমর্পনং	সমর্পণং
২০৭	১৭	দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা
২০৮	২	স্কটিকালি	স্ফটিকালি
২০৮	১০	ত্রিনয়না	ত্রিনয়না
২০৮	১৪	নিখল	নিখিল
২০৮	১৫	বিম্নাশ্চ	বিম্নাংশ্চ
২০৮	১৭	পিশাচকেরুনিকর	পিশাচফেরুনিকর
২১০	৭	স্বীকুমম্ব	স্বীকুর্বম্ব

সাধক শরচ্চন্দ্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

—:০:—

সুকবি সাধক ও মহাপ্রাণ ৺শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী সুদূর শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত (সহর হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত) বেগমপুর নামক গ্রামে ১৭৭৩ শকাব্দে ২৮শে আষাঢ় তারিখে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশপরিচয় যতদূর পাইয়াছি তাহা এই :—

তাঁহার পিতৃদেব ৺বলরাম শর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় অতি সদাচার-পরায়ণ ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মাতা ৺নারায়ণী দেবী দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহিণী হইলেও, যে সমস্ত সদ্‌গুণ রমণীর ভূষণ, তাহার সকল গুলিই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাদের সামান্য জমিজমা ছিল। তাহা হইতেই কোনরূপে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত।

বংশের ইতিহাস ও গ্রামের নাম সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র নিজে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজ ভাষাই এখানে উদ্ধৃত করা উপযুক্ত মনে করিলাম :—

"এই বংশের বীজপুরুষ আদিদেব। ইহা তাঁহার নাম কি বংশ-প্রবর্ত্তক বলিয়া উপনামে বর্ণনামাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ। আমি সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন মনে করি, যাহাতে যাঁহার পরিচয় সেই তাঁহার নাম। আদিদেব ঘোর সাধক ছিলেন, এবং তাঁহার নিবাস কান্যকুব্জে ছিল। তিনি সস্ত্রীক ভৈরব ভৈরবী বেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন। চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়া কামাখ্যা গমন মানসে বরবক্র (যাহাকে বরাক বলে) পার হইয়া আদিদেবী (আদিদেবের স্ত্রী) পথভ্রমণে অসমর্থ হইয়া বৃক্ষ-তলে উপবেশন করিলেন। আদিদেব তখন কিরূপ নিরাশ্রয় ও বিপন্ন তাহা কল্পনাতেও ধারণা করা কঠিন। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন হইলেন ও ধর্ণা দিলেন। ৺মা আর থাকিতে পারিলেন না, বিপন্ন সন্তানকে দর্শন দিলেন, এবং ঐ স্থানেই বাস করিবার জন্য আদেশ করিলেন। আদিদেব তখন কাঁদিয়া ব্যাকুল। বড় সাধের কামাখ্যা দর্শন ঘটিল না, বিশেষতঃ পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে স্বদেশ ছাড়িয়া বাস, উভয়ই অসহ্য। দেবী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "এ জন্মে তোর কামাখ্যা দর্শন ঘটিবে না, বৃথা চেষ্টা। আর চলিলে তোর স্ত্রীর মৃত্যু হইবে, তুই নির্ব্বংশ হইবি। 'পাণ্ডব-বর্জ্জিত' একটা কথার কথা,

সাধকের কাছে সর্ব্বস্থানই তুল্য। আমি বর দিলাম, এই স্থানেই তোর গঙ্গা দর্শন ঘটিবে।" এই কথা শুনিয়া আদিদেব বরবক্রতীরে যাইয়া আবার ধরণা দিলেন, এবং মূর্ত্তিমতী গঙ্গা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। বরে গঙ্গাদর্শন হইল, এইজন্য স্নানস্থানের নাম হইল বরগঙ্গা বা বুরুঙ্গা।

" বরবক্র বা বরাকের গতি এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তখনকার বরাকের খাত এখন বুড়ী বরাক বলিয়া পরিচিত।

"হিরণ্যগর্ভে ছয়, সদাশিবে নয়,
মায়ের শাপে আট পুরুষ একপিণ্ডা রয়।"

"রচয়িতা কে জানিবার উপায় নাই, এই কবিতার অর্থ, আদিদেব হইতে হিরণ্যগর্ভ ষষ্ঠ পুরুষ এবং সদাশিব নবম পুরুষ। আদিদেবের পুত্র হইতে সদাশিব পর্য্যন্ত আট পুরুষ একপিণ্ডা বা একান্নয়ী অর্থাৎ বংশের মধ্যে পিণ্ডদানের যোগ্য একটী মাত্র পুরুষই থাকিতেন, অথবা পিণ্ডদানার্থ একটী মাত্র পুরুষেরই বংশ থাকিত। 'মায়ের শাপে'—কাহার মা কাহাকে শাপ দিলেন, জানিবার উপায় নাই।

"হিরণ্যগর্ভের কন্যা চণ্ডীদেবী সর্ব্বগুণবতী, অধিকন্তু গঙ্গার সঙ্গে তাঁহার 'ভইনালা' (সখি সম্পর্ক)। তাঁহার অনুরূপ পাত্রের অনুসন্ধান হইতেছে, এমন সময়ে কান্যকুব্জবাসী যুবক ব্রাহ্মণ মধুকর মিশ্র তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং চণ্ডী-দেবীকে বিবাহ করিয়া এখানেই স্থিতিলাভ করিলেন। কন্যা-জামাতার বাসের জন্য হিরণ্যগর্ভ 'চণ্ডীডহরের' পশ্চিম তটে ভূমি দান করিলেন। চণ্ডীপুর এখনও বিদ্যমান। ('ডহর' প্রাদেশিক শব্দ, অর্থ—নদীর মধ্যে ভীষণ আবর্ত্তময় গভীর স্থান)। এই চণ্ডীডহরেই নাকি গঙ্গার সঙ্গে চণ্ডীদেবীর দেখা সাক্ষাৎ হইত। অধমতারণ পতিতপাবন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ এই চণ্ডীদেবীরই প্রপৌত্র।

"চণ্ডীপুর নামমাত্র হইল, কিন্তু মধুকর মিশ্র ও তাঁহার বংশধরেরা নিজ বুরুঙ্গাতেই রহিলেন এবং ক্রমে তাঁহাদের বংশবিস্তার হইতে লাগিল।

"এদিকে সদাশিব একাকী মাত্র। তিনি সর্ব্বদা জপতপ লইয়াই থাকিতেন, বিষয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হইতেন না; এবং সেজন্য বিবাদ-বিসম্বাদও ভালবাসিতেন না। অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সহধর্ম্মিণীকে দেশত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন; এবং উভয়ের মত একরূপ হওয়াতে কেবল মালা ও একটী ত্রিশূল মাত্র সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক পিতৃবাস পরিত্যাগ করিলেন।

"সদাশিব-পত্নী একে পর্য্যটনে অনভ্যস্তা, তাহাতে অন্তঃসত্বা, সুতরাং নলবনের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ পথে ক্রোশমাত্র চলিয়াই অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সদাশিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ, পিতৃবাসে আর ফিরিলেন না। এদিকে সহধর্ম্মিণী চলিতে একান্ত অসমর্থ, কি করেন! অগত্যা সেই স্থানেই ত্রিশূল প্রোথিত করিলেন, এবং শুষ্ক নল-খাগে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া জপে মন দিলেন।

"আদিদেব হইতে সদাশিব পর্য্যন্ত নয় পুরুষে অন্যূন তিনশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, শ্রীহট্টের শেষ স্বাধীন নৃপতি গৌরগোবিন্দ স্বাধীনতার সঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; শ্রীহট্টে ইস্লাম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময়ে নবাব চাঁদ খাঁ নামক প্রবলপ্রতাপ অথচ অত্যন্ত সদাশয় একজন ভূম্যধিকারী মোক্তারপুরে বর্ত্তমান ছিলেন। নবাব চাঁদ খাঁর এক প্রাচীন দীঘি এখনও মোক্তারপুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

"নবাব চাঁদ খাঁ একটী গর্ভবতী অশ্বিনী আরোহণ করিয়া কয়েকজন অনুচর সহ ভ্রমণ করিতেছিলেন। দূর হইতে জঙ্গলের মধ্যে ধূমরাশি দেখিতে পাইয়া কৌতূহল বশতঃ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং সেই

তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ দম্পতীকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসায় সমস্ত অবগত হইয়া, তাঁহার বিস্ময়ের স্থানে দয়ার উদ্রেক হইল এবং উহাদিগকে নিরাপদ রাখিবার জন্য দুইজন অনুচরের উপর প্রহরার ভার দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কথিত আছে, একজন মোসাহেব বিদ্রূপ করিয়া সদাশিবকে জিজ্ঞাসা করে, 'বলত তপস্বী ঠাকুর, এই ঘোটকীর কি বাচ্চা হইবে?' সদাশিব বিরক্ত না হইয়া হাসিয়া বলিলেন, 'এই অশ্বিনী একটী অশ্ব প্রসব করিবে।' কয়েকদিন পরে তাহাই হইল, এবং নবাব তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট সমস্ত ঘটনা গল্প করিলেন। নবাবপত্নী অনেকগুলি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র-মুখ একবারও দর্শন করেন নাই। গল্প শুনিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি বেগম সাহেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং ব্রাহ্মণের নিকট একবার লইয়া যাইবার জন্য স্বামীর নিকট নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃ পুনঃ তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"তাহাই হইল; একদিন সস্ত্রীক নবাব ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরস্পর অভিভাষণের পর বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন তো ঠাকুর, আমার গর্ভে এবার কি সন্তান হইবে? আমি পুত্রের কাঙ্গালিনী।' সদাশিব বলিলেন 'মা আমি গণক নই, জ্যোতিষীও নই, তবে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি এবার পুত্রমুখ দর্শন কর।' আশীর্ব্বাদ পাইয়া নবাবপত্নী হৃষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে সদাশিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং তখন নবাবের আদেশে জঙ্গল পরিষ্কৃত ও সদাশিবের পরিবারের জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত 'জঙ্গলে মঙ্গল' হইতে লাগিল। কালক্রমে নবাবপত্নীও একটি পুত্র প্রসব করিলে, তৎক্ষণাৎ সদাশিবের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল, এবং আনন্দ কোলাহলে নবাবপুরী টলমল করিতে লাগিল।

সূতিকা সময়ের অবসানে বেগমের প্রথম কার্য্যই—পুত্র কোলে লইয়া সদাশিব সন্দর্শন করা ; বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সহকারে নবাব ও নবাবপত্নী নবজাত পুত্র লইয়া সেই গৃহ-সম্পত্তি-সহচরহীন ব্রাহ্মণ দম্পতীর বনাশ্রমে চলিয়াছেন। ভাবিলে কলির বহুপূর্ব্বের সুদক্ষিণা দিলীপাদির কথাই মনে পড়ে ; সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নবাবপত্নী সদাশিবকে পুত্র দেখাইলেন ও আশীর্ব্বাদ লইলেন ; তাহার পরে তাঁহার পদপ্রান্তে একখানি সনন্দ রাখিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, 'বাবা, আপনি মাকে লইয়া এইখানে বাস করিবেন, আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া দর্শন করিয়া যাইব, কন্যার এই অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। এই জন্য যে বন্দোবস্ত করিলাম তাহা এই সনন্দে লিখিত রহিল।' ব্রাহ্মণ-দম্পতি আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, রুদ্ধকণ্ঠে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কেবল অতিকষ্টে 'তথাস্তু' বলিয়া সনন্দখানি সদাশিব তুলিয়া লইলেন।

"সদাশিব এখন বিরলে থাকিয়া প্রকৃতই সুখী হইলেন। এখন আর বিষয়ের কচকচি নাই, বিবাদ বিসম্বাদ নাই, এখন তিনি ইচ্ছামত স্বাধীন-ভাবে সাধন ভজন ও সংসারের কার্য্য সম্পাদনে অবসর পাইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রেই উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন মনে করিয়া আপনার বাসস্থানকে 'বেগমপুর' আখ্যা প্রদান করিলেন, এবং অব্যবহিত দক্ষিণভাগকে 'নবাবপুর' বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন। কালে বেগম-পুর গ্রামে পরিণত হইল, নবাবপুর চিরদিনই কৃষিক্ষেত্র রহিয়া গেল। গ্রামের পূর্ব্বদিকে সদাশিবের বাড়ীর ভিটা ও পুষ্করিণীর নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাই 'বেগমপুর' নামের ইতিহাস। এই ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামের যাবনিক নাম কেন, আমরাই বা কেন এই নামের এত পক্ষপাতী ? এই প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন ; কিন্তু যখন তাঁহারা এই

সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ও যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে।

"সদাশিব বেগমপুরে আসিয়া বুঝি শাপবিমুক্ত হইলেন; তাঁহার বংশ আর একপিণ্ডা রহিল না। বাসুদেব, বাচস্পতি ও রতিকান্ত নামে তাঁহার তিন পুত্র জন্মিল এবং পুত্রদিগের শাখা প্রশাখা ক্রমে বিপুল বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল।

"এই বংশে ভীমকায় বীরপুরুষ অনেক জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের বীরত্ব এবং আহারের অনেক অমানুষিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে এই বংশ মহাকায় বীরশূন্য হইয়াছে। ইনি হাটে গেলে ইঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন হইত না; জনসঙ্ঘের উপরে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে, ইঁনি যেখানেই থাকুন ইঁহার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত। আহার ও শক্তি দেহের অনুরূপ ছিল। অঙ্কে ইঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল, অন্যে কাগজ কলমে দুই দণ্ড খাটিয়া যে অঙ্ক কসিলে হয়তো তাহাতেও ভুল থাকিয়া যাইত, ইঁনি দুই মিনিট মনে মনে চিন্তা করিয়াই তাহার অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া দিতেন। ইঁনি যেন গ্রামের জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন, কিছু প্রাচীন তথ্য জিজ্ঞাসিত হইলে মুখস্থের মত বলিয়া ফেলিতেন। এই প্রবন্ধোক্ত তথ্য তাঁহারই কথিত; বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইঁনি জীবিত থাকিতে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে নাই। ইনি অসাধারণ সাহসী এবং পরোপকারে অক্লান্ত ছিলেন, মৃত-সৎকারে সকলের অগ্রণী হইয়া সর্ব্বত্র উপস্থিত হইতেন। ইঁহার মৃত্যুও বড় আশ্চর্য্য,—শরীর অসুস্থ ছিল, স্নান করিতে ইচ্ছা করিলে সহধর্ম্মিণী উঠানে স্নান করাইয়া দিলেন, সেইখানেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া দিলেন, সেইখানেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া রৌদ্রের মধ্যে আসনে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন। পরিবার-

বর্গ দৌড়িয়া তাঁহাকে তুলিতে যাইয়া দেখিলেন, প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। এ বংশের কেহ কখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; কিন্তু একজন সাধক এ বংশে নিয়তই বর্ত্তমান থাকিতেন।

"লেখকের (অর্থাৎ স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্রের) এক খুল্লতাত শ্যামাচরণ চৌধুরী চিরকুমার ছিলেন; তিনি ফরিদপুরে থাকিতেন, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, সদাচার ও জপাদি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণকে ফরিদপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজে স্থান লাভ করিতে নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হইত না। লেখকের অন্যতম খুল্লতাত চিরকুমার রামকান্ত 'মুনি গোঁঞাই' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তবপ পরগণার বড়কান্দিগ্রাম হইতে নন্দনপুরের হাটে যাইতে রাস্তার বামপার্শ্বে 'মুনি গোঁঞাইর গাছ' বলিয়া পরিচিত একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। ইহা তাঁহারই রোপিত; এবং ইহারই পার্শ্বে অমৃতবৃত্তি অবলম্বন করিযা তিনি দিনরাত্রি জপে অতিবাহিত করিতেন। পরম পবিত্র তীর্থজ্ঞানে আমি (স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র) এই বৃক্ষটি দর্শন করিয়াছি। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী চিরকুমার থাকিয়া বহুকাল তীর্থ-ভ্রমণের পর বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। ইনি ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য একটি মিথ্যা কথা বলেন এবং তাহার পরেই অনুতাপে অন্নজল ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করেন, এবং প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে তিনি শয্যা ত্যাগ করেন নাই। একটি মিথ্যা-কথা তাঁহার কাছে এত গুরুতর ছিল যে প্রাণপাতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিলেন। চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এ বংশ সাধকবিহীন রহিয়াছে। কিন্তু সদাশিবের আজ্ঞা আছে, তাহার বংশ সাধক-বর্জ্জিত হইবে না।"

শ্রীহট্টের (অধুনা বিলুপ্ত) মাসিক পত্র "কমলা"র তৃতীয় বর্ষের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের "শরচ্চন্দ্র-সংখ্যা" হইতে এই সকল কথা উদ্ধৃত করিলাম। সেই স্বর্গীয় সাহিত্যিক ও সাধক প্রবরের নিজভাষা অপেক্ষা অন্যের ভাষা

মধুর হইতে পারে না, সেই জন্য তাঁহারই ভাষা উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রামের নাম বেগমপুর কেন হইল, ইহার ইতিহাস এবং বংশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকদের আবির্ভাবের বিষয় যে কত মধুর, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। উদ্ধৃত অংশের শেষভাগে লিখিত আছে চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এ বংশ সাধক বিহীন রহিয়াছে। অথচ শেষে ইহাও কথিত হইয়াছে, যে সদাশিবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার বংশ সাধক বর্জ্জিত হইবে না। সদাশিবের আজ্ঞার সত্যতা স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্রের জীবনেই রক্ষিত হইয়াছে, এ বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

শরচ্চন্দ্রের পিতার আর্থিক অবস্থা যে ভাল ছিল না, তাহা শরচ্চন্দ্রের বাল্যজীবন হইতেই প্রকাশ পায়। ৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গ্রাম্য পাঠশালায় শরচ্চন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। শরচ্চন্দ্রের ৬ বৎসর বয়সের সময়ই তাঁহার পিতা, ও চারিজন বড় ভাই, একই উৎকট ব্যাধিতে (বসন্ত রোগে) ইহলোক ত্যাগ করেন। শরচ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা চারি ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। কনিষ্ঠা রাজ্যেশ্বরীর স্বগ্রামেই ৺রুদ্রেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। রুদ্রেশ্বরের অবস্থাও ভাল ছিল না। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীআনন্দ কুমার তর্কবাগীশ, ৺রূপনাথ ভট্টাচার্য্য ও ৺প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য শরচ্চন্দ্রের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। শরচ্চন্দ্রের পিতা ও ভ্রাতাদের অবর্ত্তমানে ৺রুদ্রেশ্বর ভট্টাচার্য্যই বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করিতেন। বিবাহিতা ভগিনী ভিন্ন সংসারে কেবলমাত্র শরচ্চন্দ্রের দুঃখিনী মাতা থাকিলেন। সাংসারিক অবস্থা ভাল না থাকায় এবং কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ সংসারে না থাকায়, এই ক্ষুদ্র পরিবারের অবস্থা কিরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দুঃখিনী মাতা কখন অনাহারে, কখন বা অর্দ্ধাহারে, দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

৭।৮ বৎসর বয়সের সময় বালক শরচ্চন্দ্রের একবার সাংঘাতিক পীড়া হয়। বোধ হয় ম্যালেরিয়া জ্বর এবং তাহার সহিত প্লীহা বৃদ্ধিও ছিল। অনেক দিন ভুগিতেছিলেন এবং জীবনের আশা খুব কমই ছিল। হঠাৎ একটি সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বালক শরচ্চন্দ্রের ঔষধের ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সামান্য একটি দ্রব্য লইয়া ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং বালককে স্নান করাইয়া উহা খাওয়াইয়া দিবার পর বালক শরচ্চন্দ্র অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে সাধুটী চলিয়া যান। নিদ্রাভঙ্গের পর বিশেষভাবে ক্ষুধা বোধ হওয়ায় শরচ্চন্দ্র তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলেন। এই ঘটনার পরই তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

পঙ্গু উঝা কেশব ধর সেই সময় গ্রামের বালকদিগের শিক্ষক ছিলেন। শরচ্চন্দ্রের বাড়ীর সংলগ্ন পূর্ব্বের বাড়ীর নাম চাঁদরায়ের বাড়ী। উহা একটি ছাড়া বাড়ী ছিল অর্থাৎ তাহাতে অনেক দিন যাবত কেহ বাস করিত না। এই বাড়ীতেই কেশব উঝার পাঠশালা ছিল। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রায়ই ধূলাবালির সাহায্যে হইত। ঐ পাঠশালাতেই শরচ্চন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। ছাত্রদিগের মধ্যে শরচ্চন্দ্রের বুদ্ধি প্রখর ছিল; অল্পকালের মধ্যেই শরচ্চন্দ্রের ঐ পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইয়া গেল। শিক্ষালাভের ইচ্ছা বলবতী ছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ের অভাবে স্বগ্রামে শরচ্চন্দ্রের আর কোনরূপ শিক্ষালাভের সুবিধা হইল না। একাদশ বৎসর বয়সে ঐ পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলে মাতা নারায়ণী শরচ্চন্দ্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তখন শরচ্চন্দ্র কিরূপে মাতার দুঃখ মোচন করিবেন সেই চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িলেন; অথচ লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছাও তাঁহার প্রবল ছিল। শরচ্চন্দ্রের এক জ্ঞাতি ৺শম্ভুনাথ চৌধুরী তখন ছাতকে কার্য্য করিতেন (ছাতক ঐ

অঞ্চলে কমলার ব্যবসায় জন্য বিখ্যাত ছিল)। ভিক্ষালাভের সুবিধার আশায় শরচ্চন্দ্র মাতাকে না বলিয়া ছাতকে চলিয়া যান। সেখানেও কোনরূপ সুযোগ পাইলেন না। তখন বাটী হইতে ২০ মাইল দূরে শ্রীহট্ট সহরে চলিয়া যান। সেখানেও কেহই বালককে দুটী অন্ন দিয়া ঘরে রাখিতেও স্বীকৃত হইলেন না। দুই একদিন উপবাসেই কাটিয়া গেল। কি ভয়ানক অবস্থা !! পরে ৺তারিণী চরণ মুন্সী নামক এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন। সেখানে শরচ্চন্দ্রকে রন্ধনের কার্য্য করিতে হইত; অবসর পাইলে লেখাপড়া করিতেন। মুন্সী মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহাকে স্নেহ করিতেন এবং মাসে মাসে শরচ্চন্দ্রের মাতার নিকট ২।১টী টাকা পাঠাইয়া দিতেন। শরচ্চন্দ্রের মাতা জানাইলেন, তাঁহার পুত্র লেখাপড়া শিখিলে তিনি সবিশেষ আনন্দিতা হইবেন। শরচ্চন্দ্র সেখানে আর কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। শারদীয়া পূজার সময় মুন্সী মহাশয় বাসার সকলকেই লইয়া নিজ বাটীতে যাত্রা করিলেন। শরচ্চন্দ্র বাটী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মুন্সী মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই। অগত্যা দুঃখের সহিত শরচ্চন্দ্র তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন। কিছুদূর নৌকায় যাইয়া পদব্রজেও কিছু দূর যাইতে হইবে। মুন্সী মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীগণ নৌকা হইতে নামিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে, শরচ্চন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। এদিকে নারায়ণী দেবী আর নিজ বাটীতে বাস করিতে পারিলেন না। ঝড়ে তাঁহার বাসগৃহ পড়িয়া যাওয়ায় তিনি কনিষ্ঠা কন্যা রাজ্যেশ্বরীর বাটীতে গিয়া থাকিলেন।

পথিমধ্যে ময়মনসিংহ-যাত্রী একদল পণ্ডিতের সহিত শরচ্চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। শরচ্চন্দ্র একজন পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন। পথে ২।১ টাকা রোজগারও করিলেন। শরচ্চন্দ্র

যে পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনি পূজাপার্ব্বণ শেষ করিয়া ঢাকা জেলার কোনও গ্রাম হইতে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। শরচ্চন্দ্র ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হওয়ায়, সেইখানেই পড়িয়া রহিলেন। ভগবানের কৃপায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত খোর্সেদপুর-যাত্রী এক কর্ম্মকারের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি শরচ্চন্দ্রকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। শরচ্চন্দ্র সেই দয়াশীল কর্ম্মকারের সঙ্গে তদীয় কর্ম্মস্থান খোর্সেদপুরে উপস্থিত হইলেন। শরচ্চন্দ্রের অন্নদাতা নবদ্বীপচন্দ্র কর্ম্মকার পুত্র-সন্তানবিহীন ছিলেন; শরচ্চন্দ্র তাঁহাকে পিতা এবং তাঁহার স্ত্রীকে মাতা বলিয়া ডাকিতেন। আশ্রয় পাইয়া তিনি পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কর্ম্মকারের লোহার দোকান ছিল। শরচ্চন্দ্র কর্ম্মকারের অনুপস্থিতিতে দোকানের কাজ দেখিতেন এবং অবসরমত সামান্য লেখাপড়া করিতেন। সেই অন্নদাতার একটি কন্যা ছিল। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে সেই কন্যা শরচ্চন্দ্রকে ভ্রাতৃভাবে বরণ করিল। এই-রূপে কিছুদিন কাটিতে লাগিল।

বালক শরচ্চন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়, সৌজন্য ও সুশীলতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা গ্রামের প্রায় প্রত্যেক লোকেরই চিত্তা-কর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সেই পালকপিতা শরচ্চন্দ্রকে কুমারখালির মধ্য ইংরেজী ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই বিদ্যালয়েই তাঁহার নিয়মমত লেখাপড়া শিক্ষা আরম্ভ হইল। খোর্সেদপুর হইতে কুমারখালি স্কুলে বালক শরচ্চন্দ্রকে পদব্রজে যাতায়াত করিতে হইত, তজ্জন্য তিনি কোনরূপ বিচলিত হইতেন না।

দৈবদুর্বিপাকে শরচ্চন্দ্রের পালকপিতা ঋণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন; কিন্তু তথাপি সেই মহাপ্রাণ কর্ম্মকার শরচ্চন্দ্রকে ত্যাগ করিলেন না। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে উভয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল। বিধির কি আশ্চর্য্য

বিধান! কর্ম্মকারের অবস্থায় কুলাইত না বলিয়া, নিকটবর্ত্তী একজন তৈলব্যবসায়ী অনুগ্রহ করিয়া শরচ্চন্দ্রের পাঠের উপযোগী তৈল দিয়া সাহায্য করিত।

বালক শরচ্চন্দ্র তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও অধ্যবসায় বলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের উত্তম ছাত্রের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্রের বৃত্তি-পরীক্ষার দিন আগত হইল। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় কর্ম্মকারের একমাত্র কন্যা শত চেষ্টা সত্ত্বেও অর্দ্ধদিনের মধ্যে কলেরায় প্রাণত্যাগ করিল। ঐ অবস্থায় শরচ্চন্দ্রের পরীক্ষালয়ে যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে স্কুলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া শরচ্চন্দ্র বিষণ্নমনে বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন। জগজ্জননী বিশ্বমাতার কৃপা হইল। স্কুলের অধ্যক্ষ শরচ্চন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া পরীক্ষায় বসিতে আদেশ দিলেন। অধিকক্ষণ সময় পাইলেন না, তাহার উপর অনাহারে অনিদ্রায় শারীরিক অবস্থাও ভাল ছিলনা; সকল প্রশ্নের উত্তর করিবার সময় হইল না।

পরীক্ষা শেষ হইলে, পালকপিতা কর্ম্মকার দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। নিকটস্থ এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শরচ্চন্দ্রের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, কর্ম্মকার ও তাঁহার স্ত্রী দেশে ফিরিয়া গেলেন। শরচ্চন্দ্রের উপর তাঁহাদের মায়া পড়িয়াছিল, শরচ্চন্দ্রও তাঁহাদের পিতা-মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সুতরাং বিদায়কালে সকলেই বিশেষ ব্যথা পাইয়াছিলেন। কর্ম্মকার-পরিবারের সাহায্য না পাইলে, শরচ্চন্দ্রের লেখাপড়া শিক্ষার সুবিধা কতদূর হইত, ভগবানই জানিতেন। কর্ম্মকার-মাতার অভাবে শরচ্চন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতাকে স্মরণ হইতে লাগিল। কিন্তু পুনরায় যে নূতন মাতার আশ্রয় পাইলেন, তিনি শরচ্চন্দ্রকে নিজের পেটের সন্তানের মত মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম ৺হরসুন্দরী।

দেবী। তাঁহার এক পুত্রের নাম "লালন" ছিল। শরচ্চন্দ্রকে সকলেই "লালনের মার ধর্ম্মপুত" বলিয়া ডাকিত; এবং লালনের মা বলিতেন "শরৎ আমার ধর্ম্মসন্তান নয়, পেটের সন্তান, আমার শরৎকে হারাইয়া আমি এই শরৎকে পাইয়াছি।" লালনের এক ভাই ছিল, তাহারও নাম শরৎ,—কিন্তু সে জীবিত ছিলনা। লালনের মা শরচ্চন্দ্রকে খুবই আদর যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু শরচ্চন্দ্র তাঁহার গর্ভধারিণী মাতার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং বাড়ী রওনা হইলেন।

শরচ্চন্দ্র বাটি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতা ইহ জগতে নাই। শরচ্চন্দ্রের ভাগিনেয় আনন্দকুমার তর্কবাগীশ বলেন, শরচ্চন্দ্রের মাতা শরচ্চন্দ্রের জন্য নির্জ্জনে কত কাঁদিতেন,—কারণ একমাত্র পুত্র নিঃসহায অবস্থায় নিরুদ্দেশ ছিলেন। শরচ্চন্দ্র কোথায় ছিলেন বা কি করিতেছিলেন, নারায়ণী দেবী জীবিত থাকা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। দেবী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে আর শরচ্চন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। ৺নারায়ণী দেবী শেষ সময়ে পুত্রের অদর্শনে কতই না আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। তাই শরচ্চন্দ্রের মন মাতাকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়াছিল। সংসারে গর্ভধারিণী মাতার ন্যায় সাক্ষাৎ উপাস্য দেবতা আর কেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। শরচ্চন্দ্র মাতার অন্তর্দ্ধানে এবং শেষ সময়ে মাতৃসম্বন্ধীয় তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র তখন তাঁহার ভগিনীপতি রুদ্রেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, কারণ নিজ বাটিতে কোন ঘর দরজা ছিল না। একবার তাঁহার মনে হইল, যখন মা নাই তখন বাড়ীতেই বা কিরূপে থাকিবেন,—যদৃচ্ছা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাড়ীতে কিছুদিন থাকিতে হইল। সেই সময় খোর্দ্দপুর হইতে তাঁহার লালনদাদার (লালন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

এক পত্র পাইলেন। তাহাতে জানিলেন, যে তিনি খোর্সেদপুর স্কুলের মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছেন, এবং সরকার হইতে আদেশ হইয়াছে যে ঐ মাসে ভর্ত্তি না হইলে বৃত্তি বন্ধ হইবে।

সকলেই পরামর্শ দিলেন যে শরচ্চন্দ্রের যাওয়া উচিত, কারণ পড়া শুনা করিয়া মানুষ না হইলে পিতৃপুরুষের নাম বজায় থাকিবে না। কথাটা শরচ্চন্দ্রের মনে লাগিল। তাঁহার গর্ভধারিণী মাতার একান্ত ইচ্ছা ছিল, যে তিনি ভালরূপ লেখাপড়া শিখেন। মাতার ইচ্ছা স্মরণ করিয়া, পুনরায় শরচ্চন্দ্র খোর্সেদপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শরচ্চন্দ্রের অনেক মা ছিলেন। তন্মধ্যে ৺হরসুন্দরী দেবীকে "খোর্সেদপুরের মা" বলিয়া ডাকিতেন। হরসুন্দরী দেবী অনাথ শরচ্চন্দ্রকে কর্ম্মকার বাড়ীতে যখন প্রথম দেখেন, তখনই তাঁহার স্নেহ উথলিয়া উঠিয়াছিল, এবং কিছুদিন পরে তিনি আগ্রহ সহকারেই শরচ্চন্দ্রকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। এই ব্রাহ্মণ-বিধবা পূতচরিত্রা ও সাধন-শক্তি-সম্পন্না ছিলেন। তাঁহার সাধন-সম্পদের কথা অনেকেই জানিত। ইনি বালক শরচ্চন্দ্রকে নিজ সন্তানের ন্যায় নানা উপদেশ দিতেন এবং ইঁহারই কৃপায় ও উপদেশে বালক শরচ্চন্দ্রের মনে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শরচ্চন্দ্রের গুণে ও সরলতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। হরসুন্দরী নিজ পুত্র লালন অপেক্ষা শরচ্চন্দ্রকে অধিক যত্নের সহিত লালন পালন করিতেন। কিন্তু লালন-দাদা তজ্জন্য কোনরূপ ঈর্ষা বা আক্রোশের ভাব মনে পোষণ করিতেন না। শরচ্চন্দ্রও লালনদাদাকে সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন; সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার লালনদাদাও তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং ভালবাসিতেন।

খোর্সেদপুর স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত শরচ্চন্দ্র হর-সুন্দরী দেবী ও লালনচন্দ্রের নিকটই মনের সুখে বাস করিয়াছিলেন। এই উপকারের জন্য শরচ্চন্দ্র উঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন এবং দেহ-ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে ঐস্থান দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঐ পরিবারের খুব সুখ্যাতি করিতেন; এবং খোর্সেদপুরের মার আদর

যত্নের কথা ও তাঁহার সাধন-সম্পদের বিষয় বলিতে বলিতে বাষ্পবিগলিত ধারায় গদ্‌গদ্‌কণ্ঠ হইয়া যাইতেন।

খোসেদপুর স্কুলের পড়া শেষ করিয়া, শরচ্চন্দ্র পাবনায় যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ইচ্ছা ছিল সেখানে গিয়া সেখানকার উচ্চ ইংরাজী স্কুলে লেখাপড়া করিবেন। কিন্তু জগজ্জননীর ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। সেখানে তাঁহার ক্লাসের মাষ্টার তাঁহার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করিতে লাগিলেন। শরচ্চন্দ্রের সেখানে থাকিয়া পড়াশুনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অগত্যা তিনি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু বিদ্যালাভের তৃষ্ণা প্রবল থাকায় সেখানেও স্থির থাকিতে পারিলেন না। এক টোলে ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ইংরাজী শিক্ষার ইচ্ছাও বলবতী ছিল। তখন রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরীর দানশীলতা ও দরিদ্রের প্রতি দয়ার কথা শুনিয়া, তাঁহার আশ্রয় লইয়া বিদ্যা-শিক্ষা করার ইচ্ছা প্রবল হইল। ১২৭৯ সালে এক-খানি পরিধেয় বস্ত্র ও দুইটী পয়সা মাত্র সম্বল করিয়া বাটীর বাহির হইলেন। পদব্রজে ভিক্ষালব্ধ আহারে জীবিকা চালাইতে হইয়াছিল। পথে অনেক নদী পার হইতে হইয়াছিল, কিন্তু অর্থের অভাবে অনেক সময় সন্তরণ ভিন্ন নদী পার হইবার অন্য কোন উপায় ছিল না। একবার কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া নদীর ধারে পড়িয়াছিলেন। স্নানার্থে আগতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ৬মাতৃরূপী একজন তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্রা হইয়া নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার আরোগ্য বিধান করেন। ভিক্ষা না পাওয়ায় পথে কখন অনাহারে, কখন বা অর্দ্ধাহারে কাটাইতে হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় ১২৭৯ সালের ১৩ই ফাল্গুন তারিখে শরচ্চন্দ্র পুঁটিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন।

রাজসাহীর সাহিত্যিক, সুলেখক ও সর্ব্বজন-পরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু

২

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখানে অবিকল উদ্ধৃত হইল। তিনি "কমলা"তে এইরূপ লিখিয়াছেন :—
"প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর তিরোভাবের পর আর এক রাণী রাজসাহী প্রদেশে ধীরে ধীরে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি বাল-বিধবা ব্রহ্মচারিণী ছিলেন এবং অকাতরে দরিদ্র পালন করিতেন। তাঁহার দ্বার হইতে প্রার্থনাকারী বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। এই সকল কথা লোকমুখে পল্লবিত হইয়া বালক শরচ্চন্দ্রকে সেই দীন-পালিনীর আশ্রয় লইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল। তিনি প্রাতঃ-স্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী। রাজসাহীর অন্তঃর্গত পুঁটিয়ার রাজ-অন্তঃপুরে থাকিয়া বহুবিধ সৎকার্য্য সাধনে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র লোকমুখে পুঁটিয়া গমনের পথঘাটের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বহুক্লেশে পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার উৎসাহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহারাণীমাতার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহার নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করাও তাঁহার ন্যায় অনাথ বালকের পক্ষে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা বুঝিতে পারিয়াও, শরচ্চন্দ্র একটী কবিতায় আপন অবস্থা ব্যক্ত করিয়া, আবেদন পত্র প্রস্তুত করিলেন; এবং তাহা লইয়া দেওয়ানজীর দরবারে গিয়া দেখিলেন, বহুলোকে বহু আবেদনপত্র হস্তে দেওয়ানজীর কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় তাঁহার দিকে নির্নিমেষলোচনে চাহিয়া রহিয়াছে। কোন্ শুভমুহূর্ত্তে জনাকীর্ণ রাজসভার একপার্শ্বে দণ্ডায়মান অনাথ শরচ্চন্দ্রের প্রতি তাঁহার কৃপাকটাক্ষ নিপতিত হইবে তাহার স্থিরতা না থাকায়, শরচ্চন্দ্র আবেদনপত্রখানি দেওয়ানজীর আসনের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তথা হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন, এবং দোকানে গিয়া সঙ্গে যে কয়েকটী পয়সা ছিল তাহা দ্বারাই

ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় কয়েকজন রাজভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া রাজবাটীর দিকে লইয়া চলিল, এবং তিনিও বিশেষ আশঙ্কার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পূর্ব্ব-পরিচিত পথে লইয়া গেল না, দেওয়ানজীর দরবারে হাজির করিয়া দিলনা; অন্তঃপুরদ্বারে আনিয়া পরিচারিকাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিল। তাহারা বালক শরচ্চন্দ্রকে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে আনিয়া দিলে, তিনি দেখিলেন, আপাদমস্তক শুক্লাম্বরমণ্ডিতা মহারাণীমাতা তাঁহার কবিতাটী পাঠ করিতেছেন। পাঠান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"তুমি কি চাও?" শরচ্চন্দ্র বলিলেন "বিদ্যাশিক্ষা করিতে চাই।" মহারাণী মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে চাও, তুমি যতদিন পড়িবে, না আমি যতদিন পড়াইব?" শরচ্চন্দ্র বলিলেন, "আপনি যতদিন পড়াই-বেন।" সেখানে আর দুইটী বালক উপস্থিত ছিল। তাহারা বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার দেওয়ানজী মহাশয়ের পুত্রদ্বয়। উভয়েই এখন পরলোকগত; উভয়েই বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত; একজন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আর একজন শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। ইঁহাদের সহিত একত্র বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মহারাণীমাতা তাঁহাকে 'মা' বলিতে শিখাইয়া শরচ্চন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া, কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা হইলেন।"

শরচ্চন্দ্র ১২৮৮ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার এক বন্ধুকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন তারিখে পুঁটীয়ার রাজধানীতে উপস্থিত হই। সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, মহারাণী সাহায্য না করিলে, আর পরের সাহায্যে অধ্যয়নের যত্ন করিব না। বাল্যকালের লিখিত কতকগুলি পদ্য "পদ্য-নবোদ্যম" নাম দিয়া মহারাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া, তাহা একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে অতি সংক্ষেপে লিখিত একখানি

আবেদন দ্বারা জড়াইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, এত প্রজা এবং ভিক্ষুক একত্র হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য ঘরে প্রবেশ করা অসাধ্য। নিরুপায় হইয়া বাহিরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। একেই লজ্জা কিছু অধিক, অনেকের নিকট প্রার্থনা করিতে যাইয়া অনেক সময়ে লজ্জায় প্রার্থনা করিতে পারি নাই। তাহাতে আবার এত লোক! ভাবিয়া হতাশ হইলাম। ইতিমধ্যে ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে আলাপ হইতে লাগিল। তন্মধ্যে শ্রীহট্টের দুইজন ব্রাহ্মণও ছিলেন। তাঁহারা আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, এখানে তোমার কিছু হইবে না, স্থানান্তরে যাও। আমিও ভাবিয়া দেখিলাম, আমার আশা বিফল। তথাপি একবার আবেদনটা উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হইল; মনে করিলাম, আবেদন দিয়াই চলিয়া যাইব, উত্তরের প্রতীক্ষা করিব না। এই মনে করিয়া অতি কষ্টে ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং 'পদ্য-নবোদ্যম' সহ আবেদনখানি দেওয়ানজীর সম্মুখে ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে চলিলাম। কিন্তু দেওয়ানজী প্রশ্ন করাতে দাঁড়াইয়া উত্তর করিতে হইল, সুতরাং বাহিরে যাওয়া হইল না। দেওয়ানের ব্যবহার দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম; ভাবিলাম, ইনি মহারাণীর উপযুক্ত মন্ত্রী। * * * দেওয়ানজী বলিলেন, 'আমি মহারাণীমাতাকে তোমার আবেদন জানাইব, যাহা হয় কল্য জানিতে পারিবে।' তাঁহার সস্নেহবাক্যে এবং ব্যবহারে নির্জ্জীব আশা আবার যেন জীবন পাইল। পরদিন জানিলাম, আশা সফল হইয়াছে।"

এই সময় হইতেই বালক শরচ্চন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইল। তদুপরি মহারাণী শরৎসুন্দরীর ন্যায় দেবীর কৃপালাভ করিয়া বালক শরচ্চন্দ্রের মানসিক উন্নতিরও বিশেষ সুবিধা হইল। শরচ্চন্দ্র এখন নিশ্চিন্তমনে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক সচ্চরিত্রতায় ও সরলতায় সকলেই মুগ্ধ

হইলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সকলেই ভালবাসিতে লাগিলেন। অধ্যবসায়ী ও মেধাবী ছিলেন বলিয়া লেখাপড়ায় পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন। মহারাণী শরৎসুন্দরীকে তিনি যথার্থই মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পুঁটিয়ার বিদ্যালয় আর শরচ্চন্দ্রের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা-ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইল না, তজ্জন্য শরচ্চন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রাণীমা কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, শরচ্চন্দ্র রাজসাহীর প্রধান বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। তখন রাণীমাতা শরচ্চন্দ্র, দেওয়ানজীর পুত্রদ্বয় এবং আরও কয়েকটী ছাত্রের জন্য রাজসাহীতে বাসাভাড়া করাইয়া তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শরচ্চন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তখন হইতেই তিনি যেরূপ কবিতা লিখিতেন, তাহাতে অল্পকালের মধ্যেই ছাত্রসমাজে তিনি কবিরূপে সমাদৃত হইতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহার রচিত কবিতা সকলে আনন্দের সহিত আবৃত্তি করিত। শরচ্চন্দ্র বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

রাজসাহী থাকাকালীন সাহিত্যিকপ্রবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত শরচ্চন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। শরচ্চন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং দুই শ্রেণী উপরে পড়িতেন। তাঁহাদের সান্ধ্যসম্মিলনীতে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতি কবিগণের স্বদেশপ্রেমপূর্ণ কবিতাপাঠ ও আবৃত্তিতে সকলের আনন্দ বর্দ্ধিত হইত। বালক শরচ্চন্দ্রের ও মৈত্রেয় মহাশয়েরও রচিত কবিতা মধ্যে মধ্যে তথায় আলোচিত হইত। মৈত্রেয় মহাশয়ের ভাষায়, "শরচ্চন্দ্র যে একজন বড় কবি, সেই সময় তাঁহা ধরা পড়িয়া যায়।"

সহসা "হিন্দুরঞ্জিকা" পত্রিকায় শরচ্চন্দ্রের এক কবিতা বাহির হইল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'তিনি তাঁহার বন্ধু ছাত্রদিগকে ছাড়িবেন, লেখাপড়া ছাড়িবেন, নিকটেও থাকিবেন না, দূরেও থাকিবেন না, সন্ন্যাসীর ন্যায় সাধন-ভজনে নিযুক্ত হইবেন।'

মৈত্রেয় মহাশয় "কমলা"তে লিখিয়াছেন "শরচ্চন্দ্র ও তাঁহার সহ-পাঠিগণের কলিকাতা গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার অনুমতি লাভ করিতে বিলম্ব হইল না। ইহাতে একদিকে যেমন ব্যয়াধিক্য উপস্থিত হইল, অন্যদিকে মহারাণীমাতার অবস্থাও তদনুরূপ স্বচ্ছল ছিল না। তিনি তখন দত্তকপুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ৺ কাশীবাসের জন্য ব্যবস্থা করিতেছিলেন। মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভিন্ন তাঁহার আর কোন আয় রহিল না; কিন্তু তাহা হইতেই তিনি শিক্ষার্থীদিগের ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন জানিয়া শরচ্চন্দ্র তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া জানাইলেন, যে এইরূপ অবস্থায় মহারাণীমাতার মাসিকবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না। মহারাণী মাতা বলিলেন, "আমি যতদিন পড়াইব তুমি ততদিন পড়িবে, তাহার অন্যথা হইতে পারিবে না।" সত্যবদ্ধ শরচ্চন্দ্রকে কলিকাতায় থাকিয়া মহারাণীমাতার সাহায্যে অধ্যয়ন চালাইতে হইল। কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সূত্রপাত হওয়ায়, তিনি ক্রমে ক্রমে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর অধিকদূর অধ্যয়ন করিতে পারিলেন না, মহারাণীমাতাও স্বর্গারোহণ করিলেন।"

বালক শরচ্চন্দ্র তাঁহার খোসের্দপুরের মা ৺ হরসুন্দরী দেবী ও পুঁটিয়ার মহারাণীমাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নিয়মানুসারেই চালিত হইতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তখনকার ছাত্রসমাজের ভাবেও তাঁহাকে ভাবিত হইতে হইয়াছিল।

শরচ্চন্দ্রের এক বাল্যবন্ধু ও গুরুভাই পাবনার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদা গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় এই বিষয়ে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "খুব সম্ভব ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে তিনি (শরচ্চন্দ্র) ঐ সময়েই (কলিকাতা থাকা সময়েই) বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। যদিও তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, সে আদর্শ ধর্ম্ম এবং উপাসনায়। ব্রাহ্মসমাজের আহার বিহারের সামাজিক আদর্শ কোন দিনই শরৎ বাবুকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাঁহার সেই ব্রাহ্মভাবের প্রবলতার সময়েও তিনি আহার বিহারে সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কখনও তাঁহাকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোনরূপ বস্তু আহার করিতে দেখি নাই। তিনি চিরদিনই আহার-বিহারে, আচার-নিয়মে সদাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আচার-নিষ্ঠার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে কোনদিনই তাঁহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। তিনি চিরদিনই ঈশ্বর বিশ্বাসী। এবং সেই সময়েও ভক্তির সহিত ঈশ্বর উপাসনা করিতেন। মহারাণী শরৎসুন্দরী তাঁহার এক ধর্ম্ম মা ছিলেন, শরচ্চন্দ্র চিরদিনই তাঁহাকে আপনার মাতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন এবং মহারাণী মাতাও তাঁহাকে নিজ পুত্রের ন্যায়ই স্নেহমমতা করিতেন। এই পূতচরিত্রা ব্রহ্মচারিণীর জীবনের প্রভাব শরৎ বাবুর জীবনকে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। বোধ হয় এই আদর্শই তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত আচার নিষ্ঠায় অটল রাখিয়াছিল। মহারাণী শরৎসুন্দরী ভিন্ন শরৎবাবুর আর এক ধর্ম্মমাতা ছিলেন। তিনি খোসেদপুর নিবাসিনী এক পূতচরিত্রা সাধনশক্তিসম্পন্না ব্রাহ্মণ কন্যা। শরৎ বাবুর নিকট তাঁহার এই ধর্ম্মমাতার সাধনসম্পদের কথা অনেক সময়েই শুনা যাইত। ইনি অনেক পরিমাণে যোগশক্তিসম্পন্না ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ বিধবার জীবনের নানা

ঘটনা এবং উপদেশ শরৎবাবুর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং প্রধানতঃ ইঁহারই কৃপায় এবং উপদেশে শরৎবাবু সনাতন ধর্ম্মপথে বিশ্বাসী হন। ইঁহারই প্রসাদাৎ শরৎবাবু সেই ব্রাহ্মভাবের সময় বিশেষ কিছু দর্শনাদি করেন। ইহা হইতেই তিনি আর কেবল নিরাকার উপাসনায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মদর্শনের জন্য তাঁহার প্রাণে প্রবলবাসনার উদয় হয়। এই সময় হইতেই তিনি আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য গুরুকরণে আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি চিরদিনই ধর্ম্মবিশ্বাসী এবং ঈশ্বরগত-প্রাণ ছিলেন। ভক্তি তাঁহার জীবনের সহজাত সম্পদ ছিল।"

কলিকাতায় অধ্যয়নকালে, কলেজ বন্ধ থাকা উপলক্ষ্যে, শরচ্চন্দ্র কখনো খোর্সেদপুরের মার কাছে গিয়া থাকিতেন, কখনো পুঁটিয়ার মহারাণী মার কাছে যাইতেন। খোর্সেদপুরের মা দরিদ্রা ছিলেন। তিনি সংসারের সকল কর্ম্ম নিজেই করিতেন। তিনি একবার শরচ্চন্দ্রকে বলেন, "বাবা তুই বিয়ে কর, আমার দুঃখ দূর হউক"। সেই অবধি শরচ্চন্দ্র বিবাহ করিতে সম্মত হন।

খোর্সেদপুরের মা ও শরচ্চন্দ্র এক ঘরেই পূজাদি করিতেন। কোন সময়ে খোর্সেদপুরের মার চক্ষুর পীড়া হইয়াছিল। কিন্তু শরচ্চন্দ্র তাঁহার সহিত একই ঘরে ও একই সময়ে পূজাদি করিবার ফলে তাঁহার মার পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। একথা তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি।

শরচ্চন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ৪ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীহট্টে এক মেলা উপলক্ষ্যে পদ্য রচনার প্রতিযোগিতায় কিছু টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। শরচ্চন্দ্র "মহাপূজা" নামে একখানি কবিতা পুস্তক লিখিয়া ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ঐ পুস্তিকার মধ্যে তাঁহার দেশহিতৈষিতা, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং কবিত্বশক্তির যুগপৎ পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহাপূজার'

পুরস্কারের টাকা, স্বীয় আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও, শরচ্চন্দ্র স্বদেশের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতে দিয়াছিলেন। প্রাণের কতদূর উন্নতভাব ছিল, তাহা পাঠকবর্গ এই সামান্য ঘটনা হইতেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। অল্পদিন হইল, অর্থাৎ শরচ্চন্দ্রের মহাপ্রস্থানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। এবং তৎসঙ্গে তিনি ঐ পুস্তকের ইংরাজী ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া মাদ্রাজের ডাক্তার কসিনস্‌কে উপহার দিয়াছিলেন। ভাষা সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছিল। ১২৮৬ সালে "আর্য্যসঙ্গীত" ও "চিতোরের বীরগান" এই দুইটি কবিতা লিখিত হইয়াছিল, এবং ১২৯০ সালে (অধুনা স্বর্গীয়) সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস উপলক্ষ্যে "সুরেন্দ্র কারাবাস" কবিতাও লিখিত হইয়াছিল। সকল কবিতাতেই স্বদেশ হিতৈষিতার ভাব সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

ইংরাজী ১৮৮৪ সালে (বাংলা ১২৯০।১২৯১) শরচ্চন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁহার বয়স ৩২।৩৩ বৎসর। তিনি সাধারণ বালকের অপেক্ষা অধিক বয়সে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিলেন; পরে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধনও কিছু বাধা হইয়াছিল। তজ্জন্য বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সাংসারিক দুরবস্থাও মধ্যে মধ্যে কিরূপ প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, তাহা পাঠক মহোদয়গণ ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। যাহা হউক, নানা বিঘ্নসত্ত্বেও শরচ্চন্দ্র বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে কবিত্বশক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বি, এ, পাশ করিবার পর শরচ্চন্দ্র পুঁটিয়ার রাজা পরেশ নারায়ণ রায় মহাশয়ের এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া পুঁটিয়ায় গমন করেন।

এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, ওকালতী ব্যবসায় গ্রহণ করিতে শরচ্চন্দ্রের প্রবৃত্তি ছিল না, তাই আইন পড়েন নাই। তাঁহার

চরিত্র আজন্ম শুদ্ধ ছিল, এবং তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার অন্তরে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল; দেশের সেবা এবং তদুদ্দেশ্যে বালক বালিকাদিগের চরিত্র গঠনেরও আকাঙ্ক্ষা বিশেষ বলবতী ছিল। তাই তাঁহার প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভ্যাস উপলক্ষ্যে কলিকাতায় থাকা সময়ে তাঁহার বিশেষ বন্ধু শ্রীহট্ট-নিবাসী বাবু হরকিঙ্কর দাস মহাশয়কে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাধারণের পক্ষে যাহা হিতকর তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। ঐ সকল পত্র হরকিঙ্কর বাবুর অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত মৌলভীবাজার হইতে কয়েক মাইল দূরে হরকিঙ্কর বাবুর বাস। ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষ্যে প্রথমে শ্রীহট্ট সহরে, পরে মৌলভিবাজার সবডিভিসনে বহুদিন কার্য্য করিয়া এখন অবসর লইয়াছেন। শরচ্চন্দ্র ও হরকিঙ্কর বাবুর মধ্যে পরস্পর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। হরকিঙ্কর বাবুর নিকট হইতে শরচ্চন্দ্রের অনেক কাগজপত্র পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

(১) বাং ১২৮৬ সালে ২৭শে শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা (৩০নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট) হইতে শ্রীহট্টে বাবু হরকিঙ্কর দাসকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

নিজ পরিচয়

"আমার সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য আপনার কৌতূহল হইতে পারে; অতএব এইখানেই আপনাকে আমার পরিচয় দিব। বুরুঙ্গা পরগণার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রাম আমার জন্মস্থান। শৈশবে পিতা এবং সহোদরের মৃত্যু হয়, জননী জীবিত ছিলেন। ইচ্ছা, বিদ্যাভ্যাস করি, কিন্তু দরিদ্রতা সে পথের কণ্টক! মাকে না জানাইয়া, দুঃখিনীকে দুঃখের সমুদ্রে ভাসাইয়া—বিদেশে

আসিলাম, আজিও সেই বিদেশেই আছি; কিন্তু যাহার জন্যে বিদেশী হইলাম, সে আমায় ফাঁকি দিল,—দূরের বিদ্যা দূরেই রহিল! দুঃখিনী জননী এবং ভগিনীকে দুইবার যাইয়া দেখিয়াছিলাম; তারপরে, আমি বিদেশে থাকিতেই, আমার অদর্শনে তাঁহারা স্বর্গগামিনী হইয়াছেন, সেই সঙ্গে আমারও সুখ শান্তি জন্মের মত বিদায় লইয়াছে, মাতৃভূমি দেখিবার বাসনা এবং আশা জন্মের মত ফুরাইয়াছে! এখন পুঁটিয়ানিবাসিনী শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহাশয়ার আশ্রয়ে আছি।

"চিতোরে বীরপ্রাণ" এবং "আর্য্য-সঙ্গীত" নামে আমার দুইটি মুদ্রিত পদ্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইলাম, একবার পড়িলে সুখী হইব।"

(২)

৩নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ২১শে ভাদ্র, ১২৮৬ বাং

মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা সম্বন্ধে।

"জন্মভূমির ক্রোড়ে পালিত হইয়া, আশৈশব স্বদেশীয় বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও একজন সামান্য চিরবিদেশী অপরিচিত ব্যক্তির পত্রে আপনি এতদূর প্রীত হইতে পারিয়াছেন, ইহা আপনার ঔদার্য্যের সামান্য পরিচয় নহে; এবং আমারও সৌভাগ্যের একশেষ। আমার পত্রে আহ্লাদ প্রকাশ, আবার আমাকে আত্মীয় বলিয়া সম্বোধন,—আপনার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ পাঠ করিয়া আমি আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইতেছি! হায়! একদিনের এ আনন্দে যদি এত সুখ, যাহারা আজন্ম এ আনন্দ ভোগ করিতেছে, তাহারা না জানি কত সুখী।

স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবের পত্র আমার নিকট কিরূপ সামগ্রী, তাহা আমি বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি না। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যেমন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাই, অমনি মনে হয়,—"এই সূর্য্য আমার মাতৃভূমিকে আলোকিত করিতেছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারিতেছে না।" যখন পূর্ণিমার প্রদোষে পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত হয়, তখন অমনি মনে হয়—"এই সুধাকর সুধাবর্ষণে আমার মাতৃভূমির অঙ্গ স্নিগ্ধ করিতেছে, এই চন্দ্রোদয়ে মাতৃভূমিবাসী ভ্রাতৃগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, সুখে হাসিতেছে, কিন্তু এ হতভাগা সে সুখ হইতে বঞ্চিত।" যখন দেখি পাখীগুলি উড়িয়া পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে যাইতেছে, তখন মনে হয়,—"ইহারা বুঝি আমার মাতৃভূমি দেখিয়া আসিল।" এমন যে স্থান, সে স্থানের কেহ আমাকে আত্মীয় বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, আমার যে আনন্দ, যে সুখ, তাহা আপনি কিরূপে বুঝিবেন? আপনি আমার হৃদয়ে মাদকতা জন্মাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আমার মত আনন্দে উন্মত্ত হইতে পারেন না। আমার কাণে যে একটি মধুর স্বর ঢালিয়া দিয়াছেন, সে স্বর দিনরাত্রি আমার কাণে, আমার হৃদয়ে, আমার প্রতি শিরায় মধু ঢালিয়া দিতেছে। আনন্দের মাদকতা বলিয়া বুঝাইয়া দিবার জিনিস নহে, যদি বুঝাইবার জিনিস হইত, বুঝাইয়া দিতাম।

আমা কর্ত্তৃক দেশের কোন উপকার হইবে, অথবা মানব জাতির কোন উপকার হইবে, এরূপ বিশ্বাস আমার নাই। দেশের অভাব অনন্ত, মানব জাতির দুঃখ অনন্ত, আমার ক্ষুদ্র প্রাণে, ক্ষুদ্রতর জ্ঞানে, ক্ষুদ্রতম মানসিক বলে, এ অনন্ত সমুদ্রের কি হইতে পারে? কিছু হইতে পারে না, জানি, তথাপি কেন যে আপনাদের মনে এরূপ আশা হয়, তাহা ঈশ্বরই জানেন। যাহার প্রতি আশা করা যায়, তাঁহার প্রতি একটি গুরুতর ভার অর্পণ

করা হয়, যে পর্য্যন্ত সে আশা পূর্ণ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সে সেই গুরুতর ভার হইতে মুক্ত নহে। আমাকে অতি দুর্ব্বল জানিয়াও কেন যে এ গুরুতর ভার আমার মস্তকে চাপাইয়া দেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

আমার মাতৃভূমিতে কোন বন্ধন যদিও নাই, যদিও একে একে সমুদায় বন্ধনগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তথাপি মাতৃভূমির আকর্ষণ যায় নাই, সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত। বিশেষতঃ আপনাদিগের সঙ্গে আলাপ হইয়া* ক্রমে সে বাসনা তীব্রতর হইতেছে। কিন্তু এ দেশের সঙ্গেও এমন একটি সম্পর্ক জন্মিয়া গিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেই এ দেশ ছাড়িতে পারি না। এদেশ আমাকে পর বলিয়া ভাবে নাই, পরের ছেলে বলিয়া আমাকে মনে করে নাই, বাল্যকাল হইতে—অন্ততঃ কৈশোর কাল হইতে আমাকে বড় স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছে। আমি মাতৃভূমিতে অবশ্য যাইব, এ দেশের মমতা সে পথের কণ্টক হইতে পারিবে না, কিন্তু কখন সে বাসনা পূর্ণ হইবে, তাহা ঈশ্বর জানেন। আমি এখানে কি অবস্থায় আছি, তাহা বোধ হয় জানিয়াছেন, সুতরাং বুঝিতে পারিবেন যে, আমার নিজের ইচ্ছার উপরে তত স্বাধীনতা নাই। আপনার অনুরোধটি আমি মনে গাঁথিয়া রাখিলাম, এ অনুরোধ পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে পূর্ণ সুখ ঘটিবে না।"

পরানুগ্রহ।

(৩) "পরানুগ্রহে আমার অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পরভৃৎদিগের আত্মার স্বাধীনতা প্রায় থাকে না, আমার সন্দেহ হইতেছে, বুঝি আমিও সেই স্বর্গীয় স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইলাম। আবার আপনার সঙ্গে আলাপ হইয়া আর একটি অনুগ্রহের উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে; আপনি আমাকে এত

ঋণবদ্ধ করিতেছেন যে, আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী আজন্ম যত্ন করিলেও সে ঋণ পরিশোধ হইবার নহে। আপনি চাঁদা দ্বারা আমার বিষয়ের জন্ম মোকদ্দমা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; যে চিরদিন পরের অনুগ্রহে পালিত, অনুগ্রহ গ্রহণে আপত্তি করিতে তাহার কোন অধিকার নাই।"

(৪) ৩নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২১শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৬ বাং।

শ্রীহট্টে বিদুষী রমণীরত্ন

"শ্রীহট্টে * * আগমন একটি নূতন ঘটনা, আবার * * রমণীকুলে এক নূতন রত্ন। ভারতের অবলাসমাজ বহু-শতাব্দী-ব্যাপী নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, * * উদিত হইয়া সে অন্ধকার দূর করিলেন। বহুশতাব্দী পরে আবার আর্য্যরমণী সভাসনে আসীন হইয়া সুমধুর সংস্কৃত বক্তৃতায় বিদ্বন্মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। অধীনতার দৃঢ় শৃঙ্খলে পড়িয়াও—একে সামাজিক অধীনতা, তাহাতে আবার রাজকীয় অধীনতা, এই উভয়বিধ অধীনতার দুর্ভেদ্য নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়াও আর্য্যরমণীর মানসিক সৌন্দর্য্য যে বিলুপ্ত হয় নাই, জগৎবাসীর নিকট * * এ সত্যের সাক্ষ্য দিলেন! এমন রমণীকে সম্মাননা না করিলে, সম্মাননার পাত্র আর কে? যাহা দ্বারা জাতি-সাধারণের মুখ উজ্জল হয়, তাহার পূজা না করিলে পূজা আর কাহার জন্য? গুণের পূজায় মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, এ সত্য যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি জাতিগত। যে ব্যক্তি গুণীর আদর করিতে জানে, সে ব্যক্তি মহৎ; যে জাতি গুণীর পূজা করিতে জানে, সে জাতি মহৎ। শ্রীহট্টে * * পূজাতে কেবল যে * * সম্মানিত হইয়াছেন, এমন নহে; ইহাতে শ্রীহট্ট-বাসীরও মহত্ত্ব আছে। * * সম্মাননার কথা শুনিয়া যেরূপ

সুখী হইলাম, * * দৃষ্টান্ত শ্রীহট্টে অনুসৃত হইতেছে, একথা শুনিলে যে সুখ হইবে, তাহা কল্পনারও অতীত।

দুর্গোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাড়ীতে জ্বরেরও একটি উৎসব হইয়াছিল, সুখের সময়ে দুঃখের উৎসব নিতান্তই কষ্টকর সন্দেহ নাই, যাহা হউক, এখন আবার আরোগ্যের একটি উৎসব হইলেই যারপর নাই সুখের বিষয়। মহাশয়! সংসারে দুঃখ কষ্টকর কেন? দুঃখ এত অপ্রিয়, এত কষ্টকর, এত হৃদয়মর্দ্দক, এত শোণিত-শোষক কেন, বলিতে পারেন? অনেকে বলেন "সুখ দুঃখ মনের বিকার", কিন্তু মন কি ইচ্ছা করিলেই দুঃখ তাড়াইয়া দিতে পারে, অথবা সুখ গড়াইতে পারে? অথবা দুগ্ধ হইতে যেমন সব নবনীত উৎপন্ন হয়, মন হইতেও কি সেইরূপ সুখ দুঃখ জন্মিয়া থাকে? মনের সঙ্গে বাহিরের কি কোন সম্বন্ধ নাই? আজ আমি মহাসুখে কাল কাটাইতেছি, হঠাৎ আমার একটি আত্মীয়ের মৃত্যু হইল, আমি পলকের মধ্যে সব সুখ ভুলিলাম, শোকের সাগরে ডুবিলাম! আজ আমি মহাযোগে যোগী, ইন্দ্রিয়-বিজয়ী মহাপুরুষ, হঠাৎ একটী রূপের ছায়া আমার চক্ষে পড়িল, হঠাৎ একটী প্রণয়-সঙ্গীত আমার কাণে বাজিল, পলকে আমার যোগভঙ্গ হইয়া গেল, স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম, ভ্রুক্ষেপের মধ্যে আবার পৃথিবীর জন্ত পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসিলাম। মনের এরূপ পরিবর্ত্তন কি বাহ্য-সাপেক্ষ নহে? যদি তাহাই হয়, তবে আর সুখ দুঃখকে মনের বিকার কিরূপে বলিব? বরং ইহাদিগকে মনের ধর্ম্ম বলিতে পারি,—'ধর্ম্ম' বলিতে পারি এইজন্ত যে, ইহারা মনের বিষয়, সুখ দুঃখ মনের অনুভব করিবার সামগ্রী। কিন্তু যে কথা বলিব তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, আমার এ দোষটী আছে, এজন্য রাগ করিবেন না। আমার স্বভাব এই, এক কথা বলিতে

সংসারে দুঃখ কষ্টকর কেন?

বলিতে আর এক কথায় চলিয়া যাই, পরে প্রথম কথা ভুলিয়া যাই। কোন পাগলকে একটা অরণ্যে ছাড়িয়া দিলে, সে যেমন স্বাধীনভাবে দৌড়িয়া বেড়ায়, অথচ প্রথম যে স্থান হইতে দৌড় দিয়াছিল, সে স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না, আমার মনও সেইরূপ। কিন্তু আমার বন্ধুগণ এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, আপনিও করিবেন। বলিতেছিলাম, দুঃখ এত কষ্টকর কেন? আমার বোধ হয়, আশার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। আশা ঐহিকই হউক, আর পারত্রিকই হউক, দুঃখের ভার লাঘব করিতে আশা চাই, আশার সাহচর্য্যে দুঃখেও সুখ আছে, আশার অভাবে সুখেও সুখ নাই। আশাকে মায়াবিনী বলুন, পিশাচিনী বলুন, আর যাহাই বলুন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে আশা দুঃখ ভুলাইতে পারে। রোগী আশাতে সুখ পায়, দুঃখী আশাতে সুখ পায়। যে নিরাশ, পৃথিবী তাহার নিকট সুখের সামগ্রী নহে।

আমি একটি বিষয় আলোচনা করিয়া আনন্দে অবাক হইয়াছি, আমার হৃদয় আশায় পূর্ণ হইয়াছে। আমি শ্রীহট্ট হইতে যতগুলি পত্র পাইয়া থাকি, তাহার সমস্ত গুলিতেই যেন দেশহিতের একটী নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, যেন শ্রীহট্টবাসী মাত্রেই দেশের জন্য একটুকু ব্যাকুল হইয়াছে, যেন সকলেই জন্মভূমিকে জননীর মত স্নেহ করিতে শিখিয়াছে। ইহা যদি আশাপ্রদ না হয়, তবে আর কিসে আশা মিলিতে পারে? ভিন্নস্থানবাসী বাঙ্গালীরা সচরাচর বন্ধুবান্ধবকে যে সমস্ত পত্রাদি লিখেন, তাহা অনেক দেখিয়াছি। নিজেও অনেক পাইয়াছি, কিন্তু সে সকল পত্রে দেশের জন্য ব্যাকুলতা অধিক নাই, থাকিলেও এত স্ফুটতররূপে প্রকাশ পায় না। আপনাদের পত্র যেরূপ সাক্ষ্য দেয়, যদি বাস্তবিক প্রত্যেক শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসীর হৃদয়ে দেশহিতস্পৃহা এইভাবে

আগরিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, শ্রীহট্টের শুভদিন নিকটবর্ত্তী।

দেশহিতাকাঙ্ক্ষা

বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, আমি আপনাকে বলিয়াছি, আমি নিজে অতি দুর্ব্বল, দেশের হিতের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিব, এ ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু শক্তিহীন ইচ্ছা কবে কার্য্যকরী হইয়া থাকে? একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন বন্ধুর মুখে আমার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"এ ব্যক্তি ধনবান হইলে দেশের অনেক কাজ করিতে পারিত।" বাস্তবিক তিনি অনেক পরিমাণে আমার অবস্থা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সমুদায় বুঝেন নাই,—সমুদয় বুঝিলে বলিতেন,—"যদি ধনবান হইত, যদি বুদ্ধিমান হইত, যদি বিদ্বান হইত ইত্যাদি।" যে ব্যক্তি এমন দুর্ব্বল, তাহার নিকট কিছু আশা করা, আর একটি পর্ব্বতের ভার তাহার মস্তকে চাপাইয়া দেওয়া, একই কথা।

সংসারে আপনারা সুখী, কর্ত্তব্যের ভার বহন করিতে পারিতেছেন, পরিবারের সুখ-সাধন করিতে পারিতেছেন, স্বাধীন জীবনের সুখাস্বাদন করিতে পারিতেছেন, অবসরমত যথাসাধ্য দুঃখীর দুঃখও দূর করিতেছেন। এই গুরুতর কার্য্যের পর আবার দেশের জন্য ভাবিতেও সময় পাইতেছেন। ঈশ্বর হৃদয়ের এই বল অক্ষুণ্ণ রাখুন!

আমি সত্বরই কলিকাতা ছাড়িব। যাঁহারা আমাকে বিদেশী বলিয়া ঘৃণা করেন না, প্রত্যুত অপত্যের মত স্নেহ করেন, তাঁহারা সকলেই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র থাকেন, তাঁহাদিগকে দেখিবার এবং দেখা দিবার এই সময়।

আপনার কথা এবার রাখিতে পারিলাম না, এজন্য নিতান্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত রহিলাম। হৃদয় থাকিতে মাতৃভূমিকে কি আপনাদিগকে

ভুলিতে পারিব না, তবে বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সুযোগের প্রয়োজন।”

(৫) খোসেদপুর।

পোষ্ট কুমারখালী।

২৯শে পৌষ ১২৮৬ বাং।

“আমাকে আপনি একটি আত্মীয় মনে করেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আমাকে একটি পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অবশ্য আমি এরূপ জিজ্ঞাসার উপযুক্ত পাত্র, কেন না, যে যে পথে চলিয়াছে, সেই সে পথের সংবাদ জানে, যে যে আঘাত সহ্য করিয়াছে, সেই সে আঘাতের যন্ত্রণা বুঝিতে পারে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আপনাকে কি সৎ পরামর্শ দিয়া সুখী করিব, খুঁজিয়া পাইতেছি না! এই ছাই বিদ্যা শিক্ষার জন্য বহন না করিয়াছি এমন কষ্ট নাই। ডুবাল প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিয়া জানেন তাঁহারা কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালাভে তাঁহাদের কষ্ট সফল হইয়াছিল, আমার কপালে কেবল কষ্টই হইল; বিদ্যা হইল না। অবশেষে ঈশ্বর দেখিলেন যে নিতান্তই নাছোড়, তাই এইটুকু আশ্রয় দিয়াছেন, প্রাণরক্ষা হইতেছে।

দেশে ধনীর সংখ্যা অল্প, দরিদ্রের সংখ্যা অধিক, আবার ধন এবং দয়ার একত্র সমাবেশ অতি অল্প স্থলেই দেখা যায়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম,—দরিদ্র চিরদিন কষ্ট পাইবে, এ জন্যই এ নিয়মের সৃষ্টি। আপনারা বোধ হয় জানেন যে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী দানশীলতায় সর্ব্বাগ্রগণ্যা। ইহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, ইহাদিগের দ্বার হইতে ভিক্ষুক রিক্তহস্তে ফিরে না। আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি, আমার আশ্রয়দাত্রী মহারাণীমাতা অনেক পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় দরিদ্র বালককে প্রতিপালন করিতেছেন বটে, তদ্ভিন্ন প্রায়-

স্থলেই এককালীন নগদ ১০।৫ টাকা দিয়া প্রার্থয়িতাদিগকে বিদায় করিতেছেন।

আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, সংবাদ পাইয়াছি।"

(৬) ৩০নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১২ই চৈত্র, ১২৮৬ বাং।

"বিষয়ভার আপনার প্রতি এত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। যেরূপ দেখিতেছি, আপনিই সংসারের একমাত্র অবলম্বন, আত্মীয়জনের ভরণপোষণের ভার আপনার উপরেই ন্যস্ত, সেই গুরুভার ক্ষণমাত্র অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বাধীনভাবে নিশ্বাস ফেলিতে পারেন, সে অবকাশ, সে সুযোগ, আপনার নাই। এরূপ বিষয়ভার কষ্টকর বই কি? তবে এই ভার বহন করিবার বল একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান। চব্বিশ ঘণ্টা শারীরিক মানসিক কোনরূপ বিশ্রামলাভ না করিয়া নিরস বিষয়-কঙ্করে ভ্রমণ করিতে হইলে, একটি বলবৎ প্রবর্ত্তক অবশ্যই চাই, কেন না, একটা কিছু লক্ষ্য না থাকিলে মানুষ কাজ করিতে পারে না। পাত্রভেদে সে প্রবর্ত্তক, সে উত্তেজক সামগ্রী স্বতন্ত্র হইতে পারে, ধন লিপ্সা, রাজ্য লিপ্সা, যশঃ লিপ্সা, প্রভৃতি বিশেষ বৃত্তি-বিশেষ ব্যক্তির মনোবৃত্তিকে চালিত করিতে পারে, কিন্তু আপনাতে সে প্রবর্ত্তক, সে লক্ষ্য, সে উত্তেজক সামগ্রী একমাত্র কর্ত্তব্য। আপনার জীবনের সঙ্গে আমি আজীবন পরিচিত নহি, সুতরাং এই স্বল্পকালের মধ্যে অপূর্ণ-উপায় পত্রমুখে আপনার পরিচয় আমি পাইয়াছি, একথা বলিলে আপাততঃ হয়ত কিছু অসঙ্গত বোধ হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি আপনার পরিচয় পাইয়াছি, —গোলাপ যে কেমন কুসুম, যে তাহার আতরের আঘ্রাণ একবার পাইয়াছে, সেই তাহা অনেক পরিমাণে অনুমান করিতে পারে। আপনার পত্রে যে স্বর্গীয় দুর্লভ সৌরভস্রোত প্রবাহিত হয়,

তাহাই বলিয়া দেয় যে, আপনার হৃদয় অপার্থিব উপকরণে নির্ম্মিত। অমন হৃদয়ে যদি কর্ত্তব্যের স্থির-আসন স্থান না পাইবে, অমন হৃদয়ে যদি বীরের ন্যায় স্বার্থের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কর্ত্তব্যের উপদেশ না চলিবে, তবে আর কোন্ হৃদয়ের নিকট সে আশা করা যাইতে পারে ?

আপনি লিখিয়াছেন, বিবাহ না করিলে সংসার ত্যাগ করিতেন। আপনি বহুদর্শী ; এ সকল নিরাশা-ব্যঞ্জক কথা আপনার মুখে শুনিলে আমার মত লোকের আর সংসারী হইতে ইচ্ছা হয় না, বাহিরে থাকিতেই যাহার অসুখ-বাতাস হৃদয় স্পর্শ করিতেছে, তাহার ভিতরে প্রবেশ না করাই ভাল ; এ বিষয়ে আপনার মত কি ?

আপনার সঙ্গে দেখা হইবে, এ কল্পনাও আমার নিকট অতি মধুময় ! যাহা হউক, আশ্বিন মাস এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে ; ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন থাকে, হইবে।"

(৭) ৩০নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২৯শে ভাদ্র, ১২৮৭ বাং।

"আমার শরীরে অন্য কোন পীড়া এখন বড় লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু শিরঃপীড়ায় বড় কাতর আছি। বাল্যাবধি অবস্থার প্রতিকূলতার জন্য স্বাস্থ্যের প্রতি যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছি, শরীরের উপরে যত অত্যাচার করিয়াছি, তাহার সমস্ত কুফল যেন আমার মস্তকে সঞ্চিত হইয়াছে, মনুষ্য শরীরের মূলই মস্তক ; যাহার মস্তক পীড়িত, সে অর্দ্ধেক মৃত, সে আহার নিদ্রা প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যে জীবিত-চিহ্ন দেখায়, কিন্তু চিন্তাশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া কতকপরিমাণে মৃতের শ্রেণীভুক্ত হয়। বোধ হয় মস্তকের পীড়াই কালে আমার উন্নতির ঘোর প্রতিবন্ধক হইবে, হৃদয়ের সমস্ত আশা, ভরসা, উচ্চাভিলাষ, পবিত্র সঙ্কল্প মাটি করিবে।

শরীরের অসুস্থতার কারণ

যদি যত্ন ও পরিশ্রমে কখনও সাগর তরিতে পারি, কোলে নৌকা ডুবিবে ! কণ্টক-তৃণ নির্ম্মূল করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করাই সার হইল, শস্য-লাভ আর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু সে জন্য আক্ষেপ অনাবশ্যক। ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাতে মানুষের হাত নাই। এখন কেবল, "তুমি মঙ্গল-নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান, তবে মিছে মরি ফলাফল চিন্তা করি," এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি। মহারাণীমাতার আমার প্রতি দয়ার অন্ত নাই। রীতিমত পীড়ার চিকিৎসা করিতে তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি অনেকাংশে নিজের ত্রুটিতেই তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আর অবহেলা করিব না, একবার চিকিৎসা দ্বারা অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিব মনে করিয়াছি।

পরিদর্শকে লিখিবার জন্য আপনি যখন এত আগ্রহ করিতেছেন, তখন সে বিষয়ে একেবারে উদাসীন থাকা আমার পক্ষে অসাধ্য। এই অপরিপক্ক লেখনীদ্বারা যদি আপনার একটি অনুরোধ পালন করিতে সমর্থ হই, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ? কিন্তু ভয় হয়, মাতৃভূমির উপকার করিতে যাইয়া অপকার করিয়া ফেলি, পাছে আমার লেখায় পরিদর্শকের গৌরবের খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। বৈদ্যেরা জীবহত্যার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জীবরক্ষার উপায় শিক্ষা করেন, কিন্তু মাতৃভূমির উপকারের জন্য যে সদনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা দ্বারা সেরূপ পরীক্ষা যুক্তিযুক্ত নহে। আমি অন্ততঃ প্রতিমাসে একটা কিছু লিখিব, এবং সেটি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব ; আপনি দেখিয়া উচিত বোধ করিলে পরিদর্শকে প্রেরণ করিবেন।

আমার সৌভাগ্যক্রমে আপনার কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছুক আছেন শুনিয়া কি পরিতোষ লাভ করিলাম, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার জীবনে অন্য কোন সুখ নাই,

কেবল একমাত্র সুখ কয়েকটি বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা। যদি এই দেব-দুর্লভ সামগ্রী, এই মুনীন্দ্র-প্রার্থিত বর আপনা হইতে, বিনা যত্নে লাভ হয়, তবে কে তাহা হাতে ঠেলিয়া ফেলিতে চায়? আমার শরীর কাতর বলিয়া আপনি তাঁহাদিগের নাম বলেন নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায়, রুগ্নশয্যায় বন্ধুলাভ মহৌষধের কার্য্য করিতে পারে। আপনার বন্ধুদিগকে আমার বিনীত সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিবেন, তাঁহারা আমাকে পত্র লিখিলে আমি আত্মাকে ধন্য মনে করিব। অথবা তাঁহারা যদি লজ্জাবোধ করেন, আমাকে জানাইবেন, আমি তাঁহাদিগকে পত্র লিখিব, আমি এ বিষয়ে নির্লজ্জ, সামান্য লজ্জার অনুরোধে অমূল্য রত্ন ছাড়িতে পারি না।

পাঁচ বৎসর পরে "ভারতের সুখস্বপ্ন" হাতে আসিয়াছে। যত্নের অভাবে পুস্তকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি ইহার একখণ্ড উপহার লইবেন। সাতদিনে লিখিত এবং সাতদিনে মুদ্রিত পুস্তকে যত দোষ থাকিতে পারে, 'ভারতের সুখ স্বপ্নে' তাহার ত্রুটি নাই। আপনার অনুরোধক্রমে পুস্তক কয়েকখণ্ড আপনার নিকট পাঠাইলাম।"

(৮) ৩০নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৭ই চৈত্র, ১২৮৭ বাং।

একখানি পুস্তক লিখিয়া শ্রীহট্টবাসীর প্রতি কতকগুলি ঘৃণাকর, লজ্জাকর, এবং অপমানকর, গাঁলি বর্ষণ করিয়াছেন। যে জাতির বিদ্যাবুদ্ধি স্বজাতীয় অনিষ্টেই পর্য্যবসিত হয়, বিধাতা সে জাতিকে পৃথিবীতে রাখিয়া কি সুখ পান, বলিতে পারি না। ছাপাখানার সৃষ্টি হইয়া যে কেবল দেশের উপকারই হইয়াছে, এমন মনে করিবেন না, ইহাতে ইন্দুরের হাতে খন্তা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা পুস্তক লিখার উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত জানে না, তাহারাও অনায়াসে পুস্তক লিখিয়া ছাপাইতেছে,

আবার লোকে পয়সা দিয়া তাহা ক্রয় করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর বিড়ম্বনা কি আছে! আজকাল বৃটিস রাজত্বের সুশাসনে একজন ব্যক্তি-বিশেষকে গালি দিয়া নিরাপদে পরিত্রাণ লাভ করা যায় না, কিন্তু এ ব্যক্তি একটা দেশের উপরে মিথ্যা কথার শ্রাদ্ধ করিল; অথচ তাহার কোন প্রতিবিধান করা হইল না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আর আছে।"

(৯) ৩০নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৪ই বৈশাখ, ১২৮৮ বাং।

"আগামী বর্ষাতে পোষ্যপুত্রের হস্তে বিষয়ভার অর্পণ করিয়া মহারাণীমাতা কাশীতে যাইবেন, এরূপ কথা। আমার বিবাহ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তিনি কিছু বলেন নাই। আমাদের বিবাহের পাত্রী এদেশে পাওয়া সহজ নহে, পাত্রী পাইলেই বিবাহ দেন, বোধ হয় এরূপ তাঁহার মনের ভাব।

ভগিনীপতি মহাশয় বিবাহের জন্য পত্র লিখিয়া লিখিয়া এখন নিবস্ত হইয়াছেন। আমি এখন দেশে না গেলে ত বিবাহ দিতে পারিতেছেন না।

আমার বোধ হয়, সদ্বংশজাতা, অথচ পিতৃমাতৃহীনা, নিরাশ্রয়া, পরের স্নেহে পালিতা, বিপন্না, দুঃখ-বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা, এরূপ একটি বালিকাকে বিবাহ করিলে আমি সুখী হইতে পারি, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

(১০) ৩০নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ বাং।

"আপনাদিগের গ্রামে একটি ভাল স্কুল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। যাহা নাই তাহা একটা অভাব বটে; কিন্তু যাহা আছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাভাবে অনেকের বৃত্তি পাইয়াও

উচ্চশিক্ষা ঘটে না, ইহা অবশ্যই দুঃখের বিষয় ; কিন্তু সে দোষ আপনাদিগের স্কুলের গর্ব্ব করিবার অধিকার দূর করিতেছে না। লোকের জ্ঞানপিপাসা যখন প্রবল হইয়াছে, তখন ঈশ্বর অবশ্যই তাহা চরিতার্থ করিবেন।

শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর একটি ছাত্রকে মাসিক ৬৲ টাকা সাহায্য করিতেছেন শুনিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। ইংরাজদিগের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইংরাজজাতি শত শত অন্যায় অত্যাচার করিলেও অনেক সময়ে তাঁহাদের একটি দুইটি সদ্দৃষ্টান্তে আমরা মোহিত হই।

মহারাণীমাতা কাশী যাইবেন বটে, কিন্তু আমাকে ভুলিবেন না। একটা পশুকে পালন করিলেও যখন তাহার প্রতি মমতা হয়, তখন আমিত হস্তপদবিশিষ্ট একটা মনুষ্য, আমাকে সহজে পরিত্যাগ করিবেন, এমন বোধ হয় না। মহারাণী স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আমি যখন আশ্রয় দিয়াছি, তখন আর কোন উপায় না হইলে আমার জায়গীর হইতে উহার পড়ার খরচ দিব।" আবার বলিয়াছেন,—"শরৎ বেদ পড়িতে চাহিয়াছে, আমার সঙ্গে কাশীতে চলুক, সেখানে থাকিয়া বেদ পড়িবে।" তাঁহার এরূপ কথার যেরূপ অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে, করুন। পোষ্যপুত্রের হস্তে বিষয়ভার ন্যস্ত হইলে রাজ-সংসারের কোন কার্য্যেই তাঁহার হাত থাকিবে না, তথাপি তিনি এখন যেমন রাজ্যেশ্বরী, তখনও তেমনি লক্ষেশ্বরীই থাকিবেন। তাঁহার নিজের একটি জায়গীর এবং কিছু কোম্পানির কাগজ আছে, বার্ষিক আয় আনুমানিক ৩৫,০০০৲ কিম্বা ৪০,০০০ টাকা হইবে। সুতরাং তিনি কাশীবাসিনী হইলেও ইচ্ছা করিলে আমার মত বহুলোককে প্রতিপালন করিতে পারেন। আমিও প্রতিপালনের আর অধিক কিছু চাই না। আমার কোনরূপে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ হইলেই যথেষ্ট হইল।

বিবাহ সম্বন্ধে আমি আপনাকে যে মত জানাইয়াছি, তাহার অধিক আর কোন মত নাই। যদি নিজের মতে বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি বলিব, ঐমত একটি বালিকা চাই। আর যদি পরের মতে করিতে হয়, তাহা হইলে আর নিজের মতের মূল্য কি? বাঁধিয়া মারিলে কে না সহিতে পারে? একভাবে ধরিতে গেলে ঈদৃশী বালিকা অমূল্য, কিন্তু আর এক ভাবে ধরিতে গেলে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা দিয়া পরিমাণ করিলে, ইহার কিছুমাত্র মূল্য নাই। কত অসহায়া বালিকা অসুর স্বামীর হাতে পড়িয়া এবং দানবী শাশুড়ীর হাতে পড়িয়া জীবনে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা কে সংখ্যা করিতে পারে? আবার ইচ্ছা করিয়া আপনি খুঁজিয়া বেড়াইয়া দেখুন, হয়ত একটিও পাইবেন না। বাংলায় যে অমন বালিকা নাই, তাহা নহে কিন্তু খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। এইরূপে অনেক সময়ে বিনা কারণে মনুষ্যের সুখে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, বাসনায় অভাব উপস্থিত হয়। পৃথিবী কণ্টকে আকীর্ণ, যে দিকে পা বাড়াইবেন, সেই দিকেই কণ্টক বিদ্ধ হইবে, কিন্তু দরকার হইলে চারিদণ্ড খুঁজিয়া একটি কণ্টকও পাইবেন না।”

(১১)

৬নং চাঁপাতলা লেন, কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১২৮৮ বাং।

“সকলে আমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। আমিও পাষাণ নহি, স্নেহ মমতা প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তিনিচয় এখনও আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, নির্ব্বাপিত হইয়া যায় নাই। তবে কেন যে দেশে যাইতেছি না, কেন যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। যে ব্যক্তি কাব্যে চিত্রিত স্নেহের চিত্র দেখিয়া চক্ষের জল

নিজ চিত্তের চিত্র

সংবরণ করিতে পারে নাই, শকুন্তলাকে তপোবনের তরুর নিকট বিদায় লইতে দেখিয়া যে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল, স্নেহের আঘাতে বিচেতন থাকা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন করাই আমার প্রতিজ্ঞা, ইহাতেই আমার সুখ। এখন দেশে গেলে যে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, তাহা জানি; কিন্তু একটী বিশেষ ক্ষতি যে হইবে, তাহাও বুঝিতে পারি। আমার বিশ্বাস, আপনার মত যে সকল বন্ধু আমাকে প্রকৃতরূপে ভালবাসেন, তাঁহারা কখনই এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না।

আমার জীবনীর একখানি মুসাবিধা করিয়াছেন জানিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। স্নেহ কি এতই অন্ধ? এ কাজ না করিয়া অন্য কাজের জন্য দুই দণ্ড পরিশ্রম করিলে, সে যত্ন এবং সময়-ব্যয় সার্থক হইত। জীবনী প্রকাশ করিলে ইহা আপনার লিখার জন্য হাস্যাস্পদ হইবে না, কিন্তু আমার জীবনের জন্য হাস্যাস্পদ হইবে। কাঁচকে সহস্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া জনসমাপে উপস্থিত করুন, সে কাঁচ বলিয়াই পরিচিত হইবে। আমা অপেক্ষা অনেক উপযুক্ত ব্যক্তির এরূপ জীবনী প্রকাশ করিয়া কেহ কেহ হাস্যাস্পদ হইয়াছেন; যথা, 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর' কাব্য-প্রণেতা বাবু আনন্দ চন্দ্র নন্দী, এবং হেলেনা কাব্য-প্রণেতা বাবু আনন্দ চন্দ্র মিত্র। আমাকে এরূপ হাস্যাস্পদ করিতে কি আপনার ইচ্ছা? জীবনীর দুই

জীবনীর উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য —(১) আমার পরিচয় (২) পরিচয় দিবার জন্য পত্র লিখার সংক্ষেপ। জীবনী লিখার প্রধান যে উদ্দেশ্য, তাহার উপযুক্ত গুণ আজিও আমাতে জন্মে নাই। এরূপ সামান্য উদ্দেশ্য লইয়া জীবনী লিখা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আমার বিবেচনায় দুইটি সহজ উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথম, যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় জানিতে চাহিবেন, তাঁহারা পত্র লিখিলে আমি সাহ্লাদে পত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিচয় দিব। দ্বিতীয়, আপনি আমার যে জীবনী লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দিবেন, যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিচয় জানিতে চাহিবেন, কেবল তাঁহাদিগকেই এক এক খণ্ড দিবেন, পুস্তকের সঙ্গে ইহার সংস্রব থাকিবে না। আমার মত চাহিয়াছেন বলিয়া আমার মত বলিলাম, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। যে হতভাগাকে দেশের লোকে জানিতে চাহেন, তাহাকে একবার সৌভাগ্যবানও বলা যাইতে পারে।

. শ্রীমতী মহারাণীমাতা একবার আমার জীবনবৃত্তান্ত জানিতে চাহিয়াছিলেন; ইচ্ছা আছে, "আমার দুঃখের দিন" লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দিব।

আমি যখন দেশ ছাড়ি, তখন আমার বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল, এই কথা মার নিকট শুনিয়াছি; কিন্তু জন্মকুষ্টি তখনও ছিল না, এখনও নাই।

মহারাণীর নিকট এইরূপে সাহায্য পাইয়াছিলাম:—১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন পুঁটীয়ার রাজধানীতে উপস্থিত হই। সঙ্কল্প করিয়াছিলাম মহারাণী সাহায্য না করিলে আর পরের সাহায্যে অধ্যয়নের যত্ন করিব না। বাল্যকালের লিখিত কতকগুলি পদ্য "পদ্য নবোদ্যম" নাম দিয়া মহারাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া তাহা একখণ্ড ক্ষুদ্রকাগজে অতি সংক্ষেপে লিখিত একখান আবেদন দ্বারা জড়াইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, প্রজা এবং ভিক্ষুক এত একত্রী হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য ঘরে প্রবেশ করা অসাধ্য। নিরুপায় হইয়া বাহিরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। একেই লজ্জা কিছু অধিক, অনেকের নিকট প্রার্থনা করিতে

যাইয়া অনেক সময়ে লজ্জায় প্রার্থনা করিতে পারি নাই। তাহাতে আবার এত লোক! ভাবিয়া হতাশ হইলাম। ইতিমধ্যে ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে আলাপ হইতে লাগিল। তন্মধ্যে শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফ প্রদেশের দুইজন ব্রাহ্মণও ছিলেন। তাঁহারা আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, এখানে তোমার কিছু হইবে না, তুমি স্থানান্তরে যাও। আমিও ভাবিয়া দেখিলাম, আমার আশা বিফল। তথাপি একবার আবেদনটা উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হইল; মনে করিলাম, আবেদন দিয়াই চলিয়া যাইব, উত্তরের প্রতীক্ষা করিব না। এই মনে করিয়া অতিকষ্টে ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং "পদ্য নবোত্তম" সহ আবেদনখানি দেওয়ানজীর সম্মুখে ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে চলিলাম। কিন্তু দেওয়ানজী প্রশ্ন করাতে দাঁড়াইয়া উত্তর করিতে হইল, সুতরাং বাহিরে যাওয়া হইল না। দেওয়ানের ব্যবহার দেখিয়া বড় প্রীত এবং আশ্বস্ত হইলাম; ভাবিলাম, ইনি মহারাণীর উপযুক্ত মন্ত্রী। ইঁহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। নাম প্রসন্ন কুমার মজুমদার,—ইনি এখনও মহারাণীর দেওয়ান। দেওয়ানজী বলিলেন,——"আমি মহারাণী মাতাকে তোমার আবেদন জানাইব। যাহা হয় কল্য জানিতে পারিবে।" তাঁহার সস্নেহ বাক্যে এবং সদয় ব্যবহারে নিৰ্জ্জীব আশা আবার যেন জীবন পাইল। পরদিন জানিলাম, আশা সফল হইয়াছে। মহারাণীর অনুগ্রহের এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকেই অবাক হইয়া থাকেন। সকলেই মনে করেন, বিশেষ যোগাড় এবং বড়লোকের অনুরোধ ব্যতীত এরূপ অনুগ্রহ পাওয়া ঘটে না। প্রকৃত দয়ার্দ্রচিত্ত দাতার নিকট যে দুঃখীর দুঃখ এবং দরিদ্রের দরিদ্রতাই একমাত্র অনুরোধ-পত্র, তাহা বর্ত্তমান সমাজের বোধ-গম্য নহে। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, আমার সাহায্যের কথা লিখিয়া সংবাদপত্রে সুখ্যাতি করিতে মহারাণী নিষেধ করিয়াছিলেন। মহারাণী

মাতা বলিয়াছেন, আমার শিক্ষা যাহাতে পূর্ণাবয়ব হয়, তাহা করিবেন; অর্থাভাবে শিক্ষা হইল না বলিয়া আমার আক্ষেপ থাকিতে দিবেন না। মহারাণীর অনুগ্রহের সীমা নাই, কিন্তু আমি বুঝি তাঁহার অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র নই, এই বলিয়া সময়ে সময়ে আমার আক্ষেপ হয়।"

(১২) ৬ নং চাঁপাতলা লেন, কলিকাতা।
৬ই শ্রাবণ, ১২৮৮ বাং।

"স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া কাজ না করিলে কেহ দেশের উপকার করিতে পারিবেন না। দেশের উন্নতি সচরাচর লোকে যেরূপ সহজ মনে করিয়া থাকে, ব্যাপারটি এত সহজ নহে।"

(১৩)

"যে সমাজে শাক সবজী অপেক্ষাও মানব-চিন্তার মূল্য অল্প বলিয়া বিবেচিত হয়, সে সমাজের প্রকৃত উন্নতি অনেক দূরের কথা। বোধ হয় পাঁচশত পৃষ্ঠার একখানি নবন্যাস লিখিতে পারিলে সমগ্র পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা ছিল।

শ্রীহট্ট মেলায় পুরস্কৃত, এ কথাটি পুস্তকের নামের নীচেই একটা বন্ধনীর মধ্যে দিবেন, কেননা, এই পুরস্কার আমি জন্মভূমির নিকট লাভ করিলাম, ইহা বড়ই গৌরবের বিষয়।

'মহাপূজা' লিখিবার সময়ে এক একটি কথা লিখিয়াছি, আর ছাত্র-দিগের প্রতি আশাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়াছি। যদিও নিতান্ত ক্ষুদ্র, তথাপি ছাত্রদিগের হাতে এই কবিতাটি উপহার দিতে ইচ্ছা করিলাম। যদি আপনার নিকট ভাল বোধ হয়, তবে "মহাপূজার" সঙ্গে এই উপহার পত্র-খানিও ছাপাইবেন। "প্রিয় ছাত্রগণ!

'অভ্যুত্থানশীল ভারতের যুবকবৃন্দ,' এই কথাটী মনে হইলে আমার হৃদয়ে যে অসীম আশা ও বিমল আনন্দের উদয় হয়, তাহার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই ক্ষুদ্র কবিতাটী আপনাদিগের করে সাদরে উৎসর্গ করিলাম। ইতি

মহাপূজার উপহার-পত্র

গ্রন্থকার

(১৪)

৩০নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৬ বাং।

"কর্ত্তব্যের অকরণ কাহাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তর আমি এইরূপে দিতে চাই যে, সাধ্য সত্ত্বে কর্ত্তব্য না করাই কর্ত্তব্যের অকরণ। কার্য্যের পরিমাণ সাধুতার পরিমাপক নহে; ঈশ্বর আমাদিগের মনের ভাব দেখিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। জগতে এমন একদিন আসিবে, যখন মনুষ্যও মনুষ্যের মনের ভাব লইয়া কার্য্য বিচার করিবে। কিন্তু বোধ হয় সে সুখের দিন এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে।

কর্ত্তব্যের অকরণ

কুমারের বয়স ১৮ বৎসর হইয়াছে। যদি আইনমতে এখন তিনি বিষয়ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হয়ত আরও তিন বৎসর মহারাণীকে সংসারের ভার লইয়া থাকিতে হইবে। যাহা হয় আপনি জানিতে পারিবেন।

ভগিনীপতি মহাশয় ইতিমধ্যে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। দেশে যাইয়া বিবাহ করিবার জন্ত আমাকে যে ভাবে পত্রখানি লিখিয়াছেন,

তাহা পাঠ করিলে পাষাণও বুঝি এক সময়ে গলিতে পারে। কিন্তু আমি যে পাষাণ হইয়াছি, আরও কিছুদিন সেই পাষাণই থাকিতে চাই। এ পাষাণে যাহা সহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা সহিবার গুরুতর আর কিছু নাই। তিনি মনে করিয়াছেন, আমি বিদেশী হইয়াছি, দেশের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এখন একটি বিবাহ দিতে পারিলেই আমি আবার দেশী হইতে পারি। আমেরিকায় থাকিলেও যে ভারতবাসী ভারতবাসীই থাকিতে পারে একথা অবশ্যই তাঁহার ধারণা হইবে না। আমার যথাসাধ্য আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তিনি যে কিছুই বুঝিবেন না, তাহাও আমি বুঝিতেছি।"

(১৫) ৬নং চাঁপাতলা লেন, কলিকাতা।
২৫শে ভাদ্র, ১২৮৮ বাং।

"পত্র পড়িয়া আমি চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি নাই। আমি জীবিত থাকিতে নিজের পৈত্রিকভূমি (যতই অল্প হউক না কেন) থাকিতে ক্ষুধার জ্বালায় ধান এবং কাঁচা মাছ খাইয়াছে, ইহা মনে করিতে প্রাণ অস্থির হয়, বুক ফাটিয়া যায়! আমি ত অনুমতিই দিয়াছিলাম, আমার যাহা আছে, তাহাও সে ভোগ করিতে পারিবে। তবে সে খাইতে না পারিয়া মরিল কেন? কিন্তু হায়! একথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব! আবার দুঃখের উপর দুঃখ! কেবালাতে দস্তখৎ করিতে নাকি সে অস্বীকার করিয়াছিল। একে পাগল, তৎতেও আমার প্রতি তাহার স্নেহ যায় নাই। কিন্তু আমি সকলেরই স্নেহের উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছি, আমার মত পাষণ্ড ত আর কেহ হইবে না।"

(১৬)

৬নং চাঁপাতলা লেন, কলিকাতা।
২০শে কার্ত্তিক, ১২৮৮ বাং।

"ঈশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই নিয়মেই জগতে জীবস্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ এই নিয়মেই অনন্তকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী যাহা, তাহাই মঙ্গলকর; যাহা মঙ্গলকর, তাহা কি সুখকর নহে? কিন্তু ইহা কেমন যেন একটি বিচিত্র নিয়ম যে, যাহা কিছু মঙ্গলময়, যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছুর জন্য মানুষ লালায়িত হয়, তাহাতেই যেন একটুকু বিপদ, একটুকু ভয়, একটুকু আশঙ্কা রহিয়াছে, ঈশ্বর সুখের দর বাড়াইবার জন্য মানুষের সুখ-তৃষ্ণা এরূপ দুঃখসঙ্কুল করিয়াছেন!

যাহা মঙ্গলকর, তাহার সহিত একটুকু বিপদ জড়িত

সংসারে অনেকের অনেক সম্পত্তি আছে, কিন্তু দরিদ্রের একমাত্র সম্পত্তি চরিত্র। এ সম্পত্তিটুকুও যাহার নাই, সে একরূপ জীবন্মৃত।"

(১৭)

৬নং চাঁপাতলা লেন, কলিকাতা।
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ বাং।

"মহারাণীমাতা বিষয় ছাড়িলেন, কিন্তু আমাকে ছাড়িবেন না। তিনি বলিয়াছেন, রাজ সংসার হইতে খরচ না দিলে, নিজের জায়গীর হইতে খরচ দিয়া আমাকে পড়াইবেন। তবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, তাঁহার অর্থ ধ্বংস করিতে আমার লজ্জা হইবে, এই জন্যই বলিয়াছি, তাঁহার অর্থ ধ্বংস করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি এ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রকৃত জ্ঞানীরই উপদেশ! কিন্তু দুর্ব্বল মানুষ, অবস্থার চক্রে পড়িয়া অনেক সময়ে পশুত্ব প্রাপ্তও হয়।

আপনার হৃদয় অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া এই লাভ করিলাম, আপনার একটি দুঃখের অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া দিলাম! এ হতভাগ্য জীবনে কি অভিসম্পাত আছে, যে ইহার সংস্পর্শে আসিবে, সেই দুঃখের আঘাত পাইবে! আপনার সহিত সৌহার্দ্দে আমি অনন্ত সুখে সুখী হইলাম, কিন্তু আমার দুখের তাপ আপনাতে সংক্রমিত হইল, এই আমার দুঃখ! আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমার প্রতি ঈশ্বরের অপার দয়া, আমার যাহাতে ভাল হইবে, তিনি তাহা অবশ্য করিবেন।"

(১৮) খোসেদপুর।

৭ই মাঘ, ১২৮৮ বাং।

"পরীক্ষার জন্য ভাল প্রস্তুত হইতে পারি নাই, একথা আপনাকে আগেই বলিয়াছি। তথাপি বাধ্য হইয়া পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। গণিত ভাল লিখিতে পারি নাই; গণিত আর কিছু লিখিতে পারিলে উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম।

ভবিষ্যতে কি করিব, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার প্রতি মহারাণীমাতার স্নেহ অচল; এবার উত্তীর্ণ না হইলেও হয়ত আর একবার চেষ্টার জন্য তিনি আদেশ করিবেন। যিনি নূতন নায়েব হইয়াছেন, শুনিতে পাই তিনিও আমার প্রতি নির্দ্দয় নহেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন পরীক্ষায় প্রথমবারে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, সে যে দ্বিতীয়বারে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহার স্থিরতা কি? যে উদ্দেশ্যে মহারাণীমাতার অর্থ ধ্বংস করিতেছি, সে উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য্য হইলে আমি কি তাঁহার নিকট নৈতিক দায়ে দায়ী নহি? তিনি আমার উন্নতিতে যেমন আহ্লাদিত হন, আমার অবনতিতেও সেইরূপ দুঃখ

প্রকাশ করেন। নিজে অবনত হইয়া তাঁহাকে দুঃখ দেওয়াতেও পাপ আছে বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, কর্ত্তব্য বিষয়ে সদ্‌যুক্তি দিয়া বাধিত করিবেন।

চিরদিন আমার শুভকামনা করেন, কাজেই ভাবী জীবনে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাও আপনি চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু, কিছু নির্ম্মাণ করিতে হইলে, উপাদান-পদার্থ সে বস্তু নির্ম্মাণের উপযোগী কি না, ইহা যেমন বিবেচনা করা উচিত; সেইরূপ কাহাকেও কোন বিশেষ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে হইলে, সেই ব্যক্তিতে উক্ত ব্যবসায়ের উপযোগী উপাদান আছে কিনা, দেখা উচিত। আমাতে যে কোন্ ব্যবসায়ের উপাদান বিদ্যমান আছে, তাহা আমি এখনও ঠিক জানি না। যাহা হউক, সে বিষয় মীমাংসা করিবার সময় বোধ হয় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন আপনারা উপদেশ না দিলে উপদেশের জন্য আর কাহার নিকট যাইব?

আমি সম্প্রতি মাতাঠাকুরাণীর নিকট আছি। পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইলে পুঁটিয়া যাইব। কলিকাতা কখন যাইব তাহার নিশ্চয় নাই।"

(১৯) পুঁটিয়া।

২৪শে চৈত্র, ১২৮৮ বাং।

"আমার অবস্থার অনিশ্চয়তাই আপনাকে পত্র না লিখার কারণ। পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিবার জন্য মহারাণী যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছি; কিন্তু একজন কর্ম্মচারীর ইচ্ছা, আমি পড়া ছাড়িয়া চাকুরী করি। আমি একথা মহারাণীকে জানাইয়া-ছিলাম, তিনি দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি এতদিন প্রতিপালন করিলাম, বিদ্যাশিক্ষার জন্য এত অর্থ ব্যয় করিলাম, এখন তিনি ইহাকে

চাকুরী করিতে : বলিবেন বই কি !' যাত্রা হউক টাকা পাইয়াছি, আগামী কল্য কলিকাতা যাইব। আগামীবারেও উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে যাহা করিব, তাহা আপনাকে না বলিলেও বুঝিবেন।

আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি আমার নাম প্রকাশ করিবেন না, কিন্তু দেখিলাম নাম দিয়াছেন। নাম প্রকাশে আমার অনিচ্ছার অন্য কোন কারণ নাই, কেবল, যাহাতে সাধারণ পাঠকের তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, সে কবিতা দ্বারা কাব্যপ্রিয় লোকের আনন্দ উৎপাদিত হইবে, এমন আশা করা যায় না ; এমন পুস্তকে কি কবিতায় নাম না দেওয়াই আমার বিবেচনায় ভাল। অন্তরালে দাঁড়াইয়া অলক্ষিতভাবে সাধারণের মতামত জানাতে কিছু আমোদ আছে। সাহিত্য-ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হইয়া, সাহিত্য-সংসারে নিজের নাম বিঘোষিত করা কতকটা লজ্জাকর। তবে আমি যাহা মনে করি, তাহাই যে অভ্রান্ত, এরূপ বিশ্বাসও আমার নাই। অবশ্য, এ সকল বিষয়ে আমা অপেক্ষা আপনার বিচারশক্তি অধিক পরিপক্ক, এবং আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন, ইহাতে আমার আহ্লাদ ভিন্ন অনাহ্লাদ নহে। এখন, অন্ততঃ শ্রীহট্টের ছাত্রমণ্ডলীতে যদি ইহার কিঞ্চিৎ আদর হয়, তাহা হইলে আমার আশার অতিরিক্ত ফল লাভ হইল বলিয়া মনে করিব।

আমি দিবারাত্রি এই কামনা করি, যে সকল মহাত্মার জীবনী পাঠে মানবজাতি উপকৃত হইতে পারে, জন্মভূমি শ্রীহট্ট অচিরে এমন সকল মহাত্মাকে প্রসব করুন। ঈশ্বর প্রকৃত মহাপুরুষ প্রেরণ না করিলে, আমাদিগের আরোপিত মহাপুরুষ দ্বারা মাতৃমুখ উজ্জ্বল হইতে পারে না।

যদি পরীক্ষার মন্দফলের আঘাত গুরুতররূপে না লাগিত, তাহা হইলে বোধ হয় এতদিনে শরীর আরও ভাল হইত। অনেকেরই জীবনের

একটি না একটি লক্ষ্য আছে, কিন্তু আমার জীবন লক্ষ্যহীন; অনেকেরই সংসারে দাঁড়াইবার স্থান আছে, কিন্তু বিদ্যালয় ছাড়িলে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই; এই জন্যই বোধ হয় আমার পক্ষে আঘাতটি এত গুরুতর হইয়া উঠে! যাহা হউক, আমার জন্য আপনি আর অধিক চিন্তা করিবেন না। আমি আবার কিছুদিনের জন্য স্থির হইলাম।"

(২০) ৬নং চাঁপাতলা লেন, কলিকাতা।
২২শে বৈশাখ, ১২৮৯ বাং।

"আপনাদিগের গ্রামে (অবশ্য আপনাদিগেরই যত্নে) একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। বাঙ্গালীর গৃহ এতদিন কেবল প্রেম-প্রীতি-পবিত্রতার মন্দির ছিল, এখন তাহাতে জ্ঞানের জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইতে চলিল, বড় আনন্দের বিষয়, ভাবি-সমাজ সংস্কারের বড় সুলক্ষণ। আর্য্য রমণীর হৃদয়ে প্রকৃতিদত্ত অনেক রত্ন রহিয়াছে, কেবল ঘসা মাজার অভাবে তাহা মলিন, জ্ঞান সে মলিনতা দূর করিবে। জননী সন্তানকে কোলে লইয়া বর্ণ পরিচয় করাইতেছেন, কথায় কথায় নীতি-শিক্ষা দিতেছেন, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সন্তানের হৃদয়ের প্রতি উদাসীন হইতেছেন না, এ বড় আনন্দের অবস্থা, বড় সুখের কল্পনা। কিন্তু আমাদের হতভাগ্য দেশের ইহা কল্পনার বিষয় হইলেও, পাশ্চাত্য অনেক সভ্যদেশে এ অবস্থা নিতান্ত সুলভ।

৫।৭ দিবসের পরে আমি গোসেদপুর মার নিকট যাইব। পুঁটিয়াতে এবার যাইব না। মার শরীর ভাল নহে, সে দিন ভয়ানক জ্বর হইয়া গিয়াছে। বয়সও অধিক হইয়াছে, এই বয়সে এই শরীর লইয়া সংসারের

সমস্ত কার্য্য একাকিনী করেন। আমি গেলে আমার জন্য যত্ন করাতে পরিশ্রম অধিক হয়, আবার ছুটির মধ্যে না গেলে তাঁহার কষ্টের সীমা থাকে না, সুতরাং না যাইয়া উপায় নাই। তাঁহার কথা ভাবিয়া আমাকে অনেক সময়ে কষ্ট পাইতে হয়; আমি নিতান্ত হতভাগা যে জীবিত থাকিতে তাঁহাকে একটুকু সুখী করিতে পারিলাম না।"

(২১) ১৪নং শিবনারায়ণ দাসের লেন।
কলিকাতা। ২৪শে আষাঢ়, ১২৮৯ বাং।

বন্ধুর স্ত্রী-বিয়োগে সান্ত্বনা

আপনার ১৭ই আষাঢ়ের কৃষ্ণ রেখাঙ্কিত পত্রখানি যেন শোকের ভরে কাঁদিতে কাঁদিতে গতকল্য আসিয়া হাতে পড়িয়াছে! মাথামুণ্ড কি লিখিব? দুরাত্মা যম আপনার যে সর্ব্বনাশ করিল, আমার এই অপক্ব লেখনী তাহার কি প্রতিকার করিবে? আপনি অবোধ নহেন; ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি, আপনাকে কি প্রবোধ দিব? কোন পরমাত্মীয়ের নয়নে শোকাশ্রু দর্শন করিলে শিশু যেমন স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, কি বলিবে, কি করিয়া তাহার শোকাবেগ খর্ব্ব করিবে, কিছুই বুঝিতে পারেনা, কিছুই ঠিক করিতে পারেনা, আপনার গুরুতর শোকের সংবাদে আমি সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়াছি, আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না, লেখনী চলিতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে, আপনার অশ্রু মুছাইয়া দেই, আপনার হৃদয়কে শান্তিজলে ধৌত করিয়া দেই, কিন্তু তাহা পারি কই? মনুষ্য কাঁদিতে জানে, না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না, যেন কাঁদিবার জন্যই মানব-জন্ম; কিন্তু ক্রন্দন দূর করিতে পারেন কেবল ঈশ্বর! দুঃখ আমাদিগের প্রকৃতি, সুখ ঈশ্বরের ইচ্ছা।

আচ্ছা, বলুন দেখি, আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমরা কাঁদি কেন? বোধ হয়, ইহার মূল কারণ বিচ্ছেদ! আমরা সব সহিতে পারি, কিন্তু যাহাকে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছি, তাহার বিচ্ছেদ সহিতে পারি না, এ জন্যই আমরা আত্মীয়ের মৃত্যুতে উন্মত্ত হই, অধীর হই, শোকে অভিভূত হই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিচ্ছেদ মাত্রেই অধীর হওয়া উচিত নহে। যেখানে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা, সেখানেই অধীরতা অনিবার্য্য; ক্ষণিক বিচ্ছেদে শোক কেন, অধীরতা কেন? জননী কখনই সন্তানের বিচ্ছেদ সহিতে পারেন না। তবে তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাইয়া দেন কেন? তিনি জানেন যে, সে বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী নহে, সে বিদেশ-বাস সন্তানের অমঙ্গলের হেতু নহে, তাই বুকের ধন দূরে রাখিয়া ঘরে থাকেন। যদি কোন স্বর্গীয় শক্তি নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে বলিতে পারে যে সন্তান নির্ব্বিঘ্নে বিদেশে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিবে, এবং অবশেষে জননীর নিকট প্রতিনিবৃত্ত হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় সন্তানহিতৈষিণী জননী মুহূর্ত্ত মাত্রও পুত্রের জন্য চিন্তা করেন না।

আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমরা কাঁদি কেন?

বিদেশগত সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইলেও না হইতে পারে, সুতরাং জননী চিন্তিত হইতে পারেন; কিন্তু পরলোকগত আত্মীয়ের জন্য চিন্তিত হইবার কারণ কি? আধ্যাত্মিক স্বর্গরাজ্যে তাহার সহিত সহবাসে সন্দেহ করা অস্বাভাবিক। আমি যে কেবল আপনাকে প্রবোধ দিবার জন্য একথা বলিতেছি, তাহা নহে, আমার ইহা বাস্তবিক বিশ্বাস। আপনাকে প্রবোধ দিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। যখন হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন থাকে, তখন গল্প শুনিবার সময় নহে; তথাপি নিতান্ত ধৃষ্টের ন্যায় আপনার নিকট একটি গল্প না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমি খোর্দ্দপুরে থাকিতে একদিন প্রাতঃকালে একজন সহাধ্যায়ীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি; এমন সময়ে তিনি আমাকে একখানি ডাকের পত্র দিলেন। পত্রখানি খুলিয়া প্রথমেই পড়িলাম, "বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার বেলা দুই প্রহর সময়ে" আর পড়িতে পারিলাম না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। পত্রখানি হাতে লইয়া, একটিও কথা না বলিয়া, শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গেলাম। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ, চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ, কিন্তু তখনও চক্ষের ধারা বহিতে আরম্ভ হয় নাই। শিক্ষক মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। তিনি কোন কথা না বলিয়াই এই গানটি গাহিলেন—

"জননীর কোলে বসি কেনরে অবোধ মন,
করিছ রোদন সদা মাতৃহীন-শিশু প্রায়।
দেখরে মন আপনি সম্মুখে তব জননী,
মা বলে ডাকিয়া তাঁরে শীতল কর হৃদয়।"

গানটী শুনিয়া চক্ষের জল চক্ষুতেই শুকাইল, আর কাঁদিতে পারিলাম না।

জননী পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তখন ছোটদিদি (প্রসন্নের মা) ছিলেন, তাঁহাকে দেখিব বলিয়া আশা করিতেছিলাম, এমন সময়ে তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আহার, নিদ্রা, পড়াশুনা ছাড়িলাম, কিছুই ভাল লাগে না, শুইয়া থাকি, চক্ষের জল পড়িতে থাকে, জাগিয়া দেখি বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কয়েকদিন আছি, দেশে যাইব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় সংবাদ পাইলাম ছোটদিদি আর ইহলোকে নাই! শুনিয়া কাঁদিলাম,—ছোটদিদির জন্য নহে,—তাঁহার শিশুসন্তানগুলির জন্য। আপনার পত্র পাইয়া কাঁদিলাম,—আপনার স্বর্গগত সহধর্ম্মিনীর জন্য নহে, কারণ তাঁহার তুল্য সৌভাগ্যবতী কে?—কিন্তু কাঁদিলাম, তাঁহার দুগ্ধপোষ্য সন্তানটির জন্য, আর আপনার ভগ্ন-হৃদয়ের জন্য।

আমি নিজের গল্পটি বলিলাম; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি, আপনার হৃদয় বুঝিল না, আপনার অশ্রু থামিল না। আপনি অনেক সময়ে আমাকে উপদেশ দিয়া আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন, কিন্তু আমার বড় আক্ষেপ রহিল, এই শোকের সময়ে দুইটি হৃদয়গ্রাহী কথা বলিতে জানিলাম না! দয়াময় ঈশ্বর! এই শোক-সন্তপ্ত বন্ধু-হৃদয়ে তুমি শান্তি বর্ষণ কর, এই মাতৃত্যক্ত শিশুর জীবন তুমি রক্ষা কর, এবং এই স্বর্গগতা রমণীকে তুমি চরণে স্থান দেও।

প্রিয়তম! আমি আপনাকে বলিয়াছি, আমার কপালটি বড় মন্দ, আমি যে ডালে ভর করি, তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়ে; আমার সন্দেহ হইতেছে, আপনার এই বিপদ উপস্থিত হইল—কেবল আমাকে ভালবাসিয়া, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে স্নেহ করিয়া। নতুবা, সংসারে অনেকেইত, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, কেবল আমাকে যে ভালবাসে, তাহারই বিপদ হয় কেন? আমাকে ভুলিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে আমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বুঝি আপনি সুখী হইতে পারেন।

আপনার অমরাত্মা সহধর্ম্মিণীর জন্য অধিক ব্যাকুল হইবেন না, কারণ ব্যাকুল না হইলেও তাঁহাকে পাইবেন। এখন সন্তানটির যত্ন করুন, এবং তাহার মুখ চাহিয়া প্রিয়-বিরহে ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।"

(২২) ২৭নং মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
১২ই ভাদ্র, ১২৮৯ বাং।

"সহধর্ম্মিণীর বিরহাগ্নি যে এত শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি, কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিরহ-যন্ত্রণার লাঘব হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে প্রবোধবাক্য বলা ধৃষ্টতা মাত্র, কারণ, স্নেহ-প্রবণ হৃদয় ব্যাকুলিত হইলে প্রবোধ স্থান পায় না।

প্রবোধদাতা কেবল নিজের হৃদয়, শান্তিদাতা কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস। যখন গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন তাহার মীমাংসার ভার ঈশ্বরের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই পরামর্শ-সিদ্ধ। আশা করি, আপনার হৃদয়াকাশের নিবিড় মেঘরাশি ক্রমে দূরীভূত হইতেছে।"

(২৩) ১৭নং মদনমিত্রের লেন, কলিকাতা।
১১ই আশ্বিন, ১২৮৯ বাং।

"আপনার শোক সমুদ্রতুল্য, তাহাতে আমার সামান্য পত্র তৃণ বই আর কি? তথাপি আপনি যে ইহা পাঠে প্রীতিলাভ করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্যের চরম, এবং আপনার স্নেহের একশেষ।

যাহার প্রকৃত হৃদয় থাকে, সেই প্রকৃত শোকের গুরুতা অনুভব করিতে সক্ষম, সে প্রকৃত প্রণয়ী; সে বিবাহের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারে। আপনি প্রণয়িণীর মর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কাতর হইয়াছেন, হৃদয়ের প্রকৃত সম্মান করিয়াছেন, ইহাতে আমি দুঃখিত নহি; ইহাতে ভীত হইবারও কোন কারণ নাই; কিন্তু পাছে অধীর হইয়া পড়েন, ইহাই আমার আশঙ্কা।

আপনার পারিবারিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে আপনার পক্ষে বিবাহ অনিবার্য্য, অন্য সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাতাঠাকুরাণীর কথা মনে করিলেই যথেষ্ট, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এ বিবাহে আপনাকে সহজে সুখী করিতে পারিবে না। কিন্তু সকল সময়ে কর্ত্তব্যের সঙ্গে কি সুখ মিশ্রিত থাকে? কর্ত্তব্যের ও সুখের সমবায় ঘটিলে পরম সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই; সেখানে নীরস কর্ত্তব্যকেই সরস মনে করিয়া লইতে হয়। প্রিয়তমার বিরহই যদি সহিতে পারিয়াছেন, তবে বৃদ্ধ মাতা

এবং দুগ্ধপোষা সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া একটি বিবাহের কষ্ট কি সহিতে পারিবেন না ?”

(২৪) খোসেন্দপুর।

৬ই মাঘ, ১২৮৯ বাং।

“প্রায় সকল সভ্য দেশেই এই একটি রোগ দেখা যায় যে, অপরিচিত গ্রন্থকারের গ্রন্থসমালোচনে সমালোচকেরা তত সাগ্রহ নহেন, যেন সাহিত্য-সম্পত্তি তাঁহাদিগেরই আত্মীয় বন্ধুদিগেরই একচেটিয়া। বোধ হয় এই নিয়মানুসারেই বান্ধব, বঙ্গদর্শন, প্রভৃতি বড় বড় কাগজের সম্পাদকেরা মহাপূজার সমালোচনা করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন সম্পাদককে ইহার প্রশংসা করিতে আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, অথচ তাঁহাদের কাগজে ইহার সমালোচনা দৃষ্ট হইল না। বঙ্গবাসীর সম্পাদক আগের পুস্তকখানি হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া আর একখানি পুস্তক চাহিয়া লইলেন, অথচ তাহার সমালোচনা করিলেন না !!

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যত সমালোচনা হইয়াছে, তাহাতে এই বিশ্বাস হয় যে মহাপূজা একেবারে অসার নহে। আমি নিজে ‘বাঙ্গাল’ হইয়া উন্নত-প্রকৃতিক নিম্ন-বাঙ্গালায় যশঃলাভ না করিতে পারিলাম, তাহাতে ক্ষতি নাই, যে শ্রীহট্টবাসীর জন্য মহাপূজা লিখিত হইয়াছে, এবং যাহারা ইহাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহারা ইহার আদর করিলেই আমার অতিরিক্ত ফল লাভ হইল।”

(২৫) খোসেন্দপুর।

৯ই মাঘ, ১২৮৯ বাং।

“আমি বাল্যকালে অর্থাৎ প্রায় ১৫বৎসর হইল এদেশে আসিয়াছি।

সেই সময় হইতে খোসেদপুর নিবাসিনী একজন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বিধবা আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, এবং তিনিও আমাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে, এবং তিনি প্রাচীনা, সুতরাং তাঁহারি প্রতি আমার কর্ত্তব্য কতদূর গুরুতর তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন। একদিন কাতর-শরীরে একাদশীর উপবাসে অধিকতর কাতর হইয়াও, মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া আমার জন্য ভাত রাঁধিতেছিলেন, আমি তাঁহার এই কষ্ট দেখিয়া নিজে রাঁধিতে চাহিলাম, তিনি রাঁধিতে দিলেন না; কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বাবা তুই বিয়ে কর, আমার দুঃখ দূর হউক।" আমি সে দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে বিবাহে তাহার উপকার হইবে না, এমন বিবাহ করিব না। এখন দেখিতেছি, এ দেশে বিবাহ না করিলে তাঁহার উপকার হয় না। পুত্রের বিবাহে মাতা যেরূপ উৎসব করেন, আমার বিবাহে সেইরূপ উৎসব করিতে তাহার ইচ্ছা, সুতরাং সে ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না। ইহাতে আমারও স্বার্থ আছে, কেননা, আমার আর কেহ নাই। বিবাহ করিলে স্ত্রীকে কোথায় রাখিব? কাহার সুশিক্ষায় সে উত্তম গৃহিণীরূপে পরিণত হইবে? দেশে কয়েকটি বিবাহের কথা হইয়া গিয়াছে, অনেকেই বিবাহার্থ নিজে উৎসুখ হইয়া প্রস্তাব করেন, কিন্তু বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে বিদেশে লইয়া যাইব শুনিলে সকলেই পশ্চাৎপদ হন। কাযেই আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে দেশে বিবাহ একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

এদেশেও বিবাহ হওয়া সহজ নহে। আমাদের দেশে যেমন সকলেই বৈদিক; রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নাই বলিলেই হয়, এদেশে সেইরূপ বৈদিক নাই বলিলেই হয়। সুতরাং বৈদিকের বিবাহ হওয়া কিছু কঠিন। তথাপি এক স্থলে বিবাহের কথা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু

আমার বিশেষ পরিচয় দেওয়ার উপায় না থাকাতে তাহা ঘটে নাই। সম্প্রতি আরও দুই এক স্থানে কথা উপস্থিত আছে, কিন্তু সেই আপত্তি। সমাজের অনুরোধ ছাড়িয়া যদি নব্যমতে বিবাহ করিতে যাই, তাহাতে মাতাঠাকুরাণীর যে কি দশা হইবে, তাহা নিজের সম্বন্ধেই বুঝিতে পারেন। আরও ৫।৭ বৎসর বিবাহ না করিলে যে আমার পক্ষে কোন হানি হয়, তাহা আমি মনে করি না; কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর বর্ত্তমান কষ্ট দেখিয়া সহ্য হয় না, একাদশীর উপবাসে উত্থান-শক্তি রহিত হইলে পরদিবস তাঁহার মুখে একবিন্দু জল দেয়, এমন লোক নাই।"

(২৬) ৩৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,

১১ই শ্রাবণ, ১২৯০ বাং।

"এখানে আসিয়াই সংবাদ পাইলাম, ১লা বৈশাখ হইতে মহারাণী মাতা বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিজের জায়গীর পর্য্যন্ত রাখেন নাই, কেবল বার্ষিক ২৭০০০৲ টাকা মাসোহারা মাত্র লইয়াছেন। বঙ্গলক্ষ্মী বাঙ্গলা ছাড়িয়া কাশীবাসিনী হইবেন। ইহা বঙ্গদেশের নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা। সতীত্বের আদর্শ, ধার্ম্মিকের অগ্রণী, দয়ার একাধার— বঙ্গের বক্ষ হইতে এই মহারত্ন স্খলিত হইতে চলিল। এ ক্ষতি সকলেরই সহিবে, কিন্তু হতভাগ্য দীন দুঃখীদিগেরই সহিবে না।

১৬ই বৈশাখ কলিকাতায় পৌঁছছি; তাহার কিছুদিন পরেই সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমা। ঈশ্বর কি হইতে কি করেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। সুরেন্দ্র বাবু যেদিন কারাগারে গেলেন, সেই দিনই ভাবিয়াছিলাম, ভারতবাসী ৫০ বৎসর যত্ন করিয়া যাহা করিতে পারিত না, হাইকোর্টের জজেরা একদিনেই সেই উপকার করিয়া দিলেন। ঈশ্বরের বুদ্ধির নিকট মানুষের বুদ্ধি কত ক্ষুদ্র, এই ঘটনা তাহার বেশ প্রমাণ।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, অমিতশক্তি রাজা অত্যাচারী হইলেই প্রজার মঙ্গল; সেই শক্তি সদয়ভাবে ব্যবহৃত হইলে তাহার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার প্রজার আশা নাই। ঈশ্বর করুন, আমরা যে পরাধীন, ইংরাজেরা যেন তাহা ভুলিতে না দেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ সীলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব। বাল্যকালে এইখানেই ধর্ম্ম জীবনের পরিবর্ত্তন অনুভব করি। এখনও, সেই সময় উপস্থিত হইলেই, যেখানেই থাকি না কেন, হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। সেই সময়ে খোসেদপুরে গিয়াছিলাম। তথায় কয়েকদিন মাত্র থাকিয়া পুঁটিয়াতে যাই।

"সুরেন্দ্র-কারাবাস" দেখিয়া থাকিবেন। উহা কয়েকজন বন্ধু চাঁদা দ্বারা মুদ্রিত করিয়াছেন। উহার লাভ প্রস্তাবিত জাতীয় কোষে প্রদত্ত হইবে। ২০০০ খণ্ডের মধ্যে অনুমানিক ১৬০০ শত বিক্রীত হইয়াছে।"

(২৭) ৩৫নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
৭ই আশ্বিন, ১২৯০ বাংলা।

"আপনার ২৫শে ভাদ্রের পত্র পাইয়া সাশ্রুনয়নে তাহা পাঠ করিয়াছি,—বুঝিতে পারিয়াছি, যে অনির্ব্বাণ শোকাগ্নি আপনার হৃদয়ে তুষানলের ন্যায় জ্বলিতেছিল, পুনর্ব্বিবাহের উদ্যোগে আবার তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। যে হৃদয়ে শরীর-আকৃতি কল্পনার বিষয়ে পরিণত হইতেছিল, আজি যেন তিনি স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ও! কি ভীষণ কল্পনা! একদিন যিনি সর্ব্বস্বের কর্ত্রী ছিলেন, আজি কেহ তাঁহার কথা মুখেও আনিতেছে না! আজি তাঁহার সিংহাসন অন্যে অধিকার করিতে যাইতেছে দেখিয়া সকলে আনন্দে মগ্ন,

সকলে উৎসবে উন্মত্ত! সংসার! তুমি হৃদয়ের পোষণযন্ত্র! হৃদয়হীনতা তোমার অস্থি মজ্জার উপকরণ। প্রকৃতি! তুমি বড় নির্দ্দয়! তুমি হৃদয়ে সাগর-শোষিণী পিপাসা জন্মাইয়া মানুষকে পাগল করিয়া তুল, কিন্তু যাহাতে সেই পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারে, এমন কিছু তাহার জন্য রাখ নাই। মানুষের মহৎ হৃদয় যদি আপনা ভুলিয়া প্রণয়ীর পূজা করিতে যায়, দুষ্ট সমাজ তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাধ্য করিয়া তাহার রসনায় আত্মপূজার মন্ত্র তুলিয়া দেয়।

এই সংসারে,—এই নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম, কঠিন সংসারে, এই আশা-নৈরাশ্যপূর্ণ সংসারে, এই সংযোগ-বিয়োগপূর্ণ সংসারে, এই সম্ভোগমুখ পরিণাম-শোক সংসারে, যতদিন থাকিতে হইবে, ততদিন এই সোণার কমল স্বর্গীয়-উপাদান-নির্ম্মিত হৃদয়কে নৃশংসভাবে মর্দ্দিত এবং পেষিত করিতেই হইবে, অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি সংসার-দানবের চরণে বলি দিতেই হইবে! প্রিয়তম! আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু কল্পনার সঙ্গে পক্ষ মেলিয়া উড়িতে পারি না; কেননা, কল্পনা স্বর্গীয় দেবী, আর আমরা দানবপ্রকৃতিক সংসার-নরকের কীট! আমাদের হৃদয় স্বর্গ; আমাদের বহিরবস্থা নরক; আমরা প্রত্যহ নিজ নিজ প্রকৃতিতে এই স্বর্গ নরকের অভিনয় দেখিতেছি।

কিন্তু সংসারের এই অবস্থা দেখিয়া কি আমরা নিরাশ হইব? সংসারে হৃদয়ের পিপাসা মিটিল না দেখিয়া কি এই স্থির করিব যে, এই পিপাসার পরিতৃপ্তি হইবার স্থান আর কোথায়ও নাই? একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'মানব জন্ম অনন্ত যাত্রার আরম্ভ মাত্র। মানবাত্মা এই সংসারেই নিবদ্ধ নহে, মৃত্যুই মানবাত্মার শেষ নহে। যে অনন্ত উন্নতির কলিকা মানবাত্মাতে মুকুলিত হইয়া রহিয়াছে, অনন্তকাল

ব্যাপিয়া তাহা প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। যে অদম্য পিপাসা প্রজ্বলিত হইয়া মানব হৃদয়কে অস্থির করিতেছে, অনন্তকালের মধ্যে এক সময় তাহা পরিতৃপ্ত হইবেই হইবে। ক্ষুধা হইলে আমরা কি বুঝি? আমরা বুঝিতে পারি অন্নের অভাবেই ক্ষুধা জন্মিয়াছে; যদি অন্নের অভাব না থাকিত, অথবা এক কথায়, যদি অন্ন না থাকিত, তাহা হইলে ক্ষুধাও হইত না; কারণ, যাহা নাই, তাহার অভাবও নাই। এখন হৃদয়ের পিপাসা জন্মিলে কি বুঝিব এই পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার এমন কিছু আছে, যাহা অদ্য না পাই কল্য পাইব, ইহলোকে না পাই পরলোকে পাইব। বাস্তবিক আমি যে পরলোকে বিশ্বাস করিয়া থাকি, ইহাই তাহার ভিত্তি।

সংসারে সকল আশা সফল হয় না বটে, সকল পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না বটে, কিন্তু আত্মার বল সঞ্চয় করিবার পক্ষে সংসার অনুকূল ক্ষেত্র। যেখানে শক্তি পরিচালনা করিবার সুযোগ আছে, সেখানেই তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্ষুর ক্ষৌরকারের নিকট থাকিলে দিনে দিনে ধার সঞ্চয় করে, কিন্তু অপরের নিকট থাকিলে দুইদিনেই নষ্ট হইয়া যায়। সৈন্য প্রকৃতযুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিতে করিতেই সংগ্রামদক্ষ হয়, বাঙ্গালীর মত আজন্ম কোমল শয্যায় শয়ান থাকিয়া কেহ সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। যে মহাসন্তরক সন্তরণ দ্বারা ইংলিস প্রণালী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি মাতৃগর্ভেই সন্তরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন না। পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলে শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে আরও সুবিধা হয়। বলিয়াছি ত, প্রকৃত যুদ্ধে অভ্যস্ত না হইলে সৈন্য দক্ষতা লাভ করিতে পারেনা, কৃত্রিম যুদ্ধে কেবল অস্ত্রচালনা শিখিতে পারে মাত্র। ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরা যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না হইত, তাহা হইলে

ইলবার্ট বিল দ্বারা আমাদের কি উপকার হইত? বর্ত্তমান আন্দোলন ব্যতীত ইহার এক আনা উপকার হইত কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে প্রণয় বিরহের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই, অথবা বিরহের আগুনে দগ্ধ হয় নাই, সে প্রণয় স্থায়ী হইতে সক্ষম হইয়াছে কি না সন্দেহ। যে পুণ্য পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে নাই, অথবা পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হয় নাই, সে পুণ্য মানবের চরিত্রে স্থানলাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ। মূল কথা, যে পরিমাণে দুঃখ সেই পরিমাণে সুখ, যে পরিমাণে যুদ্ধ সেই পরিমাণে জয়লাভ, যে পরিমাণে উদ্যম সেই পরিমাণে পুরস্কার, ইহাই মানবপ্রকৃতির নিয়ম। আমরা সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি না, সকল সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারি না সত্য; কিন্তু আমরা সর্ব্বত্র যথাশক্তি উদ্যম করিতে পারি। কার্য্যের ফলাফল আমাদের আয়ত্ত নহে; কেবল উদ্যম মাত্রেই আমাদের প্রকৃত অধিকার।

আপনার হৃদয় অতি প্রশস্ত, আপনার অনুরাগ অতি গভীর, আপনার পিপাসা অতি দূরব্যাপিনী। এই ক্ষুদ্র সংসারে সেই হৃদয়ের সমাবেশ হইবে, সেই অনুরাগের তুল্য-প্রতিদান মিলিবে, সেই পিপাসার পরিতৃপ্তি হইবে, ইহা অসম্ভব। এই অসম্ভবকে আংশিকরূপে সম্ভব করিবার জন্যই এত শীঘ্র পরলোকের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিল। আপনার হৃদয় আপনার সঙ্গে ইহলোকে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার কেন্দ্র পরলোকে। হৃদয়ের কেন্দ্র কি? যাহা হৃদয়কে আকর্ষণ করে—আশা, ভরসা, স্নেহ, মমতা, প্রণয়, ভালবাসা, বিশ্বাস, ভক্তি—এ সমস্তের সহিত যাহা হৃদয়কে অনবরত টানে। বিশ্বাসী মাত্রেরই হৃদয়ের এই কেন্দ্র, হৃদয়ের এই আকর্ষণী শক্তি অল্প বা অধিক পরিমাণে পরলোকে নিবদ্ধ আছে। আপনার নিজের বিষয়ে

চিন্তা করিয়া দেখুন। আকর্ষণের মূল শক্তি ঈশ্বর, এবং আকর্ষণের প্রধান শাখা প্রণয়িনী, উভয়েই পরলোকে, সুতরাং আপনার হৃদয় যে ছিন্ন ভিন্ন হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? এই সূর্য্য সৌরজগৎ ছাড়িয়া অনন্ত আকাশের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া যদি পড়ে, তাহা হইলে এই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখুন।

আপনার জীবনে বিরহের অগ্নি-পরীক্ষা অতীত হইয়াছে, আপনি তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমার যেন বোধ হইতেছে, সম্ভোগের সময়ে আপনার প্রণয় যেরূপ ছিল, বিরহান্তে তাহা অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় হইয়াছে,—অথবা, সম্ভোগের সময় অপেক্ষা বিরহের সময়ে আপনি তাহার শক্তি অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম, তাহাই যে ধ্রুব সত্য, এমত নহে, আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার প্রকৃত উত্তর পাইবেন। আমি যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিরহ মঙ্গল কি অমঙ্গলের বিষয়, ইহা আপনিই বিচার করিবেন। শোক বড় পবিত্র বিষয়। শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করিতে পারিলে ভাল; কিন্তু বিষয়টি এত কোমল, এত গুরুতর যে, অনেক মূর্খ বন্ধু শোকের লাঘব করিতে যাইয়া গুরুত্ব করিয়া ফেলেন। এ বিষয়ে আমি বড় দুর্ব্বল, শোকার্ত্ত বন্ধুর সম্মুখে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। আপনি হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যে দিনই আপনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপনার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর কথা তুলিয়াছেন, সে দিনই কেবল নীরবে শুনিয়াছি, একটি কথা বলি নাই, এই ভয়ে, পাছে ভাল করিতে যাইয়া মন্দ করিয়া বসি। অনেকে হয়ত শোক পরিত্যাগ করিতে, স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীকে বিস্মৃত হইতে বলিবেন; কিন্তু আমি তাহা বলিব

না; প্রকৃত প্রণয়ের অপমান করিতে, হৃদয়কে পদতলে দলিত করিতে, আমি বলিব না।

এখন প্রশ্ন এই,—প্রণয়কে অপমানিত না করিয়া, হৃদয়কে দলিত না করিয়া, আপনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন কি না? এস্থলে দেখিতে হইবে যে, কেবল দাম্পত্য প্রেমই হৃদয়ের সর্ব্বস্ব নহে। অপত্যস্নেহ, মাতৃভক্তি, প্রভৃতি কি হৃদয়ের সম্পত্তি নহে? আবার অনেক সময়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধি হৃদয়ের প্রতিকূলে চলে; যখন সেই কর্ত্তব্য-বল অধিক থাকে, তখন অগত্যা হৃদয়ের অনুরোধ কিছু কমই মানিতে হয়। কর্ত্তব্যের বুদ্ধিই মানুষকে মহৎ করিয়াছে; কর্ত্তব্যবুদ্ধি ছাড়িয়া কেবল হৃদয় লইয়া চলিলে মানুষের অবস্থা হয়ত বড় শোচনীয় হইত। অবশ্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের সহানুভূতি থাকিলে বড়ই সুখের হয়; কিন্তু দগ্ধ সংসারে মানবের পোড়া অদৃষ্টে এ সুখ সকল সময়ে ঘটে না! কর্ত্তব্যের অনুরোধে হৃদয়ের কথা না শুনিলে তাহাতে হৃদয়ের অপমান হয় না; রিপণ সাহেবের অনুরোধে টম্‌সন্ সাহেবের কথা রাখিতে না পারিলে তাহাতে অপমান বোধ করা টম্‌সন্ সাহেবের অন্যায়।

এখন আপনার দ্বিতীয় পত্নীর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। প্রাকৃতিক নিয়মে ইনি আপনাকে সম্পূর্ণ হৃদয় অর্পণ করিতে বাধ্য, এবং প্রতিদানে আপনার সমস্ত হৃদয় লাভের অধিকারিণী। দেখিবেন, যেন এই নিরপরাধিনী বালিকার প্রতি প্রণয়দানে কৃপণতা না হয়। ইহাতে আপনার পূর্ব্ব প্রণয়িনীর অসন্তোষের কারণ নাই। সঙ্কীর্ণ সংসারেই প্রণয়ের সঙ্কীর্ণতা; যাঁহারা পরলোকে বাস করেন, তাঁহারা এ সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত। পরলোকে প্রণয় আছে, কিন্তু সে প্রণয় কেবল আধ্যাত্মিক; তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক নাই, তাহাতে পার্থিব

সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক প্রণয়িনী

সংস্পর্শ নাই, সুতরাং তাহাতে ঈর্ষ্যা নাই, দ্বেষ নাই, ঘৃণা নাই, বিরক্তি নাই। সাংসারিক প্রণয়িনী অনেক সময়ে অকারণে সপত্নীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রণয়িনী এত উদার, এত প্রশস্তমনা এত স্বার্থবোধশূন্য যে, তাঁহার নিকটে ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্ষমা এবং ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে ভালবাসারই প্রত্যাশা করা যায়।

ঈশ্বর আপনার হৃদয়ের বিশ্বাস দৃঢ় করুন, এই প্রার্থনা। যখন বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যাইবে, অর্থাৎ যখন ইহলোকে পরলোকের সম্বন্ধ এক হইয়া যাইবে, তখন হৃদয়ে অশান্তি স্থান পাইবে না। অনন্ত সংযোগের সঙ্গে ক্ষণিক বিয়োগের তুলনা করিলে কাহার হৃদয়ে অশান্তি থাকিতে পারে?"

(২৮) ৩৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,

কলিকাতা। ১৫ই আশ্বিন, ১২৯০ বাং।

"সময় নিরূপণের জন্য ঘড়ি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে ইহার উপকারিত্ব অতুল। কিন্তু ইহার বর্ত্তমান মূল্য যেরূপ, তাহাতে উহা ক্রয় করিয়া উপকার লাভ করা দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। আমি তীব্ররূপে ইহার অভাব অনুভব করিয়া একটি জল-ঘড়ির আবিষ্কার করিয়াছি, কিন্তু এ আবিষ্কার কেবল সঙ্কল্পেই রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিবার অবকাশ পাই নাই। তবে ভরসা এই, ইহার গঠন প্রণালী যেরূপ সহজ, তাহাতে সহজেই কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। ইহার মূল্য এক টাকার অধিক না হইবারই সম্ভব। অন্য ঘড়ি যেমন সহজে বিগড়িয়া যায়, ইহাতে তাহারও সম্ভব নাই, সুতরাং কাঁচপাত্র যত্ন করিয়া রাখিলে যতদিন যায়, ইহাতেও ততদিন যাইতে পারে।

জল-ঘড়ির আবিষ্কার

এ সমস্ত বর্ণনা করিয়া গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, এবং তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম যে, যদি

গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি ঘড়ি পাঠশালায় ব্যবহারের জন্য ক্রয় করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি ঐ আবিষ্কার রেজিষ্টারি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। সেই পত্রের উত্তরে আসিষ্টাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি লিখিয়াছেন ;—

*   *   *   *

এখন আমার জিজ্ঞাস্য :—

১। গভর্ণমেণ্ট আমার প্রার্থনামতে পাঠশালার ব্যবহারের জন্য ঘড়ি কিনিতে প্রস্তুত না হইলে ইহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা ?

২। রেজিষ্ট্রেসনের নিয়ম কি ? ইহাতে কত টাকাই বা লাগে ?

৩। সমাজে ইহার আদর হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় কি ?

যদিও জানিতে পারিতেছি, অর্থাভাবে জীবনের অধিকাংশ কল্পনাই স্বপ্নের ন্যায় নিরর্থক হইবে, তথাপি সাধু সঙ্কল্প লইয়া কল্পনা করিতে ক্ষতি কি ? আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার এ সঙ্কল্পও অর্থাভাবে অবশেষে কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

আমি ইহা অন্য কাহাকেও জানাই নাই, ইচ্ছা করি, আপনিও না জানান। বৃথা হাস্যাস্পদ হইয়া ফল কি ? এ জন্যই পণ্ডিতেরা বলেন ;—

"মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।"

(২৯)

৩২নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,
কলিকাতা। ২৯শে চৈত্র, ১২৯০ বাং।

"আমি জানি, আপনার হৃদয়ে দয়ার ভাগ কিছু অধিক, যাহাদের দয়া অধিক, অর্থ-স্বাচ্ছল্য তাহাদের অদৃষ্টে প্রায় ঘটে না। তবে ইহা

বিবেচনা করা উচিত যে পরের প্রতি যেমন কর্ত্তব্য আছে, নিজের প্রতিও সেইরূপ কর্ত্তব্যই আছে, একটিকে তাচ্ছিল্য করিয়া আর একটির অধিক পোষণ করা সকল সময়ে উচিত না হইতে পারে।"

(৩০) শিলচর।

৮ই শ্রাবণ, ১২৯১ বাং।

"আমার স্ত্রীর বয়স ১২ বৎসর চারি মাস হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে ইহারও অধিক বোধ হয়। গৌরবর্ণা এবং কৃশাঙ্গী। রন্ধনাদি গৃহকার্য্য মন্দ জানে না। লেখাপড়ার কথা আপনার অবিদিত নাই। দেখিয়া শুনিয়া যতদূর বোধ হয়, তাহাতে সে আমার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইবে বলিয়াই বিশ্বাস। লজ্জা এত অধিক যে অনেক সময় তাহা বিরক্তিরই কারণ হইয়া উঠে। তাই বলিয়া আমি নির্লজ্জতার পক্ষপাতী নহি। যদি অন্নজল না ছাড়িয়া এবং অবিশ্রাম না কাঁদিয়া আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

তাহার দৈনিক কার্য্যের একটি তালিকা পাঠাইলাম, ইহা হইতেই তাহার শিক্ষাপ্রণালী বুঝিয়া লইবেন।"

(৩১) ৭০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা। ৪ঠা শ্রাবণ, ১২৯২ বাং।

"দুঃখময় সংসারের একমাত্র যে স্থানে বিশুদ্ধ অবিমিশ্র শান্তির আশা করা যায়, সে স্থানে যদি অশান্তির একটি নিশ্বাসও প্রবাহিত হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা! কিন্তু, এ দুঃখ যেন বিধাতারই অভিপ্রেত। স্বার্থময় প্রতারণাময় সংসারে বিশুদ্ধ শান্তির আশা কল্পনা মাত্র। ছোটঘরের মেয়েদের স্বভাবে যে উদ্ধত ভাব নাই, একথা মনে করিবেন না।

তবে কিনা, সংসার ব্যবসায়ের স্থান ; এ সংসারে সকল বিষয়েই কিছু ছাঁটছুট দিয়া কোন প্রকারে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাইয়া সরিয়া পড়িতে পারিলেই হইল। বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহিত জীবনকে যেরূপ কল্পনার চক্ষে দেখিতাম, এখন আর সেরূপ কল্পনার চক্ষে দেখি না ; পূর্ব্বে যাহাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম, এখন দেখিতেছি, সেও আমারই মতন মানুষ !! এখন ভয় হইতেছে, পাছে অশিক্ষিত রমণীর পাণিগ্রহণ করি নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় ! সহধর্ম্মিণীর পত্রলাভে মধ্যে মধ্যে অনুগৃহীত হইয়া থাকি।"

(৩২) ৭০নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ৩০শে ভাদ্র, ১২৯২ বাং।

গৃহিণী ও অবাধ্যতা

"ভাল গৃহিণী হওয়াই স্ত্রীলোকের প্রশংসা। কি ধনীর ঘর, কি দরিদ্রের ঘর, সর্ব্বত্রই গৃহিণীর প্রয়োজন ; যে স্ত্রী গৃহিণী নহেন, তিনি থাকিয়াও নাই, তাঁহার স্বামী গৃহবাসী হইয়াও শ্মশানবাসী। স্ত্রী-চরিত্রে অবাধ্যতা বড় দোষ।"

(৩৩) গৌহাটী।
৩২শে শ্রাবণ, ১২৯৫ বাং।

"আপনি আমার যে গৃহসুখের পত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, আজ হইতে তাহার শেষ হইল। এত শীঘ্র যে এমন সর্ব্বনাশ হইবে জানিতাম না। অদ্য পুণ্যাহে পুণ্যমুহূর্ত্তে দিবা ১০ ঘটিকা সময়ে তীর্থময় গৌহাটি নগরে পুণ্যশীলা বিদ্যাধরী আমার সহধর্ম্মিণী মুক্তকেশী দেবী স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার স্বর্গার্থ আপনারা চাঁদমুখে একবার হরি হরি বলুন।"

চতুর্থ অধ্যায়।

শরচ্চন্দ্র এখন আর বালক নহেন, তিনি এখন বালকদিগের শিক্ষার ভার লইয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি মহারাণী শরৎ-সুন্দরীর আশ্রয় লাভ করিয়াই বিদ্যার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। মহারাণী-মাতা শরচ্চন্দ্রকে যেরূপ পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন, শরচ্চন্দ্রও তদনুরূপ তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ১২৯২ সালের মাঘ হইতে ১২৯৯ সালের মাঘ পর্য্যন্ত শরচ্চন্দ্র পুঁটিয়া স্কুলের শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

শরচ্চন্দ্রের পুঁটিয়ার এবং তথাকার অধিবাসীর উপর আন্তরিক ভালবাসা ছিল, এবং বিধির বিধানে সেইখানেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া যাওয়ার তিনি উৎসাহের সহিত নিজকার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ফলবতী করিবার সুযোগও পাইলেন। আদর্শ শিক্ষক হইতে গেলে আদর্শচরিত্রও হওয়া চাই; এবং কিসে নৈতিক শিক্ষা দ্বারা ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, তাহারও উপায় অবলম্বন করা প্রকৃত শিক্ষকের কার্য্য। শরচ্চন্দ্র সনাতনধর্ম্ম পথে থাকিয়া, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া, কুটীরবাসী হইয়া স্বপাক অন্ন ভোজন করিতেন। তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক সরলতায়, এবং সর্ব্বদা সহাস্য বদনে সকলের সহিত মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে পিতৃতুল্য প্রগাঢ় ভক্তি করিতে লাগিল।

শরচ্চন্দ্রের কলিকাতায় পাঠাভ্যাস করিবার সময়ে তাঁহার কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সাংসারিক ও মানসিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রথমে সম্মত হইতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহার বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে এবং সদ্বংশ-

সম্ভবা একটি বিদুষী বালিকার সহিত বিবাহের প্রস্তাবে তিনি অগত্যা সম্মত হইয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্রের কেহ অভিভাবক ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার নিজের মতের উপরই সমস্ত নির্ভর করিত। প্রস্তাবিতা পাত্রীর গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার মনের বাধা আর স্থান পাইল না। এক বৎসরকাল বিবাহ স্থগিত ছিল—তাঁহার বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষকতাকার্য্য প্রাপ্ত হওয়ায় সকল বাধা দূরীভূত হইল এবং বিবাহের প্রস্তাব তখন আরও ঘনীভূত হইল। শরচ্চন্দ্র একখানি "অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থের মুখপত্রে স্বরচিত একটি কবিতা লিখিয়া উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়া বিবাহ করিতে সম্মতি দান করিলেন। সে কবিতাটি এই :—

অজ্ঞাত-চিত্ত প্রসরাপ্যুদারা
অদৃষ্ট-রূপাপি সমর্চ্চনীয়া।
অশ্রোত্রগম্যাপি সুমিষ্টকণ্ঠা
সুহৃৎপ্রধানা প্রতিভাতি যা মে॥
অব্যক্তভাবাদনিবেদ্য রাগঃ
সোৎকম্পহস্তং সমধীর চিত্তম্।
তস্যৈহি সানন্দ সমাদরেণ।
সমর্পিতঃ স্যাদুপহার এষঃ॥

'যিনি অজ্ঞাত-চিত্তবৃত্তি হইয়াও সরলা, অদৃষ্টরূপা হইয়াও অর্চ্চনীয়া, এবং সুমিষ্টকণ্ঠা প্রধানা সুহৃদ্রূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছেন, অপরিজ্ঞেয়াভিপ্রায় হেতু অনুরাগ জানাইতে না পারিয়া সকম্পহস্তে ব্যগ্রচিত্তে আনন্দ ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে এই উপহার প্রদত্ত হইল।'

শরচ্চন্দ্র বাংলা ১২৯১ সালের ২৬শে আষাঢ় বুধবার তারিখে (ইং ১৮৮৪, জুলাই মাসে) শিলচর গভর্ণমেণ্ট সদর বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান

পণ্ডিত ৺ ভারত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিদুষী কন্যা ৺ মুক্তকেশী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তখন দেবী মুক্তকেশীর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ হইয়াছিল। মুক্তকেশী সর্ব্বদা পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন এবং ধর্ম্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন। সংস্কৃত পাঠের উপর তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অল্পবয়সেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মাতাপিতার স্বভাব অতি উচ্চ ছিল, এবং মুক্তকেশীও সেই আদর্শে নিজের চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার মুক্তকেশী দেবীর পিতা ৺ ভারত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"আমি স্কুলে আপনার কন্যাকে দেখিয়াছি এবং তাহার উত্তরও শুনিয়াছি। তাহার অপেক্ষা অধিক বয়সের বালকের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সে তাহার বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিয়াছে। ইউরোপীয় রীত্যনুসারে আপনার কন্যার এখনও বিবাহের উপযুক্ত বয়স হয় নাই বটে, কিন্তু তথাপি এই সম্বন্ধে আমি সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। এই বালিকা সম্বন্ধে ইহার স্বামী গর্ব্ব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। মূর্খ ও নিরক্ষর ব্যক্তির পরিবর্ত্তে একজন সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী বালিকাকে জীবনের সঙ্গিনী পাওয়াতে তাঁহাকে বাস্তবিকই সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।"

দেবী মুক্তকেশীর জীবনীতে গ্রন্থকর্ত্তা বিবাহের সময় শরৎবাবু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"স্বামী (শরৎ বাবু) শিশুকাল হইতেই পিতৃহীন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব-বিবর্জ্জিত হইয়া দেশ দেশান্তরে পরিচালিত ও উদাসীনবৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল। তিনি এখনও বিদ্যালয়ের ছাত্র, আড়ম্বরশূন্য, পবিত্র কুমারবেশেই ইঁহার একান্তঃপরিচিতি। তাঁহার যেমন কোন বিষয়কর্ম্ম

নাই, কোন রীতিমত কোন অবাধ্যতাও নাই। তবে আছে কি? আছে মাত্র—তিনি একজন সৎলোক, তাঁহার ইচ্ছা সৎ, প্রকৃতি মহৎ ও জীবনের লক্ষ্য অতি উচ্চ।"

বিবাহের পরে শরৎবাবু এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, "এখন আমার প্রধান ব্রত শ্রীমতীর শিক্ষার সমাপ্তি। আপনি (তাঁহার শ্বশুর মহাশয়) এযাবৎ তাহার শিক্ষার জন্য যে যত্ন করিয়াছেন আমার দোষে আপনার সে যত্ন বিফল না হয়, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। বাঙ্গালী বালিকা অল্পবয়সেই বিবাহিতা হইয়া গৃহিণী ও সন্তানবতী হয়, এজন্য তাহার শিক্ষা হইতে পারে না। আধুনিক সংসারিকেরা এই যুক্তি দেখাইয়া কন্যাদিগকে ২০।২২ বৎসর পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতেছেন। আমার ইচ্ছা, হিন্দুসমাজের প্রচলিত নিয়মে বিবাহ সম্পন্ন হইলেও ইচ্ছা থাকিলে স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, অথচ সে শিক্ষা রমণী জীবনের একান্ত উপযোগিনী, এই সত্যটী শ্রীমতীর জীবনে সপ্রমাণ করা। আমার বিশ্বাস, যদি আমরা কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহাকে এই পবিত্র পথে অগ্রসর করাইতে পারি, তবে আমাদের এ আশা অপূর্ণ থাকিবে না।" শরৎবাবু ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে পত্র লিখিয়া দেবী মুক্তকেশীর পুরাণ পরীক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালের ফাল্গুন মাসে পরীক্ষা দেওয়ার সময় অবধারিত হইয়াছিল। বিবাহের পর বৎসর (১২৯২ সালে) মুক্তকেশী মাতাপিতার নিকট হইতে অতিকষ্টে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বামীর সহিত পতিগৃহে গমন করিলেন। শরচ্চন্দ্র প্রথমে খোর্সেদপুরে গমন করিয়া দেবী মুক্তকেশীকে তাঁহার খোর্সেদপুরের মাতাকে দর্শন করাইলেন; এবং সেখানে সেই দেবীগৃহে কিছুদিন সস্ত্রীক বাস করিবার পর উভয়ে পুঁটিয়া গমন করিলেন। সেখানে দেবী মুক্তকেশী মহারাণীমাতা শরৎসুন্দরীর দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহারই

আশ্রয়ে স্বামীর সহিত মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন শরচ্চন্দ্র সেখানে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেছিলেন এবং বেতনের দ্বারা কোনরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি স্বয়ং পূর্ব্বেও যেভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্ম-কার্য্য করিতেন, এখনও সস্ত্রীক সে সমস্তই করিতে লাগিলেন এবং দেবী মুক্তকেশীকে সংশিক্ষা এবং সদুপদেশ দিয়া তাঁহাকেও আদর্শ সহধর্ম্মিণীর মত গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

কিন্তু ভগবৎ ইচ্ছায় ঐরূপ মনের সুখে তাঁহারা অধিকদিন থাকিতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে শরচ্চন্দ্রের শরীরে পীড়ার আক্রমণে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল; এবং স্থানীয় জলবায়ুর দোষে দেবী মুক্তকেশীরও শরীর অসুস্থ হইতে আরম্ভ করিল। বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিরূপ ভীষণ, তাহা বঙ্গদেশের অধিবাসীমাত্রেই অবগত আছেন। দেবী মুক্তকেশীর পিতামাতার নিকটে যাইবার প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে উঠিত বটে; কিন্তু স্বামীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজের শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পুঁটিয়া ত্যাগ করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইতেন না। পরে যখন নিজের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং স্বামীর শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিলেন, তখন পিতামাতার নিকট যাইতে সম্মত হইলেন। ১২৯৪ সালের শীতের প্রারম্ভে দেবী মুক্তকেশী গৌহাটীতে পিতামাতার নিকট গমন করিলেন। তখন তাঁহার পিতা গৌহাটী হাইস্কুলের পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। গৌহাটীতে কিছুকাল অবস্থিতির পর মুক্তকেশীর শরীর কিছু সুস্থ হয়। তখন তিনি শ্রীহট্ট সম্মিলনীর নির্দ্দিষ্ট ৭ম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাহার পর তিনি ভট্টিকাব্য ও মুগ্ধবোধ প্রায় সমাপ্ত করেন।

আশ্বিন মাসে তিনি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, ধাত্রীর অসাবধানতাবশতঃ ঐ সন্তান নষ্ট হইয়া যায়।

শরচ্চন্দ্র সেই সময় একবার গৌহাটীতে গিয়াছিলেন এবং কয়েকদিবস থাকিয়া দেবী মুক্তকেশীর শুশ্রূষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া যান। তাহাতে দেবী মুক্তকেশী অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিলেন।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে পর দেবী মুক্তকেশী নিকটস্থ তীর্থস্থান কয়টী পরমানন্দে দর্শন করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মস্পৃহা সবিশেষ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। পিতার নিকট থাকিয়া উপাসনা কীর্ত্তনাদিতে এবং পুরাণ পরীক্ষার জন্য আবশ্যকীয় পুস্তকাদি পাঠে সর্ব্বদাই আনন্দের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১২৯৫ সালের ফাল্গুন মাসে পুরাণ পরীক্ষার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল!

১২৯৫ সালের শ্রাবণ মাসের শেষে দেবী মুক্তকেশী বিসূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হন। দেখিতে দেখিতে দেবীর এক ভ্রাতা ও ভগিনীর ঐ পীড়া হয়। সংবাদ পাইয়া ২৮শে শ্রাবণ রাত্রিতে শরৎবাবু গৌহাটীতে পৌঁছিলেন। স্বামী সন্দর্শনের জন্যই যেন সতী অপেক্ষা করিতেছিলেন। ৩০শে শ্রাবণ দেবী মুক্তকেশীর ভ্রাতা পরলোক গমন করিলেন, এবং ৩২শে শ্রাবণ দেবী মুক্তকেশী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। শরচ্চন্দ্র স্বয়ং সেই সতীর সৎকারকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দেবী মুক্তকেশীর এক ভগিনীও ঐ সময় পরলোক গমন করেন।

শরচ্চন্দ্র দেবী মুক্তকেশীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইবার কয়েক দিবস পরে শূন্যহৃদয়ে পুঁটিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। সাহিত্যিকপ্রবর মৈত্রেয় মহাশয় "কমলা"য় শরচ্চন্দ্রের তাৎকালিক অবস্থা এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছেন —"শরচ্চন্দ্রের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল তাহা বর্ণনাতীত। অল্পকাল পরে যখন তাঁহার কুটীর প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম তখন এক নূতন জগৎ

দর্শন করিলাম। সে জগতে আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, উদ্যম নাই, আগ্রহ নাই, তাহা মুক্তকেশীর স্মৃতিবিজড়িত এক শবসাধনার মহাশ্মশান, তাহাতে সন্ন্যাসী শরচ্চন্দ্র আসন পাতিয়া যোগ-ধ্যানে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। সংসারের কাজকর্মে আসক্তিবিহীন শরচ্চন্দ্রের জীবনে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল, বাহিরের লোকে তাহার সন্ধান লাভ করিতে পারিল না। তিনি তখন সমবেদনায় অতীতলোকে মুক্তকেশীধ্যানে আত্মহারা, তাঁহার মুক্তকেশ-রচিত বেণী ও তাঁহার প্রিয় বস্ত্রাদি আসন এবং তাঁহার অস্থিখণ্ড-গ্রথিত জপমালা লইয়া শরচ্চন্দ্র সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সহসা ইহার পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টা করিলেও হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে, তজ্জন্য কিছুকাল তাঁহাকে ইচ্ছামত চলিতে দিয়া, পরে ধীরে ধীরে আলোচনার সূত্রপাত আরম্ভ করা গেল। অল্প সময় মধ্যেই শরচ্চন্দ্র মুক্তকেশীর পার্থিব কণ-ভঙ্গুর অস্থিমালা প্রভৃতি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া ধ্যানমাত্র সম্বল করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।"

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশী আদর্শ সাধু চরিত্র সম্বন্ধে নিজ হস্তে কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ শ্লোক কয়টী এই :—

"যথালব্ধোপি সন্তুষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরিপাদাশ্রয়োলোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দকঃ॥
ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তুলক্ষণং॥
ত্যক্তাত্মা সুখভোগেচ্ছা সর্ব্বসত্ত্ব সুখৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবো নিত্য দুঃখিতাঃ॥

শরচ্চন্দ্র ঐ কয়েকটী শ্লোক পাইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"স্বর্গীয়া মুক্তকেশীর সুন্দর হস্তলিখিত যে কয়েকটী শ্লোক পাঠাইয়াছেন, তাহা

অমূল্য উপহার মনে করিয়া গ্রহণ করিলাম। তিনি সাধুর লক্ষণ যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। আহা, এমন সুন্দর আত্মা আর এ পৃথিবীতে দেখিব না। যাহা হউক, সাধুর লক্ষণ এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ তিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপদেশ মনে করিয়া জীবন এইরূপ সাধুত্বে এবং ব্রাহ্মণত্বে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।"

পত্নীবিয়োগের কিছুকাল পরে শরচ্চন্দ্র কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া দেশে সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের জন্য 'শিক্ষাপরিচর' নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। বালকদিগের শিক্ষার উন্নতি এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শরচ্চন্দ্রের এক বিশেষ বন্ধু 'কমলা'তে এইরূপ লিখিয়াছেন :—'শিক্ষাপরিচরে'র লেখা মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ, বিষয় সকল সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ ছিল। 'শিক্ষাপরিচরে'র ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা সেই সময় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি দক্ষতার সহিত কয়েক বৎসর 'শিক্ষাপরিচর' চালাইয়াছিলেন, তৎপরে আর্থিক অভাবপ্রযুক্ত 'শিক্ষাপরিচর' চালান দুষ্কর মনে করিয়া বলিয়াছিলেন 'ক্ষতি-লাভ' গণনা করিয়া সাহিত্য-ব্যবসা খুলিবার অভিপ্রায়ে 'শিক্ষাপরিচর' জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহা হইলে পল্লীগ্রামের জীর্ণ কুটীরে বসিয়া কেবল শিক্ষা সংক্রান্ত নীরস কচ্‌কচির দোকান খুলিবার পরামর্শ কেহই দিতনা, আমরা সেবার অধিকারী, সেবার গুরুতর দায়ে দায়ী। শিক্ষানীতির সমুচিত আলোচনা হইতেছে না, কিসে শিক্ষার উন্নতি হয়, কিসে অবনতি হয়, কেহই ধরাবান্ধা করিয়া তাহার জন্য আন্দোলন করিতেছে না, অথচ শিক্ষাই জাতীয় জীবনের মূলশক্তি; তাই আমরা শিক্ষার পরিচর্য্যার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলাম। এখন নিজের

দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টার ন্যায় বড়ই উচ্চ লক্ষ্যের দিকে ক্ষুদ্র বাহু প্রসারণ করিয়াছি। পরিচর্য্যা করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, আজিও সে মহাশক্তি আমাদের মধ্যে আইসে নাই, তাই শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য কিছুদিনের অবসর গ্রহণ করা প্রয়োজন, আত্মশিক্ষার জন্য কিছুদিনের বিদায় প্রার্থনীয়। যদি ভগবানের কৃপায় ও দশজনের আশীর্ব্বাদে সে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, আবার 'শিক্ষাপরিচর' হাতে লইয়া পাঠকগণকে অভিবাদন করিব; নিঃস্বার্থভাবে দেশের কল্যাণকামনায় অগ্রসর হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে আমরা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সে ঋণ পরিশোধ না করিয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি না, তাই কিছুদিনের জন্য বিদায় চাই।"

১২৯৬ সালে 'শিক্ষাপরিচর' প্রথম বাহির হয়। ১২৯৮ সালের চৈত্র মাসে উপরোক্তরূপ মন্তব্য করিয়া একবার 'শিক্ষাপরিচর' বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পুনরায় ১৩০১ সালে 'শিক্ষাপরিচর' কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। সাহিত্যিক-প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় শিক্ষা-পরিচর-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। 'গঙ্গাধর নিকেতনের' কবিরাজ ৺রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন মহাশয় কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় অল্পকাল পরেই উহা আবার বন্ধ হইয়া যায়।

১৩০১ সালেই শরচ্চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বঙ্গভাষা প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই বিষয় তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্‌সেলার স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের নিকট উত্থাপন করা হইয়াছিল। তাঁহার সহানুভূতি সত্ত্বেও ঐ মত তখন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। এতদ্দিনে শরচ্চন্দ্রের ইচ্ছা ফলবতী হইবার আশা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শরচ্চন্দ্র জানিতেন না তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপে কাটাইতে হইবে, তাঁহার পত্নী ৺ দেবী মুক্তকেশী শীঘ্রই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার ভবিষ্যজীবন কিরূপে গঠিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার স্বরচিত 'জীবন-আদর্শ' রচনায় বুঝিতে পারা যায়। ঐ 'জীবন-আদর্শে' যাহা লেখা আছে তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

'জীবন-আদর্শ'

"আমি সংসারে প্রবেশ করিয়াছি, দাম্পত্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত সঙ্গিনী পাইয়াছি, জীবনের দূরপথ অতিক্রম করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতিলাভই জীবনের কার্য্য, ঈশ্বর-প্রাপ্তিই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কার্য্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী উপায় আজিও কিছু অবলম্বন করিলাম না। সময় চলিয়া যাইতেছে, জীবন নশ্বর, উপযুক্ত সময় চলিয়া গেলে পরিণামে পরিতাপ ব্যতীত উপায় থাকিবে না। অতএব কি প্রণালীতে জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা এখনই অবধারণ করিয়া রাখা এবং তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

জীবনের কার্য্যাবলীকে সামান্যতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক। অধিকাংশ মনুষ্য সংসারানুরাগে ধর্ম্মত্যাগী, কেহ কেহ বা ধর্ম্মানুরাগে সংসারত্যাগী; আমার ইচ্ছা, আমি এই উভয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিব। এরূপ করা কিছু কঠিন,

সুতরাং এজন্য বিশেষ নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সুখ এবং সৌভাগ্যের বিষয়, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালী এবিষয়ে অনেক সাহায্য করিবে। আত্মার সঙ্গে সংসারের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, এ বিষয়ে তিনি জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

সাংসারিক কার্য্য।

জীবন-ধারণ, পরিবার-প্রতিপালন, সন্তানোৎপাদন এবং সন্তানের শিক্ষা ও জীবিকার উপায়-নির্দ্ধারণ, এইগুলি পারিবারিক; আর সমাজ-সংস্কার, জ্ঞান-বিস্তার, সমাজের সুব্যবস্থা-বিধান প্রভৃতি কার্য্য সামাজিক। সমাজের বন্দোবস্ত এমন সুন্দর যে একমাত্র অর্থসংস্থান হইলে সমস্ত পারিবারিক কর্ত্তব্য আপনিই সম্পন্ন হইতে পারে। আবার সেই বন্দোবস্তের আরও সৌন্দর্য্য এই যে, সামাজিক কার্য্য করিতে গেলে আপনা হইতে অর্থ সংস্থান হইয়া যায়। কৃষি, বাণিজ্য, হাকিমী, ওকালতী, ডাক্তারী, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা সমাজপালন এবং অর্থোপার্জ্জন, এই দুই কার্য্যই যুগপৎ সম্পাদিত হয়।

কিন্তু এই সকল কার্য্য বা ব্যবসায়ে আধ্যাত্মিকতা নাই। যাঁহারা এই সকল কার্য্য অবলম্বন করিয়াও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিকতা অত্যন্ত প্রবল বলিতে হইবে। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প,—এত অল্প যে নাই বলিলেও চলিতে পারে। বরং কার্য্যস্থলে ইহার বিপরীতই সচরাচর দৃষ্ট হয়। অনেকের প্রকৃতি এমন পশুভাবাপন্ন যে, সামাজিক কর্ত্তব্য বা ন্যায়পরতা ও সত্যকে অর্থস্পৃহার নিকট বলিদান করিতে তাহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। উচ্চাসনের বিচারপতি যে প্রকারে দেশীয় দোষীকে দণ্ড দেন, সেই প্রকৃতির বিলাতী দোষীকে মুক্তি প্রদান করেন; ডেপুটী বাবু

গভর্ণমেন্টের বলে বলীয়ান হইয়া পূর্ব্বপোষিত ক্রোধকে চরিতার্থ করেন, পুলিশ কর্ম্মচারী অর্থ লইয়া দোষীকে মুক্তি এবং নির্দোষীকে শাস্তি দেওয়ান, ইত্যাদি। এই সকল ব্যবসায়ে পাপ এবং প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল, অল্প লোকেই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এমন একটী ব্যবসায় আছে, যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিকতা, সামাজিকতা এবং পারিবারিকতা অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতে পারে। সেই ব্যবসায় শিক্ষকতা; ইহার উদ্দেশ্য বিষয় জ্ঞান, দান ও গ্রহণের বিষয় জ্ঞান। অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সংসারাসক্ত বিষয়ীর তীর্থদর্শনের ন্যায় কচিৎ অতিকষ্টে জ্ঞানমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সদাত্মাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের ব্যবসায়ে সর্ব্বদা এই মন্দিরে থাকিতে পাওয়া যায়, বিনা-যত্নে ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অথচ জগদীশ্বরের কৃপায়, সমাজের সুন্দর ব্যবস্থায় ইহাতে অনায়াসে সামাজিক এবং পারিবারিক কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়া যায়। যাহাদের উচ্চাভিলাষ আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নতিলাভ, অথচ যাহাদের কোন একটা ব্যবসায় অবলম্বন না করিলে চলে না, আমার বিবেচনায় শিক্ষকের ব্যবসায়ই তাহাদের জীবনের উপযোগী।

আর একটী কথা। পণ্ডিতদেরই প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য শিক্ষা বিস্তার। আমাদের এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত আর্য্যভূমির সংস্কার, উন্নতি বা পুনরুত্থানের ভার শিক্ষকদিগের হস্তে। যিনি যাহাই বলুন, নির্জ্জীব ভারতে জীবন সঞ্চার করিবার ভার এই গরীব, অনাদৃত, অথচ চরিত্রবান্ শিক্ষকের হাতে। আমি জানি, আমার অনেক ত্রুটী অনেক দুর্ব্বলতা আছে, তথাপি এই জ্ঞান-পুণ্যের ব্যবসায়টী অবলম্বন করিতে আমার বড় লোভ জন্মিয়াছে। এই প্রবল দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের সময়ে যদি আমার

হাতে আমার যত্নে একটী বালকও সুনীত ও সংযতাচার হয়, তবে আমি জীবনকে ধন্য মনে করিব।

কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, সেই ব্যবসায় ব্যবসায়ীর পক্ষে উপযোগী কিনা, ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আমি পর্য্যালোচনা দ্বারা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার প্রকৃতি নির্ভীক এবং বিষয়নির্লিপ্ত বলিয়াই উপলব্ধি হইয়াছে। এরূপ প্রকৃতি লইয়া আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে বিপদেরই সম্ভাবনা।

ঈশ্বর চিরদিনই আমার আত্মার পরম সহায়। আমার মাতাপিতার চরিত্র দেবতার ন্যায় ছিল। আমার বাল্য-শিক্ষক হরিনাথ বাবু ঋষি-তুল্য লোক। বাল্যকালের আমার আশ্রয়দাত্রী শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী অতি পবিত্রস্বভাবা। আমার প্রতিপালয়িত্রী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী ভারতের আদর্শ-রমণী। আমার শ্বশুর, শাশুড়ী ধর্ম্মরাজ্যের উজ্জ্বলরত্ন। আমার সহধর্ম্মিণী ঈশ্বরের বিশেষ দান, রমণীকুলে অমূল্যমণি। যখন ঈশ্বর চিরদিন আমার প্রতি বিনা প্রার্থনায় এত অনুকূল, তখন আমি ইচ্ছায় তাঁহার প্রতিকূলতা করিব না।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং আমার শ্বশুরদেবের যত্নে আমার সহধর্ম্মিণী যে ভাবে প্রস্তুত হইতেছেন, তাহাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তিনি আমার ধর্ম্মপথের বিশেষ সহায়তা করিবেন। কিন্তু তাঁহার সৎশিক্ষা যাহাতে সুফল প্রসব করে, তজ্জন্য আমাকেও সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে হইবে। আমাকে তাঁহার উপযুক্ত সহচর হইতে হইবে। অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যমহিলাগণ জ্ঞানধর্ম্মে চিরস্মরণীয়া হইলেও তাঁহাদের পুণ্যপ্রভা বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মধ্য দিয়াই বিকীর্ণ হইয়াছিল ; ঐ সকল মহাত্মা উকীল, হাকিম কি পুলিশ কর্ম্মচারী হইলে তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণ স্বনামে ভারতকে আজ পবিত্র করিতে পারিতেন

কিনা সন্দেহ। ফলতঃ আমি যতই চিন্তা করি, ততই বুঝিতে পারি যে, আমার প্রকৃতিতে এবং অবস্থাতে শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসায়ই শোভা পাইতে পারে না।

অতএব আমি এই সঙ্কল্প করিলাম,—চিরদিন শিক্ষকবিভাগেই থাকিব, যদি পারি তবে এম্ এ পরীক্ষা দিব, এবং যাহাতে একজন আদর্শ শিক্ষক হইতে পারি, তাহার যত্ন প্রাণপণে করিব।

আমার অভাবে সহধর্ম্মিণীর জীবিকার ব্যবস্থা :—আমি দুই বৎসরেরও অধিক হইল চাকুরী করিতেছি, কিন্তু এখনও এক পয়সা সঞ্চয় করিতে পারি নাই, ঋণই হইতেছে। এখন হইতে কিছুদিনের জন্য কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত আর কিছুতে অর্থব্যয় করিব না, অন্যের দিকে চাহিব না, সম্ভবতঃ আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইবে। তৎপর হইতে আবশ্যকীয় খরচ বাদে যখন যাহা বাঁচিবে, তাহাই সহধর্ম্মিণীর নামে ডাকঘরে জমা রাখিব। এই উপায়ে একটী মুদ্রাযন্ত্রের উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত হইলে তদ্দারা একটী মুদ্রা-যন্ত্র ক্রয় করিয়া সহধর্ম্মিণীকে দিব। ভবিষ্যতে যদি আর কিছুই রাখিয়া যাইতে না পারি, সহধর্ম্মিণী এই মুদ্রাযন্ত্রার্জ্জিত অর্থ দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

যদি এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করি, দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার কন্যাকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার শ্বশুরের যে সম্পত্তি আছে, তদ্দারাই ব্রহ্মচারিণীর হবিষ্য নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ হইবে। দয়াময় ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কয়েকটি বিশেষ সঙ্কল্প।

১। যত শীঘ্র পারি বর্ত্তমান ঋণ পরিশোধ করিব। ঋণদায়ের চিন্তায় আত্মার অবনতি হয়।

২। ঋণ করিয়া সৎকার্য্য বা পরোপকার করিব না (যদি অব্যবহিত পরেই ঋণপরিশোধের ক্ষমতা না থাকে)। ঋণপরিশোধে অক্ষম অধমর্ণ রূপান্তরিত তস্করমাত্র।

৩। নীতিসঙ্গত আয় উপার্জ্জন করিব।

৪। যতদূর সাধ্য বিশুদ্ধ এবং সংস্কৃত হিন্দুভাবে সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম-সাধন আরম্ভ করিব।

৫। সংবাদপত্র পড়িয়া সময় নষ্ট করিব না। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য যে ব্যাকুল, রাজনৈতিক আন্দোলনে ডুবিয়া থাকিলে তাহার অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই।

৬। সকল প্রকার ধর্ম্মের প্রতি সমদর্শী হইব।

৭। পরনিন্দা পরিত্যাগ করিব। মনুষ্যমাত্রেই আমা অপেক্ষা মহৎ, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতাঃ কেহ নাই, এই কথাই সর্ব্বদা মনে রাখিব। গৌহাটী, সন ১২৯৫ সাল।"

ইহাতে অনেক সদুপদেশ সন্নিহিত আছে, তাই ইহা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করিলাম।

এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্রের বিদুষী পত্নী স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ঐ বিষয়ে মন্তব্য অনাবশ্যক।

রমণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য।

"রমণীর পক্ষে গৃহই অতি প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র। ভাল জীবন নিয়া প্রবেশ করিতে পারিলে এইখানেই চতুর্বর্গ লাভ হয়। চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমকে মুনিগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই সর্ব্বোত্তম আশ্রমের রমণীই শোভাসম্পদ ও পুরুষার্থসিদ্ধির মূল। গৃহে অতুল ধন সম্পত্তি সত্ত্বেও রমণীবিহনে তাহা শ্মশানসম নিরানন্দের স্থান বলিয়া প্রতীত হয়। সমস্ত ধন রত্নের মধ্য হইতে এক রমণীরত্ন উঠাইয়া লও, সেই সকল ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে। এই জন্যই উক্ত আছে,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

সেই গৃহ গৃহই নহে, যাহাতে গৃহিণী নাই। গৃহিণী থাকিলেই গৃহ বলা যায়। যে হেতু পুরুষ গৃহিণী সহযোগেই সমস্ত পুরুষার্থ সম্ভোগ করেন।

বাস্তবিক গৃহিণীই গৃহের দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই সাধুজন-প্রশংসিতা লক্ষ্মীরূপা রমণীর কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে বসিয়া আমি দেখিতে পাই, নারী সর্ব্বাংশেই পুরুষের অধীনা ও একান্ত আশ্রিতা। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আছে :—

"রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তুবার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥

বাল্যকালে কন্যাকে পিতা রক্ষা করিবেন, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধে পুত্র রক্ষা করিবে। স্ত্রীদিগের স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই নাই। আর পিতা,

স্বামী, কিম্বা পুত্র ইহাদের মধ্যে কেহই বর্ত্তমান না থাকিলে, জ্ঞাতিবর্গ রক্ষা করিবেন। বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য এই তিন অবস্থাতেই নারী পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীনা থাকিবে। এই অধীনতার কি শোভা, তাহা হীনমতি লোকদিগের বিবেচ্য নহে। ইহা রমণীগণের উৎসাহ-জনক বাক্য বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি "নায়ে তৃষ্ণা জলে তৃষ্ণা সাধ্বীনাং স্বামিনা বিনা" এই সকল রমণী-প্রকৃতির মর্ম্মোক্ত সত্যবাক্যই মনে করি॥ প্রকৃত পক্ষে অধীনতাতেই এই পরম শোভা ও গৌরব। আমি রমণীকুলের এই গৌরব রক্ষা করিয়াই তাহার গার্হস্থ্য-কর্ত্তব্য নিরূপণ করিব। রমণীজীবনের আংশিক বিভাগ শাস্ত্রে এইরূপ নিরূপিত আছে :—

"আষোড়শাদ্ভবেৎবালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চ পঞ্চাশতং যাবৎ প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ততঃ পরম্॥"

নারী ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকা, তৎপর ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, তৎপর পঞ্চ পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, তাহার পরই বৃদ্ধা। এই বিভাগানুসারে আমি রমণীর জীবন তিনভাগে দেখিতে পাই। প্রথমটি পূজ্যপাদ পিতার সন্নিধানে থাকিবারই উপযুক্ত। ইহা আত্ম-শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা। যদিও ইহাতে পিতার অধীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নিজেরই প্রভূত মঙ্গলের হেতু। পিতার নিয়োগ বা আদেশ পালন করিতে করিতেই রমণীর কর্ম্ম-পটুতা অভ্যাস হয়। এবং চরমে তিনি প্রকৃত গৃহাশ্রমে (অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে) প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে সক্ষমা হন। নারীর পক্ষে ইহাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এইখানে কঠিন ইন্দ্রিয়-সংযম বা আত্ম-নিগ্রহ নাই। অথচ জীবনে অপূর্ব্ব পবিত্রতা শিক্ষা হয়। কুসুম-কলিতে যেমন তাহার উপকারের জন্যই শিশিরবিন্দু পতিত হয়, সেইরূপ পিতৃস্নেহও বালিকার তত্তুল্য মহোপকারী পদার্থ অহর্নিশ

তাহার উপর সিঞ্চিত হইয়া থাকে। বালিকা এইখানে অধীন থাকিয়া যে সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হন তাহা স্বর্গেও দুর্লভ বলিতে হইবে। এই বাল্য-জীবনে পিতৃমাতৃভক্তি ও সহোদর সহোদরার প্রতি একান্ত স্নেহ রাখা রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য। সংক্ষেপে পিতা ও মাতার আদেশ পালন ও সহোদরদিগের প্রতি স্নেহ করাই এই সময়ের একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। অনেকের বাল্য-জীবনে ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতীত হয়। মহাভারতে আছে, কুন্তী পিতার নিয়োগে নিত্য অতিথি সেবা করিতেন। ইহা কেমন একটি সুন্দর আদর্শ। রমণীশ্রেষ্ঠা শকুন্তলাও এইরূপ পিতা কণ্বের আশ্রমে থাকিয়া নিয়ত অতিথি-সৎকার ও আবশ্যকমত পিতার সমস্ত আদেশ পালন করিতেন।

ভর্ত্তৃ-সন্নিধানে রমণীর দ্বিতীয়াশ্রম। এখানেই রমণীর প্রকৃত শুভাশুভ অনেক পরিলক্ষিত হয়। এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যিনি সুন্দর জীবন ও নারীপনা দেখাইতে পারেন তিনিই নারীকুলে ধন্যা। দেবী, মানুষী বা রাক্ষসী এইখানেই পরিচয়। দেবত্ব চাহিলে কঠিন নিগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও শকুন্তলা ঘোরতর বিড়ম্বনা সম্ভোগ করিয়াই এক একজন দেবী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। যাহার দুঃখ নাই, যিনি একদিনও অগ্নিতে পরীক্ষিতা হন নাই, তাঁহার জীবনের মূল্যও অতি অল্প। আমরা সীতা ও শকুন্তলাকে বাল্মীকি ও ভগবান কাশ্যপের আশ্রমেই নির্ব্বাসিত অবস্থায় অতি মনোজ্ঞা নারীকুলধন্যা বলিয়া নিরীক্ষণ করি। এবং সাবিত্রী ও দময়ন্তীকেও বনমধ্যে বিপন্না অবস্থাতেই অতি সুন্দর দেখি। সকলেই বিপদে পড়িয়া সম্পদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এত নিগ্রহ বা উত্তাপ সহ্য করিতে অল্প লোকেই সক্ষম হয়। অধিকাংশ নারী রম্য হর্ম্ম্যে থাকিয়া সুখসেব্য বস্তু সম্ভোগ করিয়াই আপ্যায়িতা এবং সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াই

আমোদিতা। ইহারা ভাগ্যবতী হইলেও মানুষী। আর যাহারা পর্দ্দাধর্ম্মে জলাঞ্জলি ও আত্মসুখ-নির্ব্বাহ করিয়া যথেচ্ছাচরণ করিতেছেন, তাহারা বিলাসিনী ভোগবতী রাক্ষসী। আমরা সংসারের লোক, সংসারের চিত্রই অনুক্ষণ দেখি; সুতরাং সুখদুঃখ মিশ্রিত মধ্যমাবস্থাই অধিক ভালবাসি। অধিক উপরে আরোহণ করা যেমন কষ্টকর, নীচে নামাও তেমনি ঘৃণাজনক মনে করি। এই নিমিত্ত মধ্যমাবস্থায় গৃহে থাকিয়া গৃহধর্ম্ম সম্পাদন করাই উত্তম বিবেচিত হয়। এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে গার্হস্থ্য-কর্ত্তব্য এস্থলে বর্ণন করিব।

যৌবনে স্বামীসেবা ও গৃহিণীপনাই রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রেম, অকপট ভক্তি ও বিশ্বাস এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই কয়েকটি না থাকিলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিষম বিষময় অনর্থ ঘটিয়া থাকে। স্বামী রমণীর দেবতা, স্বামীসেবা দ্বারা রমণীগণ ইহ পরকালে পরমাশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। স্ত্রীর কর্ম্ম সম্বন্ধে বিষ্ণু-সংহিতায় এরূপ আছে :—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাস ব্রতঞ্চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তু নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞব্রত বা উপবাসাদি নাই। পতিসেবা দ্বারাই তিনি স্বর্গে পূজনীয়া হয়েন। পতি জীবিত থাকিতে যিনি উপবাসাদি ব্রত আচরণ করেন, তিনি ভর্ত্তার আয়ু হরণ করেন এবং স্বয়ং নরকে গমন করেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

করিবেন। তাহাতে তিনি অপুত্রা হইলেও ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।

স্বামী রমণীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করিতে হইবে। সংসারে রমণীর জীবনই স্বামীর জন্য। দেবতাকে যে ভাবে দেখা উচিত, রমণীগণ স্বামীকেও সেই ভাবে দেখিবেন। প্রত্যহ অকপটে স্বামীকে ভক্তি করিবেন এবং সেই ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে একান্ত সরলতা থাকা চাই। স্ত্রী স্বামীর অধীন সত্য বটে, কিন্তু ভয়ে সেই অধীনতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। স্নেহে ও প্রেমে তিনি পতির অধীনা হইবেন। তিনি স্বামীর দাসী নহেন, অথচ স্বামীসেবাই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইবে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কি প্রাণমাখা সম্বন্ধ, তাহা নীচের শ্লোকটিতে প্রকাশ পাইতেছে।

"ছায়ে বানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসী বাদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥"

ছায়ার ন্যায় স্ত্রী স্বামীর অনুগতা হইবেন। হিতকর্ম্মে সখীর ন্যায় ও আদিষ্টকার্য্যে দাসীর ন্যায় হইবেন। স্বামীর সুখে স্ত্রীর সুখ এবং স্বামীর দুঃখে স্ত্রীর দুঃখ। যে সংসারে ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি ও ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি নিত্য-সন্তুষ্ট, সেই সংসারে দেবতারাও প্রসন্ন। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এরূপ আছে:—

"সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিনী।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহং।"

যে গৃহে খাওয়া পরার কষ্ট নাই ও পরিবারটি নীরোগ এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রিয়া, সেই গৃহ নিত্যই উৎসবময়।

দ্বিতীয় গৃহকর্ম্ম। প্রত্যেক গৃহিণীরই স্বহস্তে সর্ব্বদা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত। গৃহিণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে বহ্নিপুরাণে এইরূপ আছে:—

"সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গণে মণ্ডলাং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা॥
গৃহকৃত্য চ কৃত্বা চ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্ গৃহদেবতা॥
গৃহকৃত্যং সুনিবৃত্তে ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথিন্ পূজয়িত্বা চ স্বয়ং ভুঙ্ক্তে সুখং সতী॥"

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, পত্নী শুদ্ধান্তঃকরণে দেবতা এবং পতিকে নমস্কার করিয়া, প্রাঙ্গণে গোময় মণ্ডল প্রদান করিবেন। এবং গৃহকৃত্য সমাপন করিয়া, সতী দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং পতিকে নমস্কার করিয়া, গৃহদেব ও অন্যান্য গুরুজনদিগকেও সম্মান প্রদর্শন করিবেন। তৎপর গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া, পতি ও অতিথির সেবা করিয়া নিজে ভোজন করিবেন।

গোময় জল সেচনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা অনেকে জানেন না। গোময়ের গুণ বায়ু পরিষ্কারক ও দুর্গন্ধনাশক। প্রভাতে এইরূপ গোময় ছিটাইয়া দিলে, দূষিত বায়ু পরিষ্কার ও দুর্গন্ধ নষ্ট হওয়ায় গৃহস্থগণের শরীর পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

গৃহস্থের গৃহদ্বার অতিথির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক। হিন্দু অতিথি-সেবার জন্য অতি প্রসিদ্ধ। উপাখ্যানে আছে, দাতা কর্ণ অতিথিব সৎকারের জন্য স্বীয় পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। এতদূর না করুন, অতিথি গৃহে সমাগত হইলে যথাসাধ্য তাঁহার পরিচর্য্যা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। রমণীকুলের প্রাচীন নিয়ম বড় পবিত্র ছিল। ভোজদুহিতা কুন্তীর বাল্যকালে পিত্রালয়ে থাকিয়া অতিথি সেবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহর্ষি কণ্বও শকুন্তলাকে অতিথি সৎকারের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন জীবনের উন্নতির প্রবর্ত্তক। অতএব গুরুজনদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভক্তি রাখা একান্ত আবশ্যক। আর পিতামাতার ঋণ অপরিশোধ্য হইলেও সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। দাস দাসীর প্রতি গৃহিণীর কুব্যবহার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাহাদিগকে সর্ব্বদা মিষ্টবাক্যদ্বারা পরিচালিত করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ভৃত্য বেতনভোগী মাত্র। তাহাদিগকে তাড়না অপেক্ষা সদ্ব্যবহারে বশীভূত করিলে তাহাদিগের দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, অথচ তাহাদিগের হৃদয়েও আঘাত লাগে না। মিষ্টবাক্যে ভৃত্যের দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহা অনেকে বুঝেন না। ভৃত্যের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে অধিক ইষ্টের সম্ভাবনা, একথা গৃহিণীদিগের যত্নপূর্ব্বক স্মরণ রাখা উচিত।

রন্ধন রমণীগণের গৃহকর্ম্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম্ম। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, রমণীগণ এই সুমহৎ ব্যাপার পাচকঠাকুর কিম্বা পাচিকাঠাকুরাণীর হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। তাহারা অতি অপরিষ্কৃত ভাবে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, এবং সেই অপরিষ্কৃত অন্নব্যঞ্জনই নাসিকা সঙ্কোচ করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছেন, এবং সেজন্য সময়ে সময়ে কত রোগ-যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয়। রন্ধন-নিপুণতা স্ত্রীলোকের একটি প্রধান গুণ। ইহা পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

সন্তান-পালন গার্হস্থ্য-কর্ত্তব্যের একটি প্রধান কার্য্য। এই বিষয়টি স্ত্রীলোক মাত্রেরই অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করা আবশ্যক। কেননা সন্তানের সমস্ত ভারই মাতার উপর ন্যস্ত থাকে। তাহারা এই বিষয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে অজ্ঞানতাবশতঃ সন্তানের হিতকে অহিত ও অহিতকে হিত মনে করিতে পারেন, এবং তাহাতে কত শিশুর জীবন-

কুসুম অকালে শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। পল্লীগ্রামে এরূপ দৃশ্যের অভাব নাই। আজকালের নব্যাগণও এ সকল কার্য্য দাসদাসীর হস্তে অর্পণ করিতেছেন। আজকাল স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রমণীগণ পুস্তক পাঠ করিয়া অথবা গুরুর উপদেশে এই সকল বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা ইহা কার্য্যে পরিণত করেন না। অনন্ত জীবন ভরিয়া যে স্বামী এবং পুত্রের সেবা করিলে মন তৃপ্ত হয় না, সে কার্য্য আবার দাসদাসীর হস্তে অর্পণ করিয়া রমণীগণ কিরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, ইহাই আশ্চর্য্য।

লেখাপড়াশিক্ষাও রমণীর অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও বালক বালিকার বাল্যশিক্ষার ভার গৃহিণীর হস্তেই থাকা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন নিত্য নিয়মিত ধর্ম্মচর্য্যার জন্যও রমণীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে অবসর নেওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মহীন জীবন বড়ই হীন। ইহাতে সুখ শান্তির বড়ই ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। এইতো গেল দ্বিতীয় অবস্থা।

অতঃপর নারী দুর্ভাগ্যবশতঃ পতিহীনা হইলে তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করেন। এই অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে পুত্রের চিন্তাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পুত্রের মঙ্গল সাধন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় আত্মসুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন করাই নারীর পরম ধর্ম্ম। এইখানে নারী বানপ্রস্থ মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া যতীবেশে অবস্থান করিতে যত্ন করিবেন। এই অবস্থায় পতিত হইলে দুর্ভাগ্য মনে না করিয়া, সৌভাগ্য জ্ঞান করাই বুদ্ধিমতী নারীর কর্ত্তব্য, কিন্তু এইখানে মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। একান্তমনে মুনিদিগের ন্যায় সংযত চিত্তে ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় পড়িয়া যাহার জীবন উচ্চ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারিল না,

তাহার জীবন কেবলই দুর্গতির জন্য মনে করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টান্তে এই সময়ে যদিও বৈধব্য-মাহাত্ম্য হ্রাস হইয়া ভারতীয় নারী জীবনের হীনতা প্রদর্শন করিতেছে, কিন্তু আমরা এই হীনতাকেই অত্যুচ্চ দেব-জীবন মনে করিতেছি। নারী জীবনের উচ্চ বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অপূর্ব্বতা এইখানে, আমরা মনে করি। একজন গৃহী-পুরুষ হইতে বনচারী সাধুর জীবনে যদি উচ্চতা সম্ভব হয়, তবে মৎস্য মাংসাশিনী ভোগ-বিলাসিনী নারী হইতে শুদ্ধাচারিণী সতীধর্ম্মাবলম্বিনী একাহারী ধর্ম্মার্থিনী নারীর ভাগ্যের প্রশংসা কেনই আমরা না করিব। বাস্তবিক ভারতীয় নারীর বৈধব্য জীবন অতি প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান সময়ে নারী জাতির সাধন ভজনের উচ্চতা যদিও আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু প্রাচীনকালে আত্রেয়ী, গার্গী, অদিতি ও অরুন্ধতী প্রভৃতির বৃত্তান্ত সকলেই শ্রুত আছি। সেই তাপসী রমণীকুলের নাম লইলেও মন পবিত্র হয়। অতএব কুসংস্কার হউক বা যাহাই হউক, আমরা শুদ্ধা-চারিণী বিধবা রমণীকুলের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রশংসাই করিব। বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে রমণীর বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকলই অতি সুন্দর, এবং সকলই ধর্ম্মকর্ম্মের উপযুক্ত।

১২৯৪ সাল, চৈত্র মাস,
গৌহাটী।

শ্রীমুক্তকেশী দেবী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিপত্নীক শরচ্চন্দ্র পুঁটিয়ায় পূর্ণ সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতেন। বন্ধুদের উপর তাঁহার গভীর ভালবাসা ছিল এবং ছাত্রেরা তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিত। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি, ছাত্রদের শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতি এবং দেশের সেবা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি নিভৃত সাধক ও নীরব কর্ম্মী ছিলেন; বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। শরচ্চন্দ্র যখন পুঁটিয়ায় বাস করিতেন, সে সময় রাজসাহীর সদরে স্বর্গীয় রামানন্দ স্বামী সাহিত্যিক-প্রবর মৈত্রেয় মহাশয়ের বাগান-বাটীতে কিছুকালের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট শরচ্চন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারও অদ্ভুত! এক ঘোর দুর্য্যোগের রাত্রিতে স্বামীজী মৈত্রেয় মহাশয়কে পূর্ব্ব হইতেই একজন ভদ্রলোক ও একটী জানোয়ারের জন্য আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। গভীর নিশা, তদুপরি প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে—প্রকৃতির সেই ভৈরব নৃত্যে কাতর না হইয়া শরচ্চন্দ্র ঘোটকারোহণে পুঁটিয়া হইতে রাজসাহীর অভিমুখে স্বামীজীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পৌছিয়া সেই রাত্রেই স্বামীজীর নিকট দীক্ষা লাভ করিলেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই বটে! এরূপ দুর্যোগে সহজে কেহ বাটীর বাহির হইতে পারেনা। ধন্য শরচ্চন্দ্রের সাহস ও নিষ্ঠা!! মনে হয়, সেই দুর্য্যোগময়ী মহানিশায় পূর্ব্ব হইতে শরচ্চন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষাও স্বামীজীর ন্যায় গুরুর নিকট কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুনরায় এ দুর্য্যোগের পরই শেষরাত্রিতে

শরচ্চন্দ্র অশ্বারোহণে পুঁটিয়ায় ফিরিয়া যান। এই দীক্ষা ব্যাপারকে দৈবাধীন ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ক্ষেত্র উপযুক্ত না হইলে তাহাতে বীজ বপন করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। শরচ্চন্দ্রের পূর্ব্বজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষেত্রহিসাবে তিনি অসাধারণ ভাবেই উপযুক্ত ছিলেন। তাহার উপর স্বামীজীর ন্যায় গুরুর নিকট হইতে দীক্ষালাভ ব্যাপারও অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। শরচ্চন্দ্র দীক্ষালাভ করিয়া উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত জপাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শরচ্চন্দ্র ১২৯৯ সালের মাঘ মাসে পুঁটিয়ায় শিক্ষকতার কার্য্য ত্যাগ করিয়া খোর্সেদপুরে তাঁহার মার নিকট কয়েক মাস ছিলেন। সেই সময়ে শরচ্চন্দ্রের স্বহস্তলিখিত কয়েকটী গান (বা কবিতা) আমার হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বের লিখিত কয়েকটী গান ও ঐ সময়ে লিখিত কয়েকটী গান "অঞ্জলি" নাম দিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ গানগুলিতে সাধন অবস্থার ভাবের কথাই আছে। ইচ্ছা আছে, ঐগুলি পৃথক পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিব।

১২৯৯ সালের মাঘ হইতে ১৩০০ সালের বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত শরচ্চন্দ্র ও তাঁহার খোর্সেদপুরের মা প্রায়ই স্বপ্নাবস্থায় বা ভাবাবস্থায় দৈববাণী শ্রবণ করিতেন; এবং ঐ সময়ে মধ্যে মধ্যে স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীও তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেন।

১২৯৯ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে শরচ্চন্দ্র মৌনব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং সেই দিনই এইরূপ দৈবাদেশ পান "ডাক্ পাবি"। ১৯শে ফাল্গুন তারিখে এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করেন "দেখা দিব, কথা কব।" ২০শে ফাল্গুন দোলপূর্ণিমার দিন প্রত্যূষে জাগ্রতাবস্থায় এইরূপ দৈববাণী

শ্রবণ করেন :—"ওর কিছুতেই দুঃখ হবে না, ওর কিছুতেই দুঃখ হবেনা, ওর কিছুতেই দুঃখ হবে না।" ২৩শে ফাল্গুন তারিখে এইরূপ দৈববাণী শুনিয়াছিলেন :—"আমি ত সর্ব্বদা তোকে লইয়া আছি।" পরদিন এইরূপ শুনিয়াছিলেন :—"আমি ত সর্ব্বদা তোর্ পাছে পাছেই আছি।" ঐ দিনই হরসুন্দরী দেবী (শরচ্চন্দ্রের খোর্সেদপুরের মা) এইরূপ বলিয়াছিলেন : -"জপের সময় দেখিলাম, চতুর্ভুজা মা তোর পিঠের দিকে দাঁড়াইয়া।" ২৬শে ফাল্গুন তারিখে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল :—"তোর্ ডাকে আমি স্থির থাকিতে পারি না।" ৩০শে ফাল্গুন তারিখে রবিবারে শরচ্চন্দ্র এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করেন :—"তোর ত সিদ্ধি হ'য়েছে।" ঐ দিন এই গানটী লেখা আছে :—

"দেহসহ মনপ্রাণ, আর এ ইন্দ্রিয়চয়,
শকতি, প্রবৃত্তি, রিপু—তোমারি ত সমুদয়।
দুর্ব্বলের শিরে তুলি' দিয়াছ এ গুরুভার,
কি আছে উদ্দেশ্য এর, কে বলিবে তুমি বিনে!
সূচী-রন্ধ্রে হস্তী চলে, কেশেতে পর্ব্বত দোলে,
কি উদ্দেশ্যে, কি কৌশলে, তুমি বিনে কে তা জানে!
শতদিকে শত পথ চলিয়াছে শত মুখে,
চিনিনা, জানিনা মাগো! কোন্ পথে কোথা যাই ;
দায়িত্বের বোঝা ল'য়ে ভয়েতে অস্থির প্রাণ,
আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়ায়ে রয়েছি তাই।
জননি! দেখাও পথ কাঙ্গালে অঙ্গুলি দিয়া,
যে পথে তোমার ইচ্ছা হও তুমি অগ্রসর ;
অন্তর-চরণ-চিহ্ন হেরিতে নয়ন দেও,
শুনিতে অন্তরবাণী দিব্য কর্ণ দান কর।

না চালাও যদি মাগো ! কাঙালে উপেক্ষা করি,
বিদেশে বিপথে যদি দস্যু হাতে প্রাণ যায়,
হারাবে তোমারি ধন, মরিবে তোমারি ছেলে,
আমার কি লোকসান, কি আক্ষেপ, কিবা দায় !"

১০ই চৈত্র তারিখে শরচ্চন্দ্রের মা শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন :—"তুই তার জানিবি কি, উহার উপর আমার অপার দয়া।" এইরূপ আরও অনেক দৈববাণীর কথা লেখা আছে।

শরচ্চন্দ্রের ধর্মজীবন বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ বুঝিতে পারা যায়, তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতাকে দেখিতে পাইতেন এবং তাঁহার আদেশও পাইতেন। শরচ্চন্দ্র বিনা আদেশে কোন কার্য্য করিতেন না।

১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে শরচ্চন্দ্র খোর্সেদপুর হইতে পাবনা রওনা হন।

পুঁটিয়ার শিক্ষকতা কার্য্যের পরে ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে শরচ্চন্দ্র কলিকাতার নিকটস্থ উত্তরপাড়ার জমিদার ৺ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অবনী মোহন মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষকতার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তখন উঁহাদেরই বাটীতে থাকিতেন। ঐ সময়ে শরচ্চন্দ্র 'বর্ণ শিক্ষাপ্রণালী' প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। শিবনারায়ণ বাবু শরচ্চন্দ্রকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

'বর্ণশিক্ষাপ্রণালী' শ্রীহট্ট জেলায় পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রামে, শরচ্চন্দ্র মধ্যইংরাজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের (বা অতিরিক্ত) কার্য্য কিছুকাল করিয়াছিলেন। সেখানে সকলে তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

হরিপালে থাকার সময়ে একটী ঘটনা হয়, তাহার গল্প আমার নিকট করিয়াছিলেন। সেখানকার স্কুল একটী কমিটীর অধীন ছিল এবং স্থানীয় একজন জমিদার সেই কমিটীর সভাপতি ছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের বাটীতে নিত্য দেবপূজার জন্ত একটী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ব্রাহ্মণেতর কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। কোন সময়ে ঐ জমিদার মহাশয় পূজক ব্রাহ্মণের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি নানা কটুভাষা ব্যবহার করেন। তাহার ফলে পূজক ব্রাহ্মণ বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়া যান এবং আর কার্য্যে উপস্থিত হইলেন না। জমিদার মহাশয় ক্রমশঃ অসুস্থ হইলেন এবং তাঁহার জিহ্বায় ক্ষত দেখা দিল। ঐ ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার বাক্‌রোধ হইল এবং আহারাদি বন্ধ হইল। চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। জমিদার মহাশয় ৺ গুরুদেবকে ডাকাইয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। ৺ গুরুদেব বলিলেন যে পূজক ব্রাহ্মণের প্রতি কটুবাক্য ব্যবহারই ঐ পীড়ার কারণ, এবং ঐ পূজক ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হইতে পারে। জমিদার মহাশয় পূজক ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। তখন সকলের পরামর্শে জমিদার মহাশয়ের মঙ্গলার্থে ৺ গুরুদেব ৺ শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করিতে ব্রতী হন। ৺গুরুদেব ৺ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, কোন দৈবকার্য্য করিবার সময় তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, এবং যাহাতে কোন বাধা বিঘ্ন না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে বলিতেন। উক্ত জমিদার মহাশয়ের মঙ্গলের জন্ত ৺শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করিবার সময় ৺গুরুদেবের পরিচিত একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মণ্ডপের নিকট উপস্থিত হইয়া ৺গুরুদেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। ৺গুরুদেব হস্তচালনা দ্বারা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে
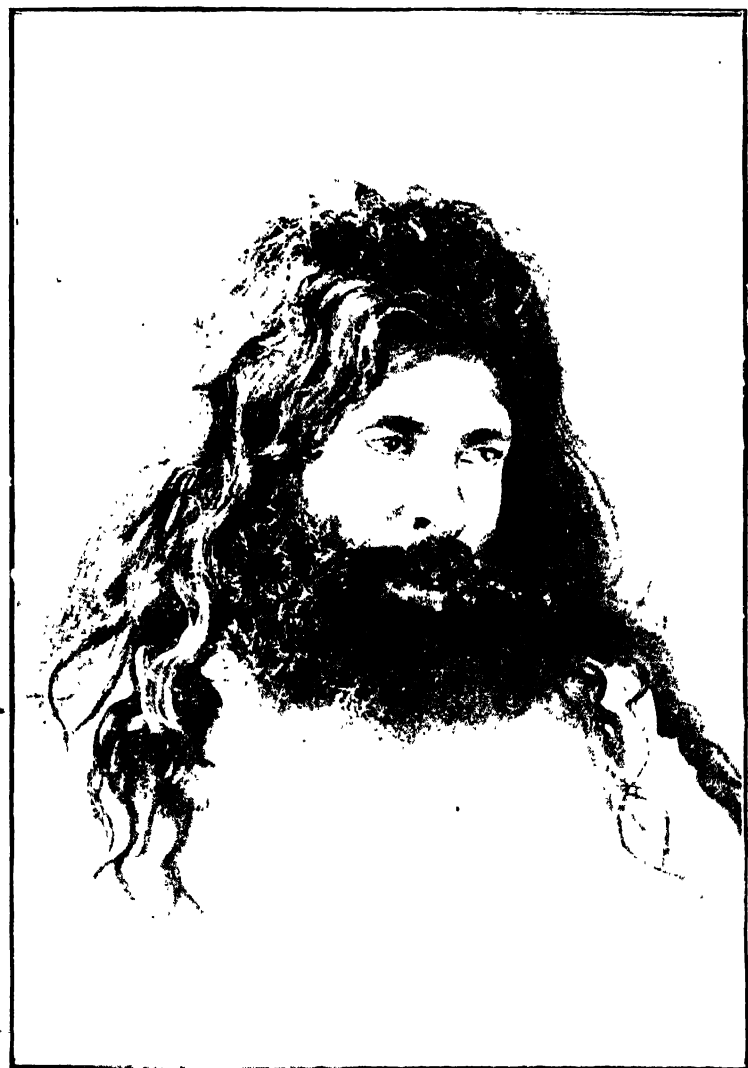
উত্তরপাড়ায় ৺শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থানকালীন গৃহীত।

বলিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। ঐ ব্রাহ্মণই দ্বিতীয়বার আগমন করিয়া ৺গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেবারও ৺গুরুদেব হস্তচালনা দ্বারা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। বৃদ্ধব্রাহ্মণ সেবারও চলিয়া গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া ৺গুরুদেবকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তখন ৺গুরুদেব দেখিলেন আর ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করা বৃথা, তাই পুঁথি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ৺গুরুদেব বলিলেন, পীড়া দুরারোগ্য, এবং সত্য সত্যই জমিদার মহাশয় আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না।

১৩০৬ সালে ৺গুরুদেব শ্রীহট্ট জেলার মৌলভীবাজার হাইস্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীদের সহিত মত-ভেদ হওয়ায় ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

পরে শরচ্চন্দ্র তাঁহার নিজগ্রাম বেগমপুরে গিয়া বাস করেন। তথায় কোনও বিদ্যালয় ছিল না। সেই সময়ে শরচ্চন্দ্র নিজ গ্রামে তাঁহার বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে একটী পুষ্করিণী খনন করান, এবং তাঁহার মাতার নামানুসারে ঐ পুষ্করিণীর নাম "নারায়ণী কুণ্ড" রাখেন। নিজবাটীতে অনেক কাল পরে বাস করিতে আসায় শরচ্চন্দ্র শত চণ্ডীপাঠ করিয়া গৃহের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুই একটী নূতন ঘরও তৈয়ার করান।

শরচ্চন্দ্রের উদ্যোগে প্রথমে একটী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং তাঁহার এক ভাগিনেয় ৺প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। কালে ঐ বিদ্যালয়টীর উন্নতিসাধন করিয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় করা হয় এবং "শরৎসুন্দরী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়" নামকরণ

হয়। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শরচ্চন্দ্র স্বয়ং কিছুকাল ঐ স্কুলের হেড মাষ্টারের কার্য্য করেন, এবং তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমার তর্কবাগীশ, জ্ঞাতি ৺জগচ্চন্দ্র চৌধুরী এবং প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যমণি রায় কিছুদিন ঐ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৯১৩ সালে ঐ বিদ্যালয়ের অবস্থা মন্দ হইয়া যাওয়ায়, শরচ্চন্দ্র পুনরায় প্রথম শিক্ষকের ভারগ্রহণ করিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। এখনও ঐ বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে।

বালিকাদের শিক্ষার জন্য তিনি নিজ বাটীতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল উহা বেশ চলিয়াছিল। বালকদের শিক্ষার জন্য বহুকাল পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং স্ত্রীশিক্ষার বিষয় ও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল, কিন্তু সুবিধা না পাওয়ায় পূর্ব্বে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। শেষে বাটীতে থাকা সময়ে তিনি নিজের সাংসারিক অবস্থার অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে ঐ বালিকা বিদ্যালয় অধিককাল চালাইতে পারেন নাই।

সন ১২৯৫ সালে শরচ্চন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল বলিয়াছি। তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নাই এবং তদবধি সংসারে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য ভাবই পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটী ভাগিনেয়ই স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র ছিল। তাহারা শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী রাজেশ্বরী দেবীর পুত্র রূপনাথ ও প্রসন্নকুমার মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, স্বগ্রামে কেবল আনন্দকুমারই এক ভাগিনেয় বর্ত্তমান রহিলেন। তাঁহাকে শরচ্চন্দ্র অতিশয় ভালবাসিতেন; এবং সময়ে তাঁহার শিক্ষার ভারও বহন করিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজন সকলেই শরচ্চন্দ্রকে পুনরায়

দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। সুতরাং দত্তকপুত্র গ্রহণের কথা কেহ কেহ বলেন। তাগিনের আনন্দকুমার শরচ্চন্দ্রকে বলেন, তাঁহার স্বগ্রামে মাতুল ভিন্ন আত্মীয় স্বজন একরকম কেহ নাই, সুতরাং দত্তকগ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে আনন্দ কুমারের মাতুলালয় অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শরচ্চন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে দত্তক গ্রহণের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করেন। ঐ স্বপ্নাদেশ ১৩০৩।৪ সালে পাইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ স্বগ্রামবাসী জ্ঞাতি জগন্নাথ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রকুমারকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রের পিতা সম্মতও ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি অস্বীকৃত হন। অতঃপর শরচ্চন্দ্র আনন্দকুমারের মধ্যমপুত্র শ্রীমান অমরেশ ভট্টাচার্য্যকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু আনন্দকুমারের পিতা তাহাতে অসম্মত হওয়ায় তাহাও ঘটে নাই। শরচ্চন্দ্র একদিন স্বপ্নে দেখেন, যে তাঁহার পঞ্চবটিতে খুব ধূমধামে ৺শ্রীশ্রীকালীপূজা হইতেছে এবং একজন ব্রাহ্মণের কোলে একটি ছোট ছেলে দেখাইয়া কে যেন বলিতেছেন, এই ছেলেটিকে লও। সেই ছেলে ত্রিপুরানাথ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান মথুরানাথ। ত্রিপুরানাথ তখন জীবিত ছিলেন না, তাঁহার বিধবা স্ত্রী দুই পুত্র-রমনীমোহন ও মথুরানাথকে লইয়া পিত্রালয়ে— ঢাকা দক্ষিণপরগণা লক্ষ্মণাবন্ধ গ্রামে—অতি কষ্টে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সন্ধান লইয়া, ত্রিপুরানাথের বিধবা স্ত্রীর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীমোহনের শিক্ষা ও ভরণ পোষণের ভার লইয়া, শরচ্চন্দ্র ১৩০৭ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে (১৯০০ সালের মে মাসে) মথুরানাথকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, এবং শচীন্দ্রকুমার নামকরণ করেন।

শচীন্দ্রকুমারকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্ত শরচ্চন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। ১৩২০ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীমান শচীন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তৎসম্বন্ধে ৺গুরুদেব এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"৩।৪ স্থানে বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ ছিল, আমি যেখানে চাই সেখানে পাই, এরূপ সমস্তায় পড়িয়া কোন্‌টী নির্ব্বাচন করিব তাহাই ভাবিতে ছিলাম ; কিন্তু এ সঙ্কটে ৺মা আমার সহায়তা করিলেন, ৫ই তারিখ রজনীতে আলাপ ভিন্ন অন্য একস্থানে শচীন্দ্রনাথের বিবাহের আদেশ পাইলাম। বলা বাহুল্য, প্রস্তাব মাত্রেই কন্যাদাতার সম্মতি পাওয়া গেল এবং বিবাহের দিন অবধারিত হইল। দত্তকগ্রহণের সময়ও স্বপ্নাদেশ ছিল, বিবাহেও আদেশ পাওয়া গেল, সুতরাং ইহাতে শুভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" শচীন্দ্রকুমারের সন্তানাদি হইয়াছে, এবং সে বাটিতে থাকিয়া ৺শ্রীশ্রীবিশ্বমাতার সেবা করিতেছে।

মায়ের আদেশেই যখন সকল কার্য্য হইয়া আসিতেছে, তখন মনে হয় মায়ের কোন বিশেষ ইচ্ছা আছে, এবং আশা করা যায়, সাধকের বংশ সাধকবিহীন থাকিবে না। সস্ত্রীক শচীন্দ্রকে শরচ্চন্দ্র স্বয়ং দীক্ষাদান করেন এবং ৺শ্রীশ্রীবিশ্বমাতার পূজা করিতে শিখাইয়া দেন।

সপ্তম অধ্যায়।

সাধক শরচ্চন্দ্র ১৩০৫ সালের কার্ত্তিক মাসের ৬ই তারিখ হইতে ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত, জেলা বগুড়ার অন্তর্গত ভবানীপুরে ৺মার বাড়ীতে ৺মহারাজা রামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীতে বসিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় মধ্যাহ্নে আহারের পর কিছুকালের জন্য যখন অবসর পাইতেন তখন যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিলাম। ঐ সময়ে তিনি মৌনী ছিলেন।

৬ই কার্ত্তিক শনিবার মহাষ্টমীতে মন্ত্র পুরশ্চরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বেই স্বপ্নযোগে মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

ভূমিকাস্বরূপ এইরূপ লেখা আছেঃ—

"সময়ে সময়ে কিছুদিন মৌনী থাকিয়া মার নাম লইতে ইচ্ছা হয়। সে সময়ে মধ্যাহ্নে আহারের পরে কিছুকাল অবসর থাকে। তখন ঘুমাইলে দিবানিদ্রা হয়, লেখাপড়াও পরিত্যাগ করি, এ দিকে হস্ত-কণ্ডূয়নও থামাইতে পারি না, কাযেই মার সম্বন্ধে যে সকল কথা মনে উদয় হয়, তাহার কোন কোনটা লিখিয়া সময়টা কাটাই। যাহা লেখা যায় তাহাই থাকিয়া যায়, কালের গতি অনুসারে তাহা প্রকাশ করিতেও ইচ্ছা হয়, তাই প্রকাশ করিলাম। বিষয় এবং উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে উপযুক্ত কোন নাম খুঁজিয়া পাইলাম না, তাই 'পদরেণু' নাম রাখিলাম। যদি একজন পাঠকও ইহা পাঠ করিয়া পুস্তকের মূল্যটা জলে পড়ে নাই মনে করেন, তাহা হইলেই আমার প্রয়াস সফল। ইতি"—

তৃতীয় দিন সোমবার দশহরা ৮ই কার্ত্তিক 'তন্ত্রোক্ত-ধর্ম্ম সদৃশ-বিধান

নামক চিকিৎসা-প্রণালীর তুল্য: ইহার সাতটি আচার সাতটি ঔষধ স্বরূপ।' এই বিষয় উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"যাহার প্রকৃতিতে যে সকল ভব-রোগ প্রবল, কোন না কোন আচারে সেই সকল রোগের সদৃশ ক্রিয়া বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে। নিজের সূক্ষ্ম বিচারে অথবা গুরুর সাহায্যে নিজের প্রকৃতি হইতে অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল রোগ বাহির কর, এবং যে আচারে এই সকল রোগের সদৃশ ক্রিয়া বর্ত্তমান দেখিতে পাও, সেই আচার অবলম্বন কর। রোগ সারিলে যেমন ঔষধের প্রয়োজন থাকে না, এই সকল ভব রোগ সারিয়া গেলে সেইরূপ কোন আচারের প্রয়োজন থাকিবে না, আচার তখন অপনা হইতে খসিয়া পড়িবে। তখন স্থির স্বাস্থ্য-স্বরূপ ভাবত্রয়ের অন্যতম আসিয়া আচারের স্থান অধিকার করিবে। গুণত্রয়ের প্রাবল্য অনুসারে ভাবত্রয়, যাহার প্রকৃতিতে যে গুণ প্রবল, তাহার প্রকৃতিতে তদনুসারে ভাব স্থায়িত্ব লাভ করিবে। আচারের ইচ্ছা, যত্ন, কর্ত্তৃত্ব আছে, ভাবে তাহা নাই, ভাব প্রকৃতি--স্বভাব, বিনাযত্নে যাহা হয়। অথবা অন্য কথায়, আচার অভ্যাস দ্বারা প্রকৃতিগত হইয়া গেলেই একটা ভাবে যাইয়া দাঁড়ায়। দিব্যভাবে সত্বগুণ প্রবল, বীরভাবে রজোগুণ প্রবল, পশুভাবে তমোগুণ প্রবল। পশুভাব কপটভাব, ইহার আচার বাহিরে পবিত্রদিব্য ভাবের অনুকারী হইলেও ভিতরে ভেদজ্ঞান এবং তমোগুণ প্রবল থাকে, এইজন্য ইহা নিকৃষ্ট ভাব। আচার নিজের প্রকৃতি অনুসারে পছন্দ করিয়া গ্রহণ করিতে হয়, ভাব আপনা হইতে আইসে। আচারে ইষ্টদেবতার উপাসনা; আচারের সঙ্গে ভাবের পার্থক্য কোন্‌খানে, কোন্‌কার্য্যে, বা কোন সময়ে ঘটে, তাহা স্বোপলব্ধির বিষয়, অন্যের জীবনে বাহিরের কার্য্য দেখিয়া তাহা আচারগত কি ভাবগত তাহা স্থির করা যায় না, তবে অন্তর্দর্শী সাধকের কথা স্বতন্ত্র।

মানব মাত্রেই কোন না কোন আচারের অধিকারী, সুতরাং মানব মাত্রেই তান্ত্রিক উপাসনার অধিকারী, নিষিদ্ধ মাংসাদি পরিত্যাগ করিলে যবনাদিও এ উপাসনা করিতে পারে। তান্ত্রিক ধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বজনীন-ধর্ম্ম,—ইহাই তান্ত্রিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, এই জন্যই ইহা কলিযুগের বিশেষ ধর্ম্ম।

'কলিতে সর্ব্ববর্ণ এক হইবে,' ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এমন নহে যে কলিতে জাতি-বর্ণ-বিচার থাকিবেই না। ইহার অর্থ এই যে, সকল জাতিই তন্ত্রোক্ত এই সপ্তাচারের অন্তর্ভুক্ত হইবে, সকলে তন্ত্রের মতে চলিবে, দিব্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণকে দিব্যভাবাপন্ন যবন হইতে পৃথক করা যাইবে না। জাতিগত পার্থক্য যেমন আছে তেমনই রহিবে. কেবল ব্যক্তিগত পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে—ধর্ম্মের অধিকার জাতিগত না হইয়া ব্যক্তিগত হইবে, প্রকৃতিগত হইবে। জাতি জন্মসাপেক্ষ, ধর্ম্ম সাধন-সাপেক্ষ। চর্ম্মকারের পুত্র জন্মমাত্রেই চর্ম্মকার, কিন্তু কালে সাধন-বলে সে ব্রাহ্মণকুলজ-সাধকের তুল্য হইতে পারে। জাতীয় অধিকার বা পার্থক্য জন্মের অনুগত, তান্ত্রিক-অধিকার সাধনের অনুগত। তন্ত্রোক্ত সপ্তাচার এবং ভাবত্রয় তান্ত্রিক ধর্ম্মানুষ্ঠাতা সাধকের পক্ষে, জাতমাত্র ব্যক্তির পক্ষে নহে। আচার দ্বিবিধ—জাত্যানুমোদিত এবং তন্ত্রানুমোদিত; জন্মমাত্রই জাত্যানুমোদিত আচারে অধিকার জন্মে, আর তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদুপদিষ্ট সাধন আরম্ভ করিলে তবে তন্ত্রানুমোদিত আচারে অধিকার জন্মিতে পারে।"

১০ই কার্ত্তিক তারিখে ঐ বিষয়ে পুনরায় লিখিয়াছেন—

"আচারের পরিবর্ত্তন চাই, কৌলাচার এবং দিব্যভাব সকলেরই

লক্ষ্য হইবে। বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে যে ভর্ত্তি হয়, সেই শ্রেণীতে সে জীবন কাটায় না। প্রভেদ এই,—বিদ্যালয়ে কোন্ শ্রেণীর পর কোন্ শ্রেণীতে যাইতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু আচারের পরিবর্ত্তনে প্রকৃতি-বিচার চাই—কোন্ রোগ সারিয়াছে, আর কোন্ রোগের চিকিৎসা বাকী আছে, তাহা প্রকৃতির অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিতে হইবে। সমস্ত আচারই যে প্রত্যেকের প্রয়োজন, তাহা নহে।"

পরে 'তন্ত্রশব্দের ব্যুৎপত্তি কি ?' এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন—

"তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার করা, তাহার উত্তর ঔণাদিক উ প্রত্যয় করিয়া তনু, অর্থাৎ জীবের বিস্তার-বিশিষ্ট ভাগ, কিনা দেহ। তনু স্থানে তন্ আদেশ করিয়া তাহার পরে ত্রৈ (ত্রাণ করা) ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় করিয়া তন্ত্র অর্থাৎ দেহ (বিস্তার-বিশিষ্ট জড় পদার্থের সংশ্রব) হইতে ত্রাণ করে (মুক্তি বিধান করে) যে।"

পরে "পঞ্চতত্ত্বের অর্থ কি"? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর লিখিতেছেন :—

"ইহার স্থূল সূক্ষ্ম দুই অর্থই সত্য। যাহার মদ্যমাংসাদি স্থূল তত্ত্বে রুচি রহিয়াছে, যে স্থূল অর্থের অধিকারী, অর্থাৎ সে স্থূল অর্থই বুঝিবে এবং তদনুসারেই অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যে ইহা করিব, উহা করিব, মানুষকে ধার্ম্মিক করিব, পৃথিবীকে স্বর্গ করিব, ইত্যাদি কামনা করে, তাহার রজোগুণের উৎকর্ষ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিবৃত্তি হয় নাই। তখন সাংসারিতে তাহার অরুচি জন্মিয়াছে, কিন্তু তত্ত্ব-সেবনের প্রয়োজন রহিয়াছে, কাজেই তত্ত্বের সূক্ষ্ম অর্থে তাহার অধিকার জন্মিয়াছে।

স্থূল তত্ত্বের সেবায় যদি স্থূলের প্রতি অনুরাগ খর্ব্ব হয়, তাহা হইলে "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ

থাকে না। সত্য, যথেচ্ছাচারীর পক্ষে একথা যথার্থ। যথেচ্ছাচারীর ভোগে যখন সামর্থ্য থাকে না, তখনও সে অন্তকে বলে, 'তুই খা, আমি দেখি।' কিন্তু যথেচ্ছাচারীর পক্ষে যাহা সত্য, আচারস্থ ব্যক্তির পক্ষে তাহা সত্য নহে। 'সমঃ সমং শাম্যতি,' 'বিষস্য বিষমৌষধং,' এ সব কথা সত্য বটে, কিন্তু সর্প যাহার শরীরে এক বিন্দু বিষ ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাকে এক গেলাস তীব্র হলাহল খাওয়াইয়া দিলে সে বাঁচে না। সদৃশ-বিধান চিকিৎসা-প্রণালীতে ঔষধের মাত্রা যে কার্য্য করে, তন্ত্রোক্ত আচারে আচারস্থ ব্যক্তির ভাব, অর্থাৎ অন্তরস্থ ঐকান্তিক বৃত্তি সেই কার্য্য করে। যাহার এই ভাবটুকু নাই, আচারস্থ হইয়া এই ভাবটুকু তাহাকে আনিতে হয়। ইহাই সাধকের কর্তৃত্ব, পুরুষকার বা নিজস্ব; আচার এই ভাব-সংগ্রহে সাহায্য করে। মাংস পদার্থ এক, কিন্তু কষাইখানার মাংস খাইতেছি, আর মহামায়ার মন্ত্রপূত মহাপ্রসাদ খাইতেছি, এই দুই ভাবের পার্থক্য আকাশ পাতাল।

হিন্দু সমাজের অনেকেই তন্ত্রোক্ত আচারে চলেন, কিন্তু যিনি যে আচারে চলেন, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না কেন? অনেকের পরিবর্ত্তন হয়, আবার অনেকের হয় না। পরিবর্ত্তন হয় কিনা, তাহা কে দেখিতে যায়? হিন্দু সমাজ মৃতবৎ, তন্ত্রাচারও মৃতবৎ, এখন নাস্তিক-সমাজ এবং যথেচ্ছাচারই সজীব, মৃতের সংবাদ কে লয়? যাহাদের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহারা যে শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় সেই শ্রেণীতেই জন্ম কাটায়। তাহারা পথ পাইয়াই সন্তুষ্ট, পথে দাঁড়াইয়াই জীবন কাটাইতেছে,—পথে যে চলিবার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে হয়, এ শক্তি বা বুদ্ধি তাহাদের নাই, তাহাদের হৃদয় ভাবশূন্য, ধর্ম্ম প্রাণশূন্য! তাহাদিগকে ভাব দেয় কে? ধর্ম্ম বুঝায় কে? তাহাদের গুরুও গুরুগিরিতেই ব্যাকুল—বার্ষিকের জন্য ব্যস্ত এবং শিষ্য-

সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য বিব্রত।

গুরুত্যাগ কথাটা কি? গুরুত্যাগ হয়, হয়ও না। যিনি পাঠশালার গুরু-মহাশয়, তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়েও গুরুগিরি করিবেন এমন কথা নহে; তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ভূষিত যুবক পাঠশালার গুরুমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলে, 'ইনি আমার শিক্ষক'।

গুরু-কুল-ত্যাগ অবৈধ, কিন্তু দুই স্থলে তাহা বৈধ :—(১) যদি গুরু-কুলে গুরু-যোগ্য ব্যক্তির অভাব হয়, (২) যদি জন্মান্তরীণ গুরুর উদ্দেশ না পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কখন কখন স্বয়ং ইষ্টদেবতা অথবা দৈব-প্রেরিত কোন মহাত্মা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন, ইহাতে গ্রহীতার কোন কর্তৃত্ব থাকে না, সুতরাং এ স্থলে ত্যাগ শব্দই ব্যবহার করা যায় না।"

১২ই তারিখে এইরূপ লিখিতেছেন :—

"গুরুকুল শিষ্যের উপরে অনেক আশা রাখেন, সুতরাং বিনা কারণে তাঁহাদিগকে নিরাশ করা কর্তব্য নহে।

মুমুক্ষুর পক্ষে তন্ত্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত গুরু চাইই; গুরুকুলে পাওয়া গেলে ভাল—না পাওয়া গেলে কাজে কাজেই অন্যের শরণাপন্ন হইতে হইবে। তন্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরুর অভাবে নরক, আবার গুরুকুলত্যাগে নরক, এই দুই অসঙ্গত কথা জগন্মাতা বা জগৎপিতার মুখ হইতে কখনও বাহির হইতে পারে না। হয় কোন তৃতীয় বাক্য দ্বারা উভয়কে সংলগ্ন করিতে হইবে, আর না হয় এই দুই বাক্যের অন্যতর কোন স্বার্থান্ধ ব্যক্তি কর্তৃক হস্তলিখিত পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিতে হইবে, ইহার তৃতীয় পন্থা দেখা যায় না।"

১৩ই এইরূপ লিখিতেছেন :—

"কলিতে সকল আচারে এবং সকল ভাবে অধিকার আছে কিনা? যদি কলিদূষিত জীবের উদ্ধারই তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ উদ্দেশ্য হয়, তবে কলিতে অধিকার না থাকিবে কেন? কলিকে দুইভাবে দেখা যাইতে পারে, জীবগতভাবে এবং কালগতভাবে। যে স্থলে কলি জীবগতভাবে বর্ত্তমান, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলি দোষাশ্রিত, সে ব্যক্তি বিধি নিষেধের অধীন বটে, কিন্তু তাহাও সর্ব্বত্র নয়, এখনও সত্যযুগের লক্ষণযুক্ত লোক অনেক আছেন, চিরদিনই থাকিবেন, তাহারা নিষেধের অধীন হইবেন কেন? কালকে কলি কখনও দূষিত করিতে পারিবে না—মহাকাল নির্লিপ্ত। জীবই দূষিত, জীবই কলির অধিকারগত।

অধিকার সম্বন্ধে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় যোগ্যতা—যে যে বিষয়ে যোগ্য, সে সেই বিষয়ের অধিকারী, চিরদিন আছে এবং থাকিবে। এ সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় কথা নাই।

অধিকার নির্ণয় করিবে কে? বড় কঠিন কথা। কেহ উচ্চ বিষয়ের অধিকারী হইয়াও আপনাকে নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করে, আবার কেহ নিতান্ত অনুপযুক্ত হইলেও অতি উচ্চ বিষয়ের অধিকারী বলিয়া অভিমান করে; এই বিপদ হইতে জীবকে মুক্ত করিতে সমর্থ একমাত্র গুরু। শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া দীক্ষিত করা কঠিন নহে, কিন্তু শিষ্যের আত্মার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পথ্য-পরিবর্ত্তন বিধান করা এবং স্তরের পর স্তরে শিষ্যকে উন্নতির দিকে লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন, এবং এই কঠিন কার্য্যই প্রকৃত গুরুগিরি। গুরু কেবল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় বাধ্য হইয়া এবং মহামায়ার কৃপা-কামনায় এই দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন।

কিন্তু সদ্‌গুরু পাওয়া গেল না বলিয়া নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নাম বা মন্ত্র, যাহার যাহা থাকে, সে তাহাই লইয়া ভক্তিভাবে সাধন করিতে থাকুক, ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হইবে, আত্মা প্রসন্ন হইবে, এবং অবশেষে প্রকৃত সদ্‌গুরুও মিলিবে। অনেক সময়ে জগন্মাতা এবং জগৎপিতাও স্বয়ং গুরুর কার্য্য করিয়া থাকেন।"

পরে এইরূপ লিখিতেছেন :—

"অধিকার লাভে পুরুষার্থের প্রয়োজন। আজ যে এক বিষয়ে অনধিকারী, কিছুদিন সাধনের পর সে সেই বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে। আজ যে ঘোর কলির অধিকারে আছে, কিছুদিন যত্নের সহিত সাধন করিলে সে সত্যযুগের জীব হইতে পারে।

সাধন কি? কথাটা শুনিলেই ভয় হয়, শব-সাধন প্রভৃতি মনে পড়ে। যত্নের সহিত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই সাধন; আর যে উদ্দেশ্যে কার্য্য করা যায়, সেই উদ্দেশ্য হস্তগত হওয়াই সিদ্ধি। সাধনের পথ অনেক, কিন্তু একটাতে পটুতা লাভ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সিদ্ধি এক ইষ্ট দেবতার কৃপালাভ; কিন্তু তাহার প্রকার অশেষ—কে কি প্রকারে জগন্মাতার কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হয়, তাহা কেবল সেই সাধকই বলিতে পারে। অনেক সময়ে কিসে কি হয়, সাধক নিজেও বলিতে পারে না—কখন সমুদ্র সিঁচিয়া ব্যর্থ মনোরথ হয়, আবার কখন গোষ্পদেও অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

৪ই তারিখে এইরূপ লিখিতেছেন :—

সাধনের মূল ধন বিশ্বাস। ভৌতিক বিশ্বাসের সঙ্গে আধ্যাত্মিক

বিশ্বাসের একটুকু প্রভেদ আছে। সিদ্ধি পর্য্যন্ত চারিটি অবস্থা চাই :—

(১) পদার্থের অস্তিত্ব, (২) অস্তিত্বে বিশ্বাস, (৩) বিশ্বাসানুগত সাধন, (৪) সাধনারূপ সিদ্ধি।

ভৌতিক অবস্থা :—

(১) মৎস্য আছে, (২) এই নদীতে মাছ আছে, (৩) জাল ফেলা, (৪) মাছ ধরা।

আধ্যাত্মিক অবস্থা :—

(১) ঈশ্বর আছেন, (২) ঈশ্বর আমার পক্ষে লভ্য, (৩) জপাদি, (৪) ঈশ্বরলাভ।

প্রভেদটুকু এই :—

যদি নদীতে মাছ থাকে, কিন্তু ধীবর বিশ্বাস করে যে মাছ নাই, অথচ অন্যের অনুরোধে জাল ফেলিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে মাছ পাইবে। যদি মাছ না থাকে, কিন্তু মাছ আছে বলিয়া ধীবর বিশ্বাস করে, তাহা হইলে সে শতবৎসর জাল ফেলিয়া বসিয়া থাকিলেও মাছ পাইবে না। এখানে চতুর্থ অবস্থা প্রথম অবস্থার উপরে, অর্থাৎ সিদ্ধি বা প্রাপ্তি অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে। অন্যপক্ষে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ত কথাই নাই; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, অথচ আমার পক্ষে তিনি অলভ্য, এই অবিশ্বাসটুকু যাহার মনে আছে, সে হাজার জপ তপেও ঈশ্বরকে পাইবে না। এখানে চতুর্থ অবস্থা দ্বিতীয় অবস্থার উপরে, অর্থাৎ সিদ্ধি বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন সত্য; কিন্তু বিশ্বাসের মাত্রা প্রহ্লাদের ন্যায় গাঢ় না করিতে পারিলে, তিনি স্ফটিকের স্তম্ভ হইতে বাহির হন না।"

পরে এইরূপ লিখিতেছেন :—

"অস্তিত্বে উপলব্ধি না জন্মিলে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। ঈশ্বর যে

আছেন, তাহার প্রমান কি? জালে মাছ উঠিতেছে, ইহাই নদীতে যে মাছ আছে, তাহার প্রমাণ। তুমি আছ, আমি আছি, জগৎ আছে, কেবল ঈশ্বরই কি নাই? অন্য বৈজ্ঞানিক জটিল প্রমাণ নাই বা লইলাম, আমার সহজ আত্মপ্রত্যয়টা ছাড়ি কেন? আমি কে, আমার প্রকৃতি কি, কোথা হইতে কোথায়, কেন আসি কেন যাই, এ সকল আমি নিজেই জানি :না, অথচ আমি আছি, এ বিশ্বাস করি। এইরূপ ঈশ্বর-সম্বন্ধে সকল কথার আদি অন্ত না জানিলেও তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। আমার পরিচয় আমি জানি না, অথচ আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেকে কার্য্য করিতেছি, জগতের ব্যাপার কেমন শৃঙ্খলার সহিত চলিয়া যাইতেছে। আমি নাই, এই বিশ্বাস করিয়া যদি প্রত্যেকে কার্য্য করিত, একবার ভাবিয়া দেখ জগতে কি বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত! ঈশ্বর আছেন, এই বিশ্বাসের উপরেই মানব-সমাজের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। ঈশ্বর নাই, এই বিশ্বাসে সমাজের প্রত্যেকে কার্য্য করিতে থাকিলে একটা ঘোর হুলস্থূল পড়িয়া যাইত, সমাজের ঘোর বিপর্য্যয় ঘটিত, মানব-সমাজ পশু-সমাজে পরিণত হইত! আর এক কথা, চারিযুগ ধরিয়া জগতের আত্মজ্ঞান সদাত্মা সাধু মহাপুরুষেরা ঈশ্বর চিন্তা করিয়া ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া, আর সকল বিষয়ে সত্য এবং সাধুতা দেখাইয়া কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধেই যত মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ করিতে না পারিলে তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করিবার কাহারও অধিকার দেখি না।"

পরদিন এইরূপ লিখিতেছেন :—

"মন্ত্রটা কি? প্রথমাবস্থার মন্ত্র নির্জ্জীব শব্দ মাত্র, কিন্তু ভাব সহকারে জপ করিতে করিতে উহা সজীব মন্ত্ররূপে পরিণত হয়।

লৌহের সঙ্গে মন্ত্রের কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে:—লৌহ মন্ত্র, অয়স্কান্ত ভাব, ঘর্ষণ জপ। ঘর্ষণ দ্বারা লৌহ অয়স্কান্তের গুণ লাভ করে। জপ দ্বারা মন্ত্র ভাবের সজীবতা লাভ করে।

তবে ত শব্দ মাত্রেই মন্ত্র হইতে পারে? পারে, যেমন ধাতু মাত্রেই অয়স্কান্তের গুণ গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু লৌহ ছাড়া অন্যান্য ধাতু এত অল্প পরিমাণে অয়স্কান্তের গুণ এত অধিক পরিশ্রমে প্রাপ্ত হয় যে তাহাকে নার সামিলই ধরা যায়। নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র ছাড়া সাধারণ শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা—বহুশ্রমে অল্প ফল।

দীক্ষা-মন্ত্রে কতকগুলি উচ্চারণ-যোগ্য অক্ষর আছে, তাহাদিগকে বীজ বলে। যেমন বীজের মধ্যে অব্যক্তভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ অন্ত-র্নিবিষ্ট থাকে, সেইরূপ এই সকল বীজাক্ষরের প্রত্যেক তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমগ্র শক্তিসহ অব্যক্তভাবে অন্তর্নিবিষ্ট আছেন। জপ ইঁহাদিগের পক্ষে উদ্বোধন—জপ করিতে করিতে জপিত বীজের দেবতা জাগিয়া উঠেন; ইহাই মন্ত্র-চৈতন্য। এই সকল দেবতাকে যে সে শব্দের সাহায্যে জাগ্রত করা অসম্ভব না হইলেও খুব কঠিন—স্ফটিক স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ-মূর্ত্তি বাহির করা যেমন কঠিন, প্রায় সেইরূপ কঠিন।

মনে কর, অয়স্কান্তের সঙ্গে শতমাত্রা ঘর্ষণ করিলে লৌহ অয়স্কান্তের গুণ প্রাপ্ত হয়। কেহ একখানি লৌহ পঞ্চাশ মাত্রা ঘর্ষণ করিয়া যদি তাহা ফেলিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার লব্ধগুণ ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে ২০।৩০ বৎসর পরে আবার তাহা ঘর্ষণ করিতে গেলে অন্ততঃ ৮০।৯০ মাত্রা ঘর্ষণ করিলে তবে তাহাতে অয়স্কান্তের গুণ জন্মিবে। আবার কেহ যদি একখণ্ড লৌহ ১০০ মাত্রা ঘর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, আর তাহার অব্যবহিত পরে আর একজন উহা হাতে লয়, তবে সে উহাতে অয়স্কান্তের সম্পূর্ণ গুণই পাইবে। কিন্তু মনে করিয়া লও, অব্যবহারে পড়িয়া থাকিলে

লৌহ-খণ্ড লব্ধগুণ আবার হারাইতে থাকিবে, এবং শত বৎসর পরে হয়ত তাহাতে সে গুণ আর কিছুই থাকিবে না, সুতরাং তাহাকে অয়স্কান্তের গুণ বিশিষ্ট করিতে হইলে পুনরায় তাহাকে সম্পূর্ণ শত মাত্রায় ঘর্ষণ করিবার প্রয়োজন।”

তাহার পরদিন পুনরায় এইরূপ লিখিতেছেন :—

“ঘর্ষণে যেমন লৌহের শক্তি বাড়ে এবং ঘর্ষণের অভাবে কমে, জপে সেইরূপ মন্ত্রের শক্তি বাড়ে এবং জপের অভাবে কমে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সাধকেরা জপ করিয়া মন্ত্রের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য অন্য যুগে কোটি জপে যাহা হইত না, কলিতে লক্ষ জপে তাহা হয়। এ জন্যও বটে, আর কলির জীব অল্পায়ু এবং দুর্ব্বল বলিয়া জগজ্জননীর কৃপার জন্যও বটে।

লব্ধগুণ লৌহখণ্ড ঘর্ষণকর্ত্তার অপেক্ষা করে না, যে সে অবস্থায় যে সে ব্যক্তির হস্তে কার্য্য করে; কিন্তু মন্ত্র তাহা করে না—মন্ত্রকে যিনি সজীব করেন, তিনি নিজে না দিলে পড়িয়া-পাওয়া পুস্তকে লিখিত মন্ত্রে সে চৈতন্য থাকে না। এজন্য পুস্তক হইতে গৃহীত মন্ত্রের জপ নিষিদ্ধ, এই জন্যই সিদ্ধ গুরুর প্রয়োজন। একটা লোককে শিষ্য করিতে গুরুর পক্ষে কত পরিশ্রমের প্রয়োজন, ইহা দ্বারাও তাহা বুঝা যায়। যাহা হউক, গুরু হইতে গৃহীত মন্ত্রে চৈতন্য না থাকিলেও অনলস-দৃঢ়নিষ্ঠ শিষ্য তাহাতে চৈতন্য জন্মাইতে পারে—যদি অতিমাত্র সংখ্যা জপ করিতে পারে।

যিনি একটি মন্ত্রে চৈতন্য জন্মাইতে পারিয়াছেন, তিনি তন্ত্র হইতে যে কোন মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া জপদ্বারা তাহাতে চৈতন্য জন্মাইয়া তাহা শিষ্যকে দিতে পারেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, মন্ত্র দিবার পূর্ব্বে

গুরুকে :কি ভাবে প্রস্তুত হইতে হয়। গৃহী গুরুগণ শিষ্যের মন্ত্রের জন্য প্রায়ই খাটেন না, সে খাটুনি ষোল আনা শিষ্যের। নিঃস্বার্থ উদাসীন দিগের নিকটে কখন কখন সজীব মন্ত্র পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে, মন্ত্র সচেতন হইলে প্রথম জপের দিনেই তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। আমি যে দিন প্রথম জপ করিলাম, সেদিন খোরসেদপুরের মাতাঠাকুরাণী আমার সঙ্গে জপে বসিয়াছিলেন; জপের পরে দেখা গেল, তাঁহার বৎসরের নেত্র-স্পন্দন রোগ সারিয়া গিয়াছে।

ন্ত্র-সিদ্ধির লক্ষণ তন্ত্রে দ্রষ্টব্য; কিন্তু ইহার সমস্ত লক্ষণ নিঃশেষ করিয়া বলা যায় না, প্রত্যেক সাধক আপন আপন ভাবে এবং আপন আপন যোগ্যতায় আপনি তাহা বুঝেন।

জপ ব্যতীত অনেক সময়ে কেবল ভাবে, অর্থাৎ নিষ্ঠা, নির্ভর, সরলতা, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণে ইষ্টলাভ হয়; তবে মন্ত্রের সহায়তা পাইলে যেমন সহজ হয়, তেমন সহজ হয় না। কিন্তু ভাবশূন্য জপে ইষ্টলাভ অসম্ভব, যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে চুম্বকের সঙ্গে ঘর্ষণ না করিয়া লৌহের উপর কেবল হাত বুলাইলেও তাহাতে চুম্বকের গুণ জন্মিতে পারিত। তবে মহাত্মাদিগের প্রসাদে এবং প্রভাবে কদাচিৎ এ বিষয়ে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে সকল দৈব ঘটনার অন্তর্গত।

সিদ্ধমন্ত্রীদিগের একটা সাধারণ লক্ষণ এই, তাঁহারা পরোপকারী এবং জগতের মঙ্গলকামী,—শিশু হইতে যেমন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, সেইরূপ যাঁহারা জগজ্জননীর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে ভয়ের কোন কারণ নাই। ইষ্টমন্ত্র সম্বন্ধে একথা।

ধৈর্য্যহীনের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। জপে ধৈর্য্যের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এ জন্মে না হউক, জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভ করিব, মনে মনে এ পরিমাণ ধৈর্য্য থাকা চাই। ধৈর্য্য এবং ব্যাকুলতার অটল

সামঞ্জস্য চাই—ব্যাকুলতা থাকিবে, কিন্তু তাহা অধৈর্য্যকে আনয়ন করিতে পারিবে না। অধৈর্য্য একটা রাক্ষস বিশেষ; যখন উহা হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, তখন সমস্ত পূজার উপকরণ—সমস্ত যত্নের আয়োজন লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে।

মন্ত্র একটা উপলক্ষ্য, একটা প্রবল সহায় মাত্র, কিন্তু আসল ভাব। শুদ্ধ ভাবে সিদ্ধি হয়, ধ্রুব প্রহ্লাদের মত হইতে পারিলে; শুদ্ধ মন্ত্রে, অর্থাৎ ভাব বিহীন মন্ত্রে, সিদ্ধি হইতে দেখা যায় না। ভাবের সঙ্গে মন্ত্রের যোগ হইলে সকলেরই সিদ্ধি হইতে পারে।”

তারপর একদিন এইরূপ লিখিতেছেন :—

“তন্ত্রের সাধনে এ লুকোলুকি কেন? যে রত্ন যত মূল্যবান্, সে তত লুকান থাকে, অথবা যে যাহাকে যত মূল্যবান্ মনে করে, সে তাহাকে তত লুকাইয়া রাখে। সর্ব্বত্র লুকোলুকি নাই—সাধকে সাধকে বা গুরু শিষ্যে লুকোলুকি নাই। মন্ত্র তন্ত্র এবং সাধন ভজনের কথা সাধারণ চক্ষুঃ হইতে একটুকু লুকাইয়া রাখাই ভাল, এবং আমাদের ভাল বলিয়াই জগৎপিতা ও জগন্মাতার এইরূপ আদেশ। কথায় বলে ‘তিন কাণে মন্ত্র নষ্ট।’ কাজেও দেখা যায়, অনেক কথা সাধারণে প্রকাশ হইলে তাহার আদর থাকে না, তাহার ফলও ফলে না। লুকোলুকিতে ক্ষতিই বা কি? সাধনের জন্য কেহ কিছু চাহিয়া পাইল না, এমন ত নয়? তবে কেবল কৌতূহলতৃপ্তির জন্য ইহার দ্বার যে উন্মুক্ত নহে, সে ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। গ্রন্থে সমস্তই লিখিত আছে, কিছুই লুকান নাই, লুকান কেবল ব্যাখ্যায়, কেবল ক্রিয়ায়, কেবল সাধনে, আর কেবল আয়ত্ত তত্ত্বের প্রকাশে। একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র বালকের কাছে সামান্য আদরের বস্তু, কিন্তু একজন জ্যোতির্ব্বিদের কাছে তাহা অমূল্য রত্ন।

তোমার যদি একটী দূরবীক্ষণ থাকে, আর তুমি যদি তাহা একটা বালককে না দিয়া একজন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতকে দাও, সেজন্য কি তুমি নিন্দাভাজন হইবে? হিন্দু ধর্ম্মের, বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের এই অধিকার-তত্ত্ব বড়ই উপকারী। বুদ্ধিমতী জননী পাঁচটি ছেলেকে যথাযোগ্য আহার দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, কাহাকে বা দুবেলা পেট ভরিয়া মাংস রুটি খাইতে দিতেছেন, কাহাকেও দণ্ডে দণ্ডে এক ঝিনুক করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া বাঁচাইতেছেন, যদি অধিকার বিবেচনা না করিয়া একের খাদ্য অন্যকে দিতেন, তাহা হইলে কেহই বাঁচিত না। কিন্তু আজ যে শিশু এক ঝিনুক দুগ্ধ খাইয়া বাঁচিতেছে, একদিন সেই কি ঐ মার হাতে পেট ভরা দুধ রুটি পাইবে না?

অধিকার শিষ্য নিজে বুঝে না, তাহা বুঝেন গুরু, এইজন্য প্রথমাবস্থায় পদে পদে গুরুর প্রয়োজন। শত শত পুস্তকে যাহা না হয়, গুরুর এক কথায় তাহা হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসকের নিকট না যাইয়া চিকিৎসার বই খুলিয়া বসিলে যে ফল হয়, বিনা গুরুতে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেও সেই ফল ঘটে। দুগ্ধ জীর্ণ করিতে অক্ষম শিশু মাংস-খণ্ড মুখে লইয়া বিব্রত হয়, জ্বর-রোগী বাটি বাটি অম্লরস পান করিতে থাকে।

গুরুর কি ভুল হয় না? হয়, তবে তাহার সংশোধন সহজে হইতে পারে; কিন্তু শিষ্যের ভুল প্রায়ই সংশোধনের অতীত, অনেক সময়ে মারাত্মক।

কেবল একটা জিনিস—কেবল ভক্তি লইয়া সাধক গুরুর সাহায্য ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু সে সাধনের পথে নহে, ভক্তির পথে। স্নেহময়ী জননী বুদ্ধিমান যুবক পুত্রের স্তব-স্তুতিতে আগে কাণ দেন, কি অসহায় শিশু সন্তানের ক্রন্দনে আগে ব্যাকুল হন, তাহা সকলেই জানে।

কিন্তু ভক্তির পরিমাণ কত, তাহার জোর কত, সে ভক্তি স্থায়ী এবং অটল কিনা, ইহা বিবেচ্য। প্রকৃত ভক্তি বিচার-বিতর্কের অতীত;— সে আপনার দুর্ব্বলতা জানে, অথচ মাকে ধরিয়া টানে। প্রকৃত ভক্তের বল শিশুর বলের তুল্য—মাতার নিকটে শিশু সন্তান যেমন, জগজ্জননীর নিকট ভক্তও সেইরূপ।

ক্বচিৎ কোন কোন স্থলে বিনা ভক্তিতে এবং বিনা সাধনেও জগজ্জননীর কৃপা দেখা যায়। এরূপ অহৈতুকী ভক্তির কারণ কি, তাহা কেবল যিনি কৃপা করেন তিনিই বলিতে পারেন, আর বলিতে পারেন ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ মহাপুরুষেরা।"

পরদিন এইরূপ লিখিতেছেন :—

"জপ-বিঘ্ন অশেষ প্রকার। সমস্ত বিঘ্নকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—বহির্ব্বিঘ্ন এবং অন্তর্ব্বিঘ্ন। মনুষ্যের উৎপাত, হিংস্রজন্তুর ভয়, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, রোগ, এবং নানাবিধ অচিন্তিত-পূর্ব্ব প্রতিবন্ধক, এই সমস্ত বহির্ব্বিঘ্ন। সংসারের স্মৃতি, কামক্রোধাদি রিপুর উৎপাত, নৈরাশ্য, সন্দেহ, বিতর্ক, অবিশ্বাস, অহঙ্কার, আত্মনির্ভর প্রভৃতি অন্তর্ব্বিঘ্ন। বহির্ব্বিঘ্ন ঘুচিতে পারে, কিন্তু অন্তর্ব্বিঘ্ন ঘটিলে দূর করা কঠিন। উভয় প্রকার বিঘ্নতেই মার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং তাঁহার কৃপায় অটল বিশ্বাস ভিন্ন উপায় নাই। জপে বসিবার সময়ে কেবল মা এবং মন্ত্র, এই দুইটা কথামাত্র মনে থাকিবে, আর সমস্ত চিন্তা মানস-ভূমি পরিত্যাগ করিবে, তদ্গতচিত্ত হইলে আমিত্ব-বোধ পর্য্যন্ত লোপ পাইবে। খুব উন্নত অবস্থায় মা, গুরু, মন্ত্র এবং আমি, এই চারিটির পার্থক্য ঘুচিয়া যায়।"

পরদিন এইরূপ লিখিতেছেন :—

"কর্ম্মফল বা কর্ম্মবন্ধন কি? কোদালি দিয়া মাটি কাটিয়া গর্ত্ত করিলে, আবার কোদালি দিয়া মাটি কাটিয়া গর্ত্ত বুজাও; অনিয়ম করিয়া রোগ আনিলে, আবার ভুগিয়া, ঔষধ খাইয়া বা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া রোগ সারাও; পাপ করিয়াছ, পুণ্য করিয়া তাহা কাটাও; পুণ্য করিয়াছ, স্বর্গভোগ করিয়া তাহা ক্ষয় কর; ইহাই কর্ম্মফল, কর্ম্ম-বন্ধন বা কর্ম্ম-ভোগ। আটাল ছাড়ে, আলকাতরা ছাড়ে, কিন্তু ইহা আর ছাড়ে না, জন্ম জন্মান্তরে সঙ্গে চলে। আজ যিনি প্রবঞ্চনা-প্রতারণায় স্বার্থ-সাধন করিয়া মনে মনে ভাবেন ভারি জিতিলেন, ভারি বুদ্ধিমানের কায করিলেন, যখন কাযে ফল ধরিবে, তখন তিনি বুঝিবেন, নিতান্ত হারিয়াছেন, নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছেন, কারণ কাযটা হয় একদণ্ডে, এক মুহূর্ত্তে, প্রায়ই তাড়াতাড়ির সঙ্গে, কিন্তু ফল ভুগিতে হয় রহিয়া সহিয়া, জন্ম ভরিয়া।

যাহাতে কর্ম্মফলের ক্ষয় বা লাঘব হয়, তাহাই পুরুষকার। পুরুষকারে যত্ন, চেষ্টা, শ্রম ও কর্ত্তৃত্ব চাই। যেমন কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব থাকে বলিয়াই আমি আমার কর্ম্মের ফলভাগী, সেইরূপ পুরুষকারে কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়াই তাহাতে আমার কর্ম্মফল কাটিতে পারে। গো-বধ করিয়াছি, তাই প্রায়শ্চিত্ত করিলাম—যে অবশ্যম্ভাবী ফল ভবিষ্যতে ভোগ করিতে হইত, প্রকারান্তরে এখনই দণ্ডভোগ করিয়া তাহার প্রতিষেধ করিয়া রাখিলাম, ইহা এক প্রকার পুরুষকার। কর্ম্ম পাপই হউক আর পুণ্যই হউক, তাহাতে ইচ্ছা আছে, কর্ত্তৃত্ব আছে; কিন্তু ফলভোগে ইচ্ছাও লাগে না, কর্ত্তৃত্বও লাগে না, আপনারি কৃত কর্ম্মই ঘাড়ে ধরিয়া তাহা ভোগ করায়। কোন্‌টা কর্ম্ম আর কোন্‌টা কর্ম্মের অনিবার্য্য ফল, ইহা দ্বারাই তাহা অনেকটা বুঝা যায়।

কর্ম্ম অশেষ, তাহার ফলও অশেষ। প্রতি পলে কর্ম্ম করিতেছি, প্রতিপলে তাহার ফল ভোগ করিতেছি—সর্ব্বদা কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের জালে যেন আবৃত রহিয়াছি। এই রাশি রাশি কর্ম্মের ফলকে নির্ম্মূল করা পুরুষকারের সাধ্য নহে। এখন কথা হইতেছে, যদি কর্ম্মের ফল অনিবার্য্য হয়, তবেত কর্ম্মই প্রধান, কর্ম্মই আমার ভাগ্য-নির্ম্মাতা, সুতরাং কর্ম্মই উপাস্য; তবে আর ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রয়োজন কি? যিনি কর্ম্মের সঙ্গে ফল অনুস্যূত করিয়া, আমাকে অভেদ্য কর্ম্মজালে ফেলিয়া তামাসা দেখিতেছেন, তাঁহার থাকা না থাকাতেই বা আমার লাভ লোকসান কি?

এ সকল কথা সত্য; আমি জগজ্জননীকে ডাকিতাম না, তাঁহার আশ্রয় লইতাম না, যদি তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধ-চ্ছেদের অধিকার এবং শক্তি না থাকিত। ঐ যে মার হাতে অসিখানি দেখিতেছ, দানব-দলনে উহার প্রয়োজন যতটা না হউক, কর্ম্ম-বন্ধ-চ্ছেদনে উহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। একটা বন্ধন দিতে যে পরিশ্রম, তাহা খসাইতে বহুগুণ পরিশ্রম; কিন্তু বন্ধনটি কাটিয়া দিলে তাহা অতি সহজেই খসিয়া পড়ে। কর্ম্ম-বন্ধ-চ্ছেদনের অস্ত্র তোমার হাতে নাই, কিন্তু তোমার মঙ্গলের জন্য বিশ্ব-জননী নিজ হস্তে তাহা রাখিয়াছেন।

যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার ছেদন কিরূপে হইতে পারে? চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা এইরূপে হইতে পারে। তুমি জীব, তুমি কর্ম্মফলের অধীন। জগজ্জননী এই সৃষ্টির সমস্ত কর্ম্মই করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন, অথচ তিনি এই বিশাল কর্ম্ম-জালের বা তাহার ফল-ব্যূহের অধীন নহেন, তিনি নিত্য স্বাধীন। জীবের কর্ম্মের সঙ্গে ফল লাগিয়াই থাকে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কর্ম্ম বিশ্ব-জননীর হাতে যায়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার ফলটি খসিয়া পড়ে। এই সরল যুক্তি, সরল সত্য,—মহাশক্তির কর্ম্মে ফল থাকিতে পারে না; তুমি যে মুহূর্ত্তে কর্ম্মটি তাঁহাকে দান করিলে,

সেই মুহূর্ত্তেই উহা তাঁহার হইল; সুতরাং, যে মুহূর্ত্তে কর্ম্মটি তাঁহার হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার ফলটি খসিয়া পড়িল। যদি ইহা বুঝিয়া থাক, তবে প্রাণ ভরিয়া কর্ম্ম কর, কর্ম্ম-ফল আর তোমাকে বাঁধিতে পারিবে না।

মাকে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারিব কখন? যখন তাঁহার কৃপা হইবে। মুক্তি—অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি; দুঃখ—কর্ম্মফলের বন্ধন; যখন সেই বন্ধনের ছেদন হইল, তখনই মুক্তি হইল। অনেকে মনে করিবে, তবে ত বেশ হইল, মুক্তির এমন সহজ পথ আর কি হইতে পারে? এখন হইতে যত কাজ করিব, সমস্তই ভগবানে সমর্পণ করিয়া লেঠা চুকাইয়া রাখিব। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নহে। তোমার সমস্ত কর্ম্মের বোঝা ভগবান্ কি সহজে লইতে চান? সকলের কর্ম্ম নিজের হাতে লইলে আর জগতে কর্ম্ম-বন্ধন থাকে কই, লীলা ঘটে কই? জ্ঞান ও ভক্তির প্রয়োজন এবং কৃপার মাহাত্ম্য থাকে কই?

ব্রহ্মে কর্ম্ম-সমর্পণই কর্ম্ম-বন্ধ-চ্ছেদ, এবং কর্ম্ম-বন্ধ-চ্ছেদই মুক্তি, এই কথা বুঝিয়াই জ্ঞান নিরস্ত, আর অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। এখন ভক্তির অধিকারে আসিয়া পড়িল, মুক্তি-সাধনের ক্রিয়া ভক্তি ভিন্ন আর কাহারও করিবার সাধ্য নাই। কেবল 'কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিলাম' বলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিলে কর্ম্ম-ফল তোমাকে ছাড়িবে না, সে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্র আবার আসিয়া তোমার ঘাড়ে পড়িবে। ভক্তির সহায়তায় আগে মার কৃপা লাভ কর, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহা দ্বারা তোমার সমর্পিত কর্ম্ম গ্রহণ করাও, তবে ত মুক্তি? দান এক পক্ষে হয় না, গ্রহীতা গ্রহণ করিলে তবেই তাহা দান, নতুবা দাতার জিনিষ দাতারই থাকে।

প্রকৃতভাবে কর্ম্ম সমর্পণ হইল কি না, তাহার লক্ষণ কি, তাহা জানিবার উপায় কি? প্রথমতঃ যে প্রকৃতভাবে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহাকে দিয়া মন্দ কাজ আইসে না, ভাল কাজ করাই

তাহার প্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ সে ব্যক্তি কর্ম্মের সাফল্যে উৎসাহিত এবং বৈফল্যে ক্ষুব্ধ হয় না। তৃতীয়তঃ তাহার কর্ম্মের স্মৃতি থাকে না, জমা খরচ থাকে না, নিন্দা বা প্রশংসায় মনোযোগ থাকে না, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্থায় তাহার কর্ম্ম অযত্নে আসিয়া অনন্ত কাল-স্রোতে ভাসিয়া যায়। এখন দেখ কর্ম্মার্পণ কেমন কঠিন। সেইজন্যই সাধনের প্রয়োজন। আগে রজোগুণের অনুষ্ঠান দ্বারা তমোজয় কর, তাহার পরে সত্বগুণের কার্য্য দ্বারা রজোজয় কর, তাহার পরে ত কর্ম্ম সমর্পণ—নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি ?

ইহাতে যেরূপ দেখা গেল, তাহাতে জ্ঞান কেবল জানাইয়া দিল, প্রকৃত সিদ্ধি ভক্তির অধিকারেই রহিল, তবে "জ্ঞানাৎ সিদ্ধিঃ" এই কথাটার অর্থ কি ? ঈশ্বর আছেন, ইহা জানা এক রকম জ্ঞান, আর ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারিলে তবে মুক্তি হয়, এই এক রকম জ্ঞান। এই শেষোক্ত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, কারণ ইহাতেই ভক্তিকে আনয়ন করে,এবং ভক্তি আসিলে পরে মুক্তিও উপস্থিত হয়—ভক্তির সঙ্গে মুক্তির চিরসখিত্ব। ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান ব্রহ্মাদিরও অগোচর ; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, এ জ্ঞান জগতে সকলেরই আছে,—কচিৎ কোন তার্কিক পণ্ডিতের সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও মূর্খ লোকের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; যদি এই জ্ঞানই সিদ্ধির কারণ হইত, তাহা হইলে জগতে আর কেহ অসিদ্ধ থাকিত না।

মুক্তির উপায় অবলম্বন করিয়া চল, অবশ্য মোক্ষ-লাভ হইবে, সময়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই—হয় দুই চারিদিনে, না হয় দুই চারি জন্মে হইবে, তাহাতে ক্ষতি কি ? অমর আত্মার কাছে সময় কিছুই নহে—শীঘ্র আর বিলম্ব কেবল কথার কথা। মুক্তিতে আনন্দ আছে, সাধনে—মুক্তি-পথের অনুসরণে কি আনন্দ নাই ?"

পরদিন এইরূপ লিখিতেছেন :—

"সকাম এবং নিষ্কাম সাধন কি? সাধন নিষ্কাম হয় না। নিষ্কাম অর্থাৎ কেবল ইষ্টদেবতার প্রীতিকাম হইতে পারিলেই মুক্তি হইল,—তখন সাধন নাই। কেবল অনন্ত আনন্দ, কেবল জগজ্জননীর স্নেহামৃত উপভোগ। যাহারা এক পয়সায় মরে বাঁচে, যাহারা সংসারের সুখ-দুঃখ চিন্তায় সর্ব্বদা উন্মত্ত, তাহাদের মুখে নিষ্কাম সাধনের কথা শুনিলে হাসি পায়! ভিতরে ইন্দুর রাখিয়া গর্ত্তের মুখ বুজাইলেই, গৃহ ইন্দুর-শূন্য হয় না। আগে ভিতর নিষ্কণ্টক কর—সুখ-দুঃখ ইচ্ছা-দ্বেষকে সমান কর, তাহার পরে নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা। পরের অমঙ্গল ও পার্থিব মঙ্গলের জন্য যে সাধন, তাহা নীচ সাধন; নিজের সুখ দুঃখে উদাসীন হইয়া পরের, সমাজের, স্বজাতির, স্বদেশের এবং সমগ্র মানবমণ্ডলী ও জীব-নিচয়ের মঙ্গলের জন্য যে সাধন, তাহা উচ্চ সাধন, কিন্তু নিষ্কাম নহে। যখন এই উচ্চ সাধন ঈশ্বর-প্রীতির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, তখন ইহাকে নিষ্কাম সাধন বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তখন উহা সাধন নহে, তখন উহা মুক্ত জীবের নিষ্কাম কর্ম্ম।"

পরদিন এইরূপ লিখিতেছেন :—

"কর্ম্ম তামসিক, রাজসিক এবং সাত্বিক। পরের অহিতের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাহা করা যায়, এবং যাহার পরিণাম দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি, তাহাই তামসিক কর্ম্ম। এই শ্রেণীর অধিকাংশ কর্ম্মই সর্ব্বসমাজে নিন্দিত এবং রাজদ্বারে দণ্ডার্হ। তামসিক কর্ম্ম (অভ্যাস একেবারে মজ্জাগত না হইলে) পরিত্যাগ করা কঠিন নহে, ভদ্রলোক হইবার ইচ্ছা, হৃদয়ে কিছু শক্তি এবং প্রতিজ্ঞায় কিছু দৃঢ়তা থাকিলেই ইহা ছাড়া যায়। পরের অহিত না করিয়া অথবা হিত করিয়া

নিজের সুখ এবং লোকের বাহবা পাইবার জন্য যে কর্ম্ম, তাহাই রাজসিক। অধিকাংশ যশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 'কাহার ধারিও না, কাহাকে ধারাইও না, নিজের পাঁচগণ্ডা বুঝিয়া সুজিয়া খাই থাকি,' এইরূপ ধারণা যাহাদের, তাহাদের কর্ম্মও রাজসিক, কারণ তাহারা নিজের হিত বই অন্য কিছু বুঝে না; তাহারা যে অন্যের অনিষ্ট করে না, সে কেবল নিজের অনিষ্টের আশঙ্কায়। রাজসিক কর্ম্ম ছাড়ান কঠিন, কারণ ইহা সাত্ত্বিক কর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া অনেক সময়ে ছদ্মবেশে থাকে। একই কর্ম্ম রাজসিক, সাত্ত্বিক এবং নিষ্কাম হইতে পারে, বাহিরের লোকে তাহার যেরূপ ইচ্ছা অর্থ খাটাইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা কেবল কর্ত্তাই বুঝিতে পারেন; কারণ যে ভাব ও উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম্মের শ্রেণী বিভাগ হয়, তাহা তাঁহারই হৃদয়ের বস্তু, তাঁহার কথা এবং সাধারণ ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। রাজসিক কর্ম্মের পরিহারে বিশেষ সাধন চাই; নিজের সুখের অসারতা বোধ, পরের প্রতি ভালবাসার বৃদ্ধি, মার কৃপা লাভ করিয়া নিষ্কাম ও বন্ধন-মুক্ত হইবার আগ্রহ, ইত্যাদি এই সাধনের উপায়। সর্ব্বোচ্চ সাধনের কর্ম্ম সাত্ত্বিক। ইহাতে বহিঃসম্পদে দৃক্‌পাত নাই, যাহাতে মনের মলা কাটিতে পারে, যাহাতে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রিপু-কুল নির্ম্মূল হইতে পারে, যাহাতে সরলতা, উদারতা, প্রেম, পরার্থপরতা প্রভৃতি বাড়িতে পারে, এই তাহার উদ্দেশ্য, এই জন্যই তাহার কর্ম্ম। সাত্ত্বিকের নিজ নাই, পরই তাহার বন্ধু, তাহার আপন, তাহার সর্ব্বস্ব,—পর না থাকিলে তাহার সংসার শূন্য হইত, তাহার কর্ম্ম থাকিত না। সে প্রেমের সহিত পরকে আলিঙ্গন করে—প্রেমময়ের প্রেম পাইবার আশায়।

সে পথ-প্রান্ত-শায়ী পীড়িত পথিকের শুশ্রূষা করে, দরিদ্র কুটীরবাসীর অভাব দূর করে, শীতার্ত্ত-ভিক্ষুকের উপরে নিজের গাত্র-বস্ত্র-খানি ফেলিয়া দেয়, হয়ত ইহাতেই জগজ্জননী সন্তুষ্ট হইয়া হৃদয়ে তাঁহার কৃপা প্রেরণ করিতে পারেন,—হয়ত ইহাতেই হৃদয়টা নির্ম্মল হইবে, আত্মাটা উন্নত হইবে. এই ভাবিয়া পরের জন্য যাহার সমস্ত, সে ধন উপার্জ্জন করে কেন. সম্পত্তি স্থির রাখে কেন? পাছে ধনের সঙ্গে ধর্ম্মসাধনের সুযোগ চলিয়া যায়, পাছে সে আর দুঃখীর অশ্রু মুছাইতে না পারে,—পাছে মূল সহ বৃক্ষটি দান করিয়া ফেলিলে আর তাহার ফলে পক্ষীদেরও আশ্রয় না থাকে, এই আশঙ্কায়। সাত্ত্বিক কর্ম্মী আত্মোন্নতি চায়, মার প্রসন্নতা চায়, হৃদয়ে আনন্দ চায়—কিন্তু সে কিছু চায়, ফল না চাহিয়া থাকিতে পারে না। এই সাত্ত্বিক কর্ম্মীই যখন আর এক পদ অগ্রসর হয়, যখন আর এক ধাপ ঊর্দ্ধে উঠে, তখন এই সাত্ত্বিক কর্ম্মই সে করে, কিন্তু তখন আর কিছু সে চায় না, কেন না, সে ঈশ্বরে কর্ম্মটা সমর্পণ করিয়া ফেলে—তখন সে নিষ্কাম হয়।

কর্ম্মে সকলেরই কি সুখ হয়? তামসিক এবং রাজসিক কর্ম্মেতে সুখ নাই, তাহার সাফল্যে সুখ, বৈফল্যে দুঃখ। সাত্ত্বিকের কর্ম্মেতেই সুখ, কারণ কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদয় পবিত্র হয়, আত্মা উন্নত হয়, আনন্দের উপভোগ হয়। তাহার কর্ম্মের সাফল্যে পরের সুখ, বৈফল্যে পরের দুঃখ, সুতরাং তাহার যে সুখ-দুঃখ, সে কেবল সমবেদনার জন্য। নিষ্কাম কর্ম্মীর কর্ম্মে সুখ দুঃখ নাই, কারণ কর্ম্ম তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসবৎ স্বাভাবিক। উহার সাফল্যে বা বৈফল্যেও তাহার সুখ-দুঃখ নাই, কারণ কর্ম্ম তাহার নহে, ঈশ্বরের। নিষ্কাম কর্ম্মীর কর্ম্মে আবার সাফল্য—বৈফল্য কি? সাফল্য-বৈফল্য আমাদের চক্ষে, তাঁহার চক্ষে

কিছুই নাই। নিষ্কাম কর্ম্মী একটা আমকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িলেন; যদি আমটি পড়িয়া যায়, আমরা বলি তাঁহার কর্ম্ম সফল হইল, যদি না পড়ে তবে বিফল হইল; কিন্তু তাঁহার পক্ষে উভয়ই তুল্য—তাঁহার মুখে এজন্য হর্ষও নাই, বিষাদও নাই। ফল পাড়িবার উদ্দেশ্যে যদি ঢিল ছোঁড়া হয়, তবে নিষ্কাম কর্ম্মীর ফলকামনা থাকিল না কিরূপে? ফল,—পাড়িয়া খাইবার একটা জিনিস—উহা বর্ত্তমান আছে, সম্মুখে একটা ঢিলও আছে, ঢিলটা ছুঁড়িয়া মারিবার বলও হাতে আছে, ইহার প্রত্যেকটি যেমন তোমার কাছে একটি স্বাভাবিক অবস্থা, ইহাতে সুখ বা দুঃখের কোন কারণ নাই, সেইরূপ, ঢিল ছুঁড়িয়া মারা, ফল পড়া বা না পড়া, ফল খাওয়া বা না খাওয়া, ইহার প্রত্যেকটি নিষ্কাম কর্ম্মীর নিকট স্বাভাবিক অবস্থা মাত্র। এক অবস্থা ঘটিলে হয়ত আর এক অবস্থা ঘটিত—ফল পড়িলে হয়ত তিনি তাহা খাইতেন; এক অবস্থা ঘটিল না, সুতরাং আর এক অবস্থাও ঘটিল না—ফল পড়িল না, সুতরাং তিনি খাইলেনও না; ইহাতে তাঁহার হর্ষ বিষাদ নাই। করিবার উপযুক্ত কিছু হাতের কাছে পাইলে তিনি করিয়া বসেন; ফল কি হইল, তাহা দেখিবার অভ্যাস বা অবসর তাঁহার নাই। ঢিল ছুঁড়িয়া ফল পাড়া একই কার্য্য, কিন্তু একটুকু প্রভেদ আছে;—তোমার একটা ঢিল ব্যর্থ হইলে তুমি হয়ত তিনটা ঢিল ছুঁড়িতে; কিন্তু তিনি একটি ছুঁড়িয়াই নিরস্ত। অধ্যবসায়—পুনঃ পুনঃ এক বিষয়ে চেষ্টা—ফলাকাঙ্ক্ষার প্রমাণ।"

পরদিন এইরূপ লিখিতেছেন:—

"বলিয়াছি, মুক্তাত্ম নিষ্কাম কর্ম্মীগণ কর্ম্মে আনন্দ পান না, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা সর্ব্বদাই আনন্দে আছেন, তাঁহাদের আনন্দের বিরাম নাই। যে সুখ অটল, অটুট, অক্ষয়, অস্খলিত, অপর্য্যাপ্ত এবং নিত্য তৃপ্তিকর,

তাহাই আনন্দ। ভক্তগণ মুক্তি চাহেন, সুখ-দুঃখ পরিশূন্য জড় পদার্থ হইয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিবার জন্য নহে, কিন্তু মার কোলে থাকিয়া নিয়ত এই আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য।

নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বিবিধ, অন্তর্ম্মুখ এবং বহির্ম্মুখ। যোগ—সমাধি—আধ্যাত্মিক কর্ম্ম—অন্তর্ম্মুখ., তাহা বহির্জগতে কেহ দেখিতে পায় না। বহির্ম্মুখ, কর্ম্ম বাহিরের লোকে সাত্ত্বিক-কর্ম্ম স্বরূপ দেখিতে পায়। যাঁহাদের নিষ্কাম কর্ম্ম বহির্ম্মুখ, তাঁহারা মা এবং তাঁহার সন্তানদিগের জন্য সকলই করিতে পারেন, প্রাণদান ত তুচ্ছ কথা। বহির্ম্মুখ নিষ্কাম কর্ম্মে তাঁহারা অতুল আনন্দ পাইয়া থাকেন। মার জন্য খাটিতেছি, মার সন্তানদিগের জন্য খাটিতেছি, ইহাতে মার আনন্দ হইতেছে, এইরূপ ভাবিলে জগতে কে কি না করিতে পারেন? যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা যায়, তাহার কর্ম্মে আত্মবিস্মৃত হইয়া খাটিতে খাটিতে কে আপনাকে ধন্য করিতে না চায়? বিশ্বজননীর প্রিয় কার্য্য করিতে, তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিতে, এ ক্ষুদ্র সন্তানেরও অধিকার আছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, এ চিন্তায় কেমন উন্মাদকর আনন্দ!

কলিতে এক পোয়া ধর্ম্ম, ইহার অর্থ কি? কলিতে কেহই কি ষোল আনা ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না? এ কথার অর্থ এরূপ নহে। কলিতে চারি আনা লোক ধার্ম্মিক থাকিবে, আর বার আনা লোক অধার্ম্মিক হইবে, এ কথার ইহাই অর্থ। চেষ্টা করিলেও যুগ-দোষে ষোল আনা ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না, অধর্ম্মে পদার্পণ করিতেই হইবে; একথা ভাবিয়া নিরাশ হইও না, হা হুতাশ করিও না, হাল ছাড়িয়া দিও না। কলির শেষ দিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ একটী ব্রাহ্মণ—বিষ্ণুযশাঃ—ষোল আনা

ধার্ম্মিক থাকিবে, ইহা কি জান না? আশা এবং বিশ্বাস ও নির্ভর লইয়া খাটিতে থাক, মার কোলে স্থান পাইবে। কলিতে ষোল আনা ধার্ম্মিক হইবার জন্য—মুক্তি পাইবার জন্য জগজ্জননী কত সহজ উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? শাক্ত হও, বৈষ্ণব হও, যে পথে ইচ্ছা চল, সেই পথেই জগজ্জননী মুক্তির বর লইয়া, আনন্দের ডালা সাজাইয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি পৃথিবীতে মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য হইতে পার, কিন্তু মার কাছে তুমি অতি যত্নের ধন, অতি আদরের ছেলে—তোমার জন্যই মা কলিযুগের সাধন এত সহজ করিয়াছেন। তোমার জন্যই তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি উপবাস থাকিতে পার না? খাইয়া পূজা কর। তুমি হবিষ্য করিতে পার না? মাছ মাংস খাইয়া মাকে ডাক। কলিতে নামে মুক্তি, জপে মুক্তি, দানে মুক্তি, দয়ায় মুক্তি, কর্ম্মে মুক্তি, সঙ্কল্পে মুক্তি,—মুক্তি যেন যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, আর কোন্ যুগে আর কোন্ রাজার অধিকারে, মুক্তির বাজার এত সস্তা ছিল—মুক্তি এত সহজ-লভ্য ছিল? ধন্য কলিরাজ! তোমার দয়া এবং ন্যায়পরতা যাহারা বুঝে না, তোমার অধিকারের সুখ যাহারা অনুভব করে না, তাহারাই তোমার নিন্দা করিয়া থাকে। তোমার অধিকারে খাটিয়া কেহ রিক্তহস্তে ফিরে না, একি তোমার সামান্য মহত্ত্ব? সত্যাদি যুগে বহু যত্ন করিয়া, বহু ধন ব্যয় করিয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিলে, তবে তাহার ফল ছিল, নতুবা নহে; কিন্তু তোমার অধিকারে অশ্বমেধের সঙ্কল্প করিয়া কেহ যদি উদ্যোগ আরম্ভ করে, আর শেষটা শক্তিতে কুলাইল না বলিয়া যদি তাহা ছাড়িয়া দেয়, তথাপি সে অশ্বমেধের ফলভাগী হইবে। ধন্য ব্যবস্থা, ধন্য উদারতা!—অথবা

এ মহত্ত্ব কলির নহে; কলিতে মুক্তির দুর্ভিক্ষ হইবে, এই আশঙ্কায় জগজ্জননী তাঁহার সন্তানদিগের জন্য এতই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন যে তাহাদের একেবারে চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ঘটিয়া গিয়াছে,—অন্য সুভিক্ষের যুগে যাহা হইতে পারে নাই, তাহাও হইয়া পড়িয়াছে। কলির জীব! তোমার পরিত্রাণ সহজ; কেবল যদি ভয়ে হাল ছাড়িয়া দেও, তবেই গেলে। "কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ," যে পথ ইচ্ছা ধর, যে নাম ইচ্ছা লও, যে মূর্ত্তি ইচ্ছা চিন্তা কর,—হয় স্বতন্ত্র মূর্ত্তি, না হয় অভেদরূপে সম্মিলিত যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার বোধ চরিতার্থ হইয়াছিল, সেই মূর্ত্তিই চিন্তা কর। সরল প্রাণে শরণাগত হইতে পারিলেই পরিত্রাণ পাইবে।"

পরদিন এইরূপ লিখিতেছেন :—

"ঈশ্বরের নানা মূর্ত্তি এবং নানা ভাবে সাধন হয়; সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাব কোন্‌টি? মাতৃভাব। সাধনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কোন্‌টি? মাতৃভাবে সাধন, কেননা সন্তানের কাছে মা অপেক্ষা উচ্চ আর কেহ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধন কোন্‌টি? মাতৃভাবে সাধন, কেন না মা যত সহজে তুষ্ট হন, আর কেহ তেমন সহজে তুষ্ট হয় না। সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভ সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ কোন্ সাধনে? মাতৃভাবের সাধনে, কেননা সন্তানকে অদেয় মার কিছুই নাই. মা হাজার কৃপণ হইলেও সন্তানের কাছে তাঁহার কৃপণতা থাকে না—সন্তান যে মার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী! মাতৃভাবের সাধন শ্রেষ্ঠ কেন, তাহা বুঝাইতে আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না। পিতা আমার, পত্নী আমার, পুত্র আমার, এ কথা সকলে কি সাহস এবং শপথ করে বলিতে পারে? কিন্তু মা আমার,

এ কথাতে সন্দেহ নাই, বিতর্ক নাই, আপত্তি নাই। সাধ্যকে সাধন করিয়া আগে আমার করিয়া লইতে হয়, কিন্তু মাকে আমার করিয়া লইতে আর সাধন লাগে না, তিনি নিত্য আমারই রহিয়াছেন। কোন কোন সাধন-প্রণালীতে নামে রুচি জন্মাইবার একটা উপদেশ আছে—প্রকৃত সাধনের পূর্ব্বে অনেক দিন খাটিয়া আগে ইষ্টদেবতার নামে রুচি জন্মাইয়া লইতে হয়, কিন্তু মার নামে চিররুচি—জন্মাবধি রুচি। শিশু জন্মিয়াই উঁয়া উঁয়া বলিয়া কাঁদে, তাহার পরে মা বলিয়া ডাকে, সর্ব্বশেষে সাধনে দীক্ষিত হইলে ওঁ বলিয়া সাধন করে,—মা ছাড়া কবে? যাহা স্বাভাবিক, জন্ম-মরণের সাথী তাহাতে আবার অরুচি কবে? অন্যভাবের সাধন যত্নদ্বারা অভ্যাস করিতে হয়—উপার্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু মাতৃভাবের সাধন উপার্জ্জন করিতে হয় না, ইহা জন্ম-লব্ধ—সন্তান সহজেই মাতৃভক্ত, মাতৃ-সেবক, মাতৃ-পূজক, মাতৃসাধক। যদি সহজে, অক্লেশে, নির্ভয়ে, নিরাপদে, নির্ব্বিঘ্নে এবং মধুরভাবে ইষ্টদেবতার কৃপালাভ করিতে চাও, তবে তাঁহার মাতৃভাবের উপাসক, মাতৃভাবের ভাবুক হও।”

তারপর শেষদিন এইরূপ লিখিতেছেন :—

“বলি না হইলে কি মার পূজা হয় না? হয় না; শক্তি-পূজায় বলিটা চাই, বলি না পাইলে মহাশক্তি প্রসন্ন হন না। বলি—স্বপ্রীতি-পরিণামাবধি। তোমার নিকট যাহা বড় প্রিয়, তাহা তুমি ইষ্টদেবতাকে দিতে ভালবাস—প্রিয়তমজনকে অপ্রিয় জিনিষ কে দিতে চায়—কে দিয়া সুখী হয়?

সুতরাং সাধকের শ্রেণী অনুসারে বলিও ত্রিবিধ, তামসিক, রাজসিক, এবং সাত্ত্বিক। পশু-বলি—মৎস্য মাংস প্রভৃতি—তামসিক বলি। দধি, দুধ, সন্দেশ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি রাজসিক বলি। কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা

প্রভৃতি সাত্ত্বিক বলি। যতদিন মৎস্য মাংস হইতে প্রিয়তর কোন দ্রব্য জগতে দেখিতে না পাও, যতদিন রসনার রস-স্মৃতি বশতঃ ছাগের ব্যাকুল চীৎকার এবং আসন্ন মরণের কাতর দৃষ্টি তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে না পারে, ততদিন পশুবলি দাও—মাকে না দিয়া প্রিয় দ্রব্য খাইও না। কিন্তু যখন বিতর্ক জন্মিবে, যখন জীবের প্রতি দয়ায় হৃদয় দ্রব হইবে, যখন মাংস অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোন দ্রব্য মাকে দিতে পারিবে, তখন পশুবলি ছাড়িতে পার। এই জন্যই স্বয়ং বলি দিবার বিধান। পাঁঠা পরে বাঁধে, পরে ধরে, পরে কাটে, তাহাতে তোমার হৃদয়ের কি আসে যায়? এই জন্যই অনেক বলিদাতা বলির সময়ে অন্দরে চলিয়া যায়—সে দৃশ্য সহিতে পারেন না বলিয়া। নিজে বাঁধ, ধর, কাট, তাহাতে যদি হৃদয় বিচলিত না হয়, তবেই তুমি পশু-বলিদানের অধিকারী। মনে করিও না, যে জগজ্জননী একটী রাক্ষসী, তিনি অন্যান্য উপাদেয় জিনিষ ছাড়িয়া মাছ মাংসই ভাল বাসেন; অথবা মনে করিও না যে জীবের প্রতি তোমার অপেক্ষা তাঁহার দয়া কিছু কম। তুমি এবং পাঁঠা উভয়েই তাঁহার সন্তান—তাঁহার তুল্য স্নেহ-দয়ার পাত্র। প্রভেদ এই, তোমার ভক্তি এবং শক্তি আছে বলিয়া তুমি পাঁঠাকে কাটিতেছ; পাঁঠার ভক্তি আছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহার শক্তি নাই বলিয়া সে তোমাকে কাটিতে পারে না। মা মাছ মাংস খান তোমার জন্য—তোমার মত তামসিক ভক্ত তরাইবার জন্য। অবশ্য মা বিশ্বময় জীব-জন্তুকে প্রসব করিতেছেন, পালন করিতেছেন, এবং গ্রাসও করিতেছেন; কিন্তু তুমি যে ভাবে গ্রাস করাইতেছ, সে ভাবে নহে—তাঁহার গ্রাস করিবার রীতি স্বতন্ত্র প্রকারের। অনেকে পৈতৃক প্রথা বলিয়া পশুবলি ছাড়িতে পারেন না; কিন্তু সাধনে প্রথা নহে, যোগত্যা বিবেচ্য। যে অদ্য পশুবলি দিতেছে

যোগ্য হইলে কন্যা তাহা ছাড়িবার অধিকার যখন তাহার আছে, তখন পিতার প্রথায় পুত্র কেন বাঁধা রহিবে? পুত্র সাংসারিক সম্পদেই পিতার উত্তরাধিকারী; কিন্তু মুক্তির পথে সকলে স্বতন্ত্র।

যখন কোন মিষ্ট বস্তুর জন্য রসনা লালায়িত থাকিবে না, হৃদয় উদ্বিগ্ন থাকিবে না, ভোজনটা ভাল হইল না বলিয়া মনটা অসন্তুষ্ট থাকিবে না, কিন্তু যথালব্ধ ভোজনেই পরিতোষ হইবে, তখনই রাজসিক বলির হ্রাস এবং সাত্ত্বিক বলির আরম্ভ হইবে। সাত্ত্বিক ভাব আসিলে তবে সাত্ত্বিক বলি দিতে হইবে, এমন নহে; সাত্ত্বিক বলি দিতে দিতে তবে সাত্ত্বিক ভাব আসিবে। সাত্ত্বিক বলির মধ্যে স্বার্থপরতা সর্ব্বপ্রধান; সংসারে এমন প্রীতিকর, এমন মধুরাসঙ্গ বস্তু আর নাই,—সংসারের পনর আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া দুই ক্রান্তি লোক ইহাতেই বাঁধা রহিয়াছে, ইহাতেই মজিয়া রহিয়াছে। ইহাকে যেদিন বলি দিতে পারিবে, সেই দিন বুঝিবে তোমার সাত্ত্বিক অধিকার পূর্ণ হইয়াছে, তোমার নিষ্কাম হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বলিদানে অধিকার ভেদ আছে, কিন্তু প্রসাদ-গ্রহণে এ ভেদ নাই, প্রসাদ-গ্রহণে সকলের সমান অধিকার। বলিদানের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর নাম গুণ ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মা তাহা গ্রহণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার নাম এবং গুণ বিলুপ্ত হইল, সে এক স্বর্গীয় স্বতন্ত্র বস্তু—প্রসাদ—হইল। তাহার উজ্জ্বল সাক্ষী ভবানীপুর; এখানকার মহাপ্রসাদে ঘোর বৈষ্ণবেও আপত্তি করেন না। কিন্তু সাবধান, প্রসাদ যেন প্রমাদ না হয়, কোনরূপ দ্বৈধভাব উপস্থিত হইয়া যেন বিপদ না ঘটায়।

ভারত কর্ম্মভূমি, শক্তি-ভূমি, শাক্ত-ভূমি, সাত্ত্বিক ভূমি; কিন্তু ভা.ত হইতে সাত্ত্বিক শক্তি পূজা—সাত্ত্বিক বলিদান উঠিয়া গিয়াছে, আছে কেবল পশুবলি—জীবহত্যা; তাই মহাশক্তি ভারতের প্রতি সুপ্রসন্ন হইতে পারিতেছেন না। কে আছ দেখি মায়ের সুসন্তান, অগ্রসর হও, সাত্ত্বিক বলিদানে মহাশক্তিকে সুপ্রসন্ন করিয়া মাতৃভূমির—জীবজগতের দু.খ দূর কর. নিজে ধন্য হও!"

প্রথম দিনে নিম্নলিখিত দুইটি গান লেখা আছে,—

(১)

"কে যাবে ভবানীপুরে রে, কে যাবে ভবানীপুরে।
(তথায়) অভেদরূপিণী, আছেন কাত্যায়নী,
ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে।
(জীবের দুঃখ জ্বালা দূর করিবারে)
(তথায়) আপনি অপর্ণা হয়ে অধিষ্ঠান,
পালিছেন প্রসাদে অশেষ সন্তান;
(তথায়) পশেনা কৃতান্ত করিতে প্রাণান্ত,
জীবনান্তে সবে লভে ভবানীরে।
(তথায়) ব্রহ্মরূপে মার যে করে ভাবনা,
সাধনে তাহার সঙ্কট ঘটে না,
(তার) বিঘ্ন বিনাশিতে, দাঁড়ান পশ্চাতে,
আপনি বামন (ভৈরব) ত্রিশূল ধরি করে।

(২)

বারেক দাঁড়ারে ফিরে।
কলির প্রলোভনে ধাইতেছ কেনে,
ভুজঙ্গিনী যেমন বেদের বাঁশীর স্বরে।
নিরখি সন্তানে পাপেতে পাগল,
আপনি শঙ্করী হয়েছেন চঞ্চল;
আয় আয় বলে, অভয় বাহু তুলে,
ঐ শুন অভয়া ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
দিতেছেন বরদা আর এক হাতে বর,
চতুর্ব্বর্গ সহ যে বাসনা তোর,
ইচ্ছা যদি হয়, চেয়ে নেরে নর,
যে পদ করেছে কৃতার্থ শঙ্করে।
দেখরে মায়ের যুগ্ম পয়োধর,
মৃত্যুময় ভবে অমৃত সাগর;
বিধিবিষ্ণু হর যার পানে অমর,
দেন মা সে অমৃত সাধক ভক্তেরে।
(সন্তানেরে)
মায়ের কোলে গেলে নাইরে শমন-ভয়,
কাল কলি উভয় মানে পরাজয়,
মহাশক্তি মায়ের এই যে পরিচয়,
প্রকটিত খড়্গ মুণ্ড দুই করে।"

সপ্তম দিনে নিম্নলিখিত দুইটি গান লেখা আছে ঃ—

(১)

"যাব না সংসারে ফিরে মা,
আর যাব না সংসারে ফিরে।
এসেছি চরণে স'পিতে জীবন ;
কি কায সংসারে, কি কায এ শরীরে।

এবার কেটেছি সংসারে সকল বন্ধন,
একদিক হয়ে লয়েছি শরণ ;
হয় মোক্ষপদ পাব, নইলে প্রাণ দিব,
করিব কলঙ্কী শঙ্করী শঙ্করে।

জন্মাবধি ভবে কেঁদেছি অপার,
ভেবেছি এবার কাঁদিব না আর ;
যদি আমারে তারিতে—হয় মা তব ভার,
হব খাস প্রজা যমের অধিকারে।

রাজা রামকৃষ্ণ ভুলি রাজ্য-ভার,
এই পঞ্চমুণ্ডী করেছিল সার ;
যদি পদ-লাভ তরে, রাজা রাজ্য ছাড়ে,
দরিদ্র দারিদ্র্য ছাড়িতে কি নারে

(ছাড়িলে কি মরে) ?

(২)

কবে গো সে দিন হবে মা,

আমার কবে গো সে দিন হবে।

কবে মা আমার প্রাণের অন্ধকার,

সুধাময় তব হাস্যেতে মিলাবে।

দেখি দেখি এই দেখিনা চরণ,

কি জানি মা মাঝে কিসের আবরণ ;

আমার কবে সে দিন হবে, এ আবরণ যাবে,

মায়ের সঙ্গে ছেলের দেখাদেখি হবে।

লুকালুকি আর কাণাকাণি কথা,

বাড়ায় শুধু আশা, দূর করেনা ব্যথা ;

(মাগো) রাখিয়া আমাকে এমনি ফাঁকে ফাঁকে,

আশার উপর আশায় আর কত ঘুরাবে!

একা ভেবে আমার হয় মা মনে ভয়,

নিশার আঁধারে কাঁপে গো হৃদয় ;

আমার আঁধারে কবে গো আনন্দ ফুটিবে,

নিশার আশায় দিবস কাটিবে ?”

অষ্টম দিনে নিম্নলিখিত গানটি লেখা আছে :—

‘লীলা কি বুঝিতে পারি মা,

তোর লীলা কি বুঝিতে পারি।

হয়ে ব্রহ্মাণ্ড-জননী নিজে জন্ম লও,
কখন দেখি পুরুষ কখন দেখি নারী।

গুণাতীত হ'য়ে বসাও গুণের মেলা,
নিষ্কাম না হয়ে দেখাও কামের খেলা ;
(তোমার) তিন গুণে তিন ছেলে বিধি বিষ্ণু ভোলা,
(বল) অনন্তগুণ কোথায় রাখ গো শঙ্করি।

ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া পাইনা মা তোমায়,
বেদে না পায় ভেদ, পুরাণ হেরে যায়,
(আবার) ধরার ঘরে ঘরে, বেড়াও অকাতরে,
জীবের ঘটে ঘটে নানা মূর্ত্তি ধরি।

কখন দেখি তোমায় শ্মশান-বাসিনী,
নাই গৃহ, নাই ভূষণ, নাই মা বসন খানি ;
(আবার) কখন দেখি তোমায় রাজরাজেশ্বরী,
(আছে) হিমাদ্রি ভাণ্ডার, কুবের ভাণ্ডারী।"

দশম দিনে এই গানটি লেখা আছে :—

"আমি চাই না হিঁয়ালে কথা,
মা, আমি চাই না হিঁয়ালে কথা।
বলবে যদি কিছু, আমার ভাষায় বল,
বঞ্চনা করিলে খাও বাপের মাথা।

ছেলের কাণে মিঠা মার কথা যেমন,
আর কি ভবে কিছু আছে গো তেমন ;

(মাগো) এমন মধুর মাঝে, হিঁয়াল কিগো সাজে,
অমন করে আর দিস না প্রাণে ব্যথা।

ঠারে ঠুরে বলা নয়ত ধারা মার,
ভাল করে বল মা কথাটি আবার;
বারেক তোর কথাটি শুনি, জুড়াই গো জননী
রাখি তারে প্রাণে চিরতরে গাঁথা।"

ঊনবিংশ দিনে নিম্নলিখিত গানটি লেখা আছে :—

"পড়েছ অবোধের হাতে, (মা এবার)
জানি না ভজন, জানিনা সাধন,
তথাপি চরণ হবে আমায় দিতে।
তন্ত্র মন্ত্র লাগে যে পথে চলিলে,
সে পথে সকল মহাজন চলে;
আমি জানা পথ ছাড়ি, ধরিয়াছি পাড়ি,
ভাঙ্গা ডিঙ্গী আমার হবে পারে নিতে।

না জানি আসন, ধ্যান, প্রাণায়াম,
শিখেছি কেবল মা তোমার নাম;
তোমার নাম করে সার যুড়েছি বেপার,
এ বাণিজ্যে আমায় হবে লাভ দিতে।

আমায় আনিলে ডাকিয়া প্রাণে আশা দিয়া,
রহিলে নীরব তবে কি লাগিয়া;
আমায় কবে দেখা দিবে খুলে বল শিবে,
বুঝি না মা তোমার আকারে ইঙ্গিতে।"

বিংশতি দিবসে নিম্নলিখিত গানটি লেখা আছে :—

"ফিরিতে মানে না মনে (মা আর)।
ছাড়ি ও চরণ শান্তি-নিকেতন,
সংসারে আবার প্রবেশি কেমনে।
কর্ম্ম কর্ম্ম করি জন্ম হল শেষ,
পড়িতেছে দন্ত পাকিতেছে কেশ ;
হইল না তবু কর্ম্মভোগ শেষ,
আর কত ক্লেশ দিবে গো এ দীনে।
রোগ, শোক, ভয়, দরিদ্রতা, পাপ,
সংসারে এ সবে প্রবল প্রতাপ ;
এ দুর্ব্বল সুতে সে রাক্ষসের হাতে,
ফিরায়ে আবার দিবে কোন প্রাণে।
কর্ম্ম-যোগ সাধিতে শক্তিসিদ্ধি চাই,
জান ত মা আমার সে সব কিছু নাই ;
(এখন) বল্ মা কি লইয়া আবার দাঁড়াই গিয়া,
শতবার ভঙ্গ দিয়াছি যে রণে।
তবেই গো মা ফিরে আবার যেতে পারি,
যদি এই কৃপা কর গো শঙ্করি ;
(আমার) জয় পরাজয় তুল্য যেন হয়,
ডাকিলেই তোমায় হেরি যেন প্রাণে।"

ভবানীপুর ৺মার বাড়ীতে ৺মহারাজা রামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীতে বসিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের পুরশ্চরণ উপলক্ষ্যে ২০ দিনের মধ্যে প্রত্যহই নিজের দৈনন্দিন ভাবের কথা এবং দর্শনাদির কথা কিছু কিছু লেখা আছে। তৎসমস্ত এখানে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না।

অষ্টম অধ্যায়।

আমি যখন কার্য্যোপলক্ষ্যে ইংরাজী ১৯০৮।৯ সালে কালনা মহকুমায় থাকি, তখন ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সহিত আলাপের সুযোগ হয়, আদালত বন্ধের সময়ে ৺কাশীধামে আসিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করি। আমি তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, এবং ক্রমশঃ দেখা সাক্ষাৎ করিতে থাকিলে তিনি আমাকে স্নেহচক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব, পূজা এবং জগদম্বার উপর নির্ভরতা দেখিয়া, তাঁহাকে ভক্তি চক্ষেই দেখিতে লাগিলাম। ভক্তের মুখনিঃসৃত ভক্তিকথা বড়ই মধুর লাগিত। একদা তাঁহার সহিত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে ৺তুলসীদাসের গুরুলাভ এবং সাধনার কথা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়া ছিলাম। ৺কাশীধাম হইতে অবকাশশেষে চলিয়া যাইবার সময় বিদ্যার্ণব মহাশয়ের প্রতি আমার মন পূর্ণভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। তখন আমার মনে এরূপ ইচ্ছা হইল যে তাঁহারই নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হই।

অল্পদিন পরেই আমি কালনা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার সদর কুমিল্লায় কার্য্যোপলক্ষ্যে বদলি হইয়া যাই। সেখান হইতে বিদ্যার্ণব মহাশয়কে পত্র লিখিয়া স্থির করি, যে তাঁহার নিকটেই উপদেশ লইব। তিনিও তাহাতে সম্মত হন; কেবল সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময়ে আমার এক পূর্ব্ববন্ধু কালিদাস সন্ন্যাসী (ভুলুয়া বাবা) কুমিল্লায় আমার বাসায় উপস্থিত হন। কথায় কথায় তাঁহার নিকট

প্রকাশ করি যে আমি বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নিকট উপদেশ লওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছি। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন 'আপনি কি বামাচারীর পথে চলিতে পারিবেন, বিদ্যার্ণব মহাশয় যে বামাচারী' আমি বলিলাম, আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি আমি ওপথে যাইতে পারিব না; এখন উপায় কি ? তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ চাহিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি ইহার বন্দোবস্ত করিতেছি, বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ আলাপ আছে, আপনি তাঁহার সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন আমি তাহা কোনরূপে কাটাইয়া দিতেছি' আমি বলিলাম 'কেবল তাহা করিলেই হইবে না, আমাকে উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করিয়া দিতে হইবে'। তিনি বলিলেন "হাঁ তাহাই করিব, আমার হাতে খুব ভাল লোক আছে, দেখিলে আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন।" আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম; ভুলুয়া বাবা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই করিলেন, তিনি চিঠি লিখিয়া ঋষিকল্প শরচ্চন্দ্রকে কুমিল্লায় আমার বাসায় উপস্থিত করিয়া দিলেন। তাহাকে নিকটে পাইয়া ও তাঁহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, মায়ের কোলের শিশুর ন্যায় বালক-স্বভাব-প্রাপ্ত নিরহঙ্কার, সদাহাস্য বদন, সেই মহাপুরুষকে পাইয়া প্রাণ খুলিয়া গেল। আমি তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার সহধর্ম্মিণীও তাহাই করিলেন। গুরুদেব বলিলেন, "আমি ৺মাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাজ করি না, ৺মাকে জিজ্ঞাসা করিব, অনুমতি পাইলে আপনাকে জানাইব।" গুরুদেব বাটী গমন করিবার পূর্ব্বে একদিন আমার বাসায় কীর্ত্তন হইতেছিল। একটী ভক্তকর্তৃক ৺মার নাম গান করিবার সময় দেখিলাম, গুরুদেবের নয়ন হইতে অশ্রুবারি নিপতিত হইয়া গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে এবং তিনি স্থির নিশ্চলভাবে

বসিয়া আছেন,—পাছে লোকে তাঁহার ভাব বুঝিতে পারে, সেইজন্য অলক্ষিতে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

গুরুদেব বাটী যাইবার কিছুদিন পরেই পত্রদ্বারা জানাইলেন, যে তিনি ৺মার অনুমতি পাইয়াছেন, আমাদের উপদেশ দিবেন, তবে সময় স্থির করিয়া পরে পত্র লিখিবেন। মন আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পরে পত্র লিখিয়া দিন স্থির করিয়া আমাদের জানাইলেন, এবং সময় মত স্বয়ং কুমিল্লায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধার্য্য সময়ে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া আপনাদের ধন্য জ্ঞান করিলাম। তৎপরে কয়েকদিন আমাদের নিকট থাকিয়া গুরুদেব অন্যত্র গমন করিলেন। প্রথম পত্রেই এই শ্লোকটী লিখিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেনঃ—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাত স্তদস্তু তব পূজনং॥

ভাবটী বড়ই মধুর, কিন্তু ঐরূপ কাজ করা বড়ই কঠিন। আর এক পত্রে খাদ্যসম্বন্ধে লিখিলেন, যে ৺ জগজ্জননী মা তাঁর সকল পুত্রের জন্য নানারূপ খাদ্য সংসারে ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু সকল খাদ্যই সকলের উপভোগ্য নহে। যেরূপ খাদ্য যাহার উপযোগী, সেইরূপ খাদ্যই তাহার গ্রহণ করা উচিত; যে উদর পীড়ায় ভুগিতেছে সে তাহার অনুকূল খাদ্যই গ্রহণ করিবে, যে যেরূপ সহ্য করিতে পারিবে সে সেইরূপই গ্রহণ করিবে, অন্যরূপ আহার করা তাহার পক্ষে পাপ; এবং অপরাধীকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আহারের পরিমাণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। যতটুকু

শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক ততটুকুই আহার করা কর্ত্তব্য, অধিক আহার করিলে রসনার পাপ হয়, এবং লোভপ্রযুক্ত এরূপ আহারের জন্য পীড়ারূপ ফলভোগ করিতে হয়। কি সুন্দর ভাব!

গুরুদেব একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, মাতৃসাধক মাতার কোলের শিশুর ন্যায় হইতে পারিলেই তাহার সাধনা সফল হইল; এবং কথায় কথায় আমায় জানাইয়া দিলেন, যে তিনি বীরাচারীর পথে না গিয়াও দিব্যাচারে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তিনি গুপ্তভাবে থাকিতেন, যাহাতে আত্মপ্রকাশ না হয় সেই ভাবে চলিতেন। আমরা এরূপ গুরু পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলাম; কিন্তু তখনও তাঁহাকে ঠিক চিনিতে পারি নাই, তিনি যে সাধনার কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই। তিনি একেবারেই ধরা দেন নাই, ক্রমশঃ ধরা পড়িয়াছিলেন। গুরু যে কি জিনিষ তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

গুরুদেব অনেক সময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন; অত ঘুরিয়া বেড়াইলে শারীরিক কষ্ট পাইতে হইবে বলিলে লিখিতেন "৺মা সকল সময়ই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তাঁহার কোনও কষ্ট হয় না"।

তিনি এক সময় গৌহাটীতে এক সাহিত্যসভায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া ৺কামাখ্যাতীর্থে এক পাণ্ডার বাসায় ছিলেন। সেই সময়ে একজন পশ্চিমদেশীয় লোকও সেই বাটীতে ছিলেন। তিনি পাণ্ডার পুত্রের সহিত নানারূপ শাস্ত্র আলোচনা করিতেন এবং তান্ত্রিক গুরু অন্বেষণে নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, কিন্তু কোথাও গুরুর মত গুরু পান নাই। গুরুদেবের সহিত পরিচয় হইলে, তাঁহাকেও গুরু অন্বেষণের কথা বলেন। তাহাতে গুরুদেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তান্ত্রিক

সাধকদের কথা বলিলে, সেই পশ্চিমদেশবাসী লোক কাহার কাহার নিকট গিয়াছিলেন তাহাও গল্প করেন এবং বলেন তিনি কোথাও সন্তুষ্ট হন নাই। আলাপ করিতে করিতে গুরুদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই ভদ্রলোক গুরুদেবকেই মন্ত্র দিবার জন্য অনুরোধ করেন। গুরুদেব ৺মার অনুমতির অপেক্ষা করেন এবং একটী মন্ত্রে নিজের শিখা বন্ধন করিয়া রাত্রে শয়ন করেন এবং সেই ভদ্রলোকটীকেও ঐ মন্ত্রে শিখা বন্ধন করিয়া শয়ন করিতে বলেন। সেই রাত্রে গুরুদেব স্বপ্নে এক নূতন শক্তিমন্ত্র এবং তাহার অর্থ লাভ করেন, এবং দেখেন ঐ মন্ত্রে সেই ভদ্রলোকটীকে দীক্ষিত করিতেছেন। ঐ ভদ্রলোকটীও রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে গুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষিত করিতেছেন। পরদিনই প্রাতে তিনি মন্দিরে গুরুদেবের নিকট ঐ মন্ত্রেই দীক্ষিত হন। পরে যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন গুরুদেবের নিকট ঐ বৃত্তান্ত শুনি। সেই পশ্চিমদেশীয় লোকটীর কি সৌভাগ্য! আমি অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার নাম বা ঠিকানা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

কুমিল্লায় আমার বাসায় একটী পশ্চিমদেশীয় পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, এবং সে আমার নিকটে অনেক দিন কার্য্য করিতেছিল। সে গুরুদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বিশেষভাবে তাঁহার সেবা করিত এবং দীক্ষালাভেরও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার সৌভাগ্যক্রমে সে গুরুদেবের সহিত ৺শ্রীশ্রীত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর দর্শনে গিয়া সেইখানে গুরুদেবের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিল।

কুমিল্লা হইতে চাকুরি উপলক্ষ্যে স্থান পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরুদেব যখন আর একবার আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার নিকট প্রকাশ করি, যে তিনটী বিষয়ে আমার মন বড়ই চিন্তিত। তাহাতে তিনি

হাসিয়া বলিলেন, 'বলুন আপনি কি কি চান?' আমি বলিলাম "আমার স্থান পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে, এবং আমার মধ্যম কন্যার বিবাহেরও সময় হইয়াছে, এক মাস ছুটী লইয়াও কিছু স্থির করিতে পারি নাই; এবং আমার স্ত্রী কলিকাতায় একটি বাটী কিনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। কন্যার বিবাহের জন্য কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে আমার থাকা আবশ্যক।" গুরুদেব উত্তর করিলেন, "এর আর কি, ৺মার কাছে জানাইব।" তিনি পূজাদি করিয়া নির্ম্মাল্য দিলেন এবং বলিলেন ৺মা ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি প্রথমে সংবাদ পাইলাম, উত্তরবঙ্গে বদলি হইয়াছি। ঐরূপ হইলে আমার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হইত। পরে জানিলাম ঐ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমায় বদলি হইয়াছি। ঐ স্থান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বলিতে হইবে এবং ঐখানে খাদ্যাদি দ্রব্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ ছিল। কুমিল্লার পরে ঐরূপ স্থান পাওয়া সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। এক বিষয়ে সুবিধা হইল; এবং তমলুক যাওয়ার একমাসের মধ্যেই কলিকাতায় বাটী ক্রয় সম্বন্ধে অসম্ভব সম্ভব হইল। তিন বৎসর ধরিয়া বাটীক্রয়ের সুবিধা করিতে পারিতেছিলাম না, এবং তজ্জন্য আবশ্যকীয় অর্থও সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলাম না। হঠাৎ কলিকাতা হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলাম, "বাটী ক্রয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক, চলিয়া আইস।" আমি ত বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সেই দিনই টেলিগ্রাম করিয়া এক দিনের মাত্র ছুটি লইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। গিয়া দেখিলাম বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই, কেবল মাত্র ক্রয়োপযোগী বাটী এবং তাহার মূল্য স্থির হইয়াছে। গুরুদেব শরীরে কি বল দিলেন বলিতে পারি না, সেই দিনেই দুইটী দলিলের মুসাবিদা করাইয়া, ভাল উকিল দ্বারা সংশোধন করাই-

লাম ; আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ষ্ট্যাম্পে দলিল লিখাইলাম ; টাকা আদান প্রদান করাইয়া দলিল সম্পাদন কার্য্য শেষ করাইলাম ; এবং সেই রাত্রেই তমলুক রওনা হইলাম। এতগুলি গুরুতর কার্য্য এক দিনের মধ্যে হঠাৎ সমাপন করা সাধারণতঃ সম্পূর্ণ অসম্ভব। গুরুদেবের কৃপায় সমস্তই সম্ভব হইল। আমার জীবনে এরূপ ঘটনা আর কুত্রাপি দেখি নাই বা শুনি নাই। এই ঘটনার অল্প পরেই আমার মধ্যমা কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া গেল, এবং তমলুকে থাকাতে এ ব্যাপারেরও নানারূপ সুবিধা হইয়াছিল। তিনটি ঘটনাই আশ্চর্য্যজনক।

শ্রীহট্ট হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসায় গুরুদেবের দর্শন পাইতে অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল, ইচ্ছা হইল, যদি কোনরূপে কার্য্য উপলক্ষ্যে শ্রীহট্টে বদলি হইতে পারি, তাহা হইলে মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শন পাইতে পারিব। তমলুক থাকা সময়ে একবার মাত্র দুই এক দিনের জন্য গুরুদেব আমাদের কাছে আসিতে পারিয়াছিলেন! সেই সময় তাঁহার কাছে বলিলাম, 'ইচ্ছা হয় শ্রীহট্টে বদলি হই'। তিনি হাসিয়া বলিলেন তাহা হইলে ত খুব ভালই হয়। ইতিপূর্ব্বে নিজের বা বাটীর কাহারও পীড়ার সংবাদ গুরুদেবকে বড় লিখিতাম না। এবার দর্শনের সময় তিনি বলিয়া গেলেন, ভাল মন্দ সকল সংবাদই তাঁহাকে লিখিতে পারি। তাহার পর হইতে সকল সংবাদই তাঁহাকে দিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কোন পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে লিখিবার অল্প সময়ের মধ্যেই উপকার পাইতে লাগিলাম।

তমলুক থাকা কালে আমার বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও পাইয়াছিলাম। তাহা হইতে ১০০৲ টাকা গুরুদেবের নিকট তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দেই। উত্তরে তিনি অন্যান্য কথার সঙ্গে

লিখেন, "কিন্তু এটা জানিবেন যে টাকা দ্বারা আমাকে বশ করিতে পারিবেন না।" অর্থে তাঁহার স্পৃহা ছিল না, পাঠকবর্গ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। ক্রমশঃ গুরুদেবের দিকে বেশী আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম; কিন্তু শ্রীহট্ট বদলি হওয়ার তখনও কোন উপায় করিতে পারিলাম না।

৩ বৎসর পরে খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমায় বদলি হইলাম। সেখানে গিয়া পরিবারস্থ সকলেই এত অসুস্থ হইতে লাগিল, যে দেড় মাস থাকার পরেই ২ মাসের ছুটী লইয়া, সেখানে আর যাইব না স্থির করিলাম, এবং সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া আসিলাম। বড়দিনের ছুটীতে চলিয়া আসি এবং জানুয়ারী মাসের প্রথমে শ্রীহট্ট বদলি হওয়ার হুকুম হইয়া গেল। বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিলেটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে বড় আনন্দ হইল, প্রায়ই গুরুদেবের দর্শন পাইব। কাজেও তাহাই হইল। গুরুদেবের বাটী সিলেট সহর হইতে ২০ মাইল দূরে। তিনি অক্লেশে এতদূর রাস্তা পদব্রজে যাতায়াত করিতেন, তাহাতে আমার বড় কষ্ট হইত, কারণ আমার নিজের পক্ষে অতটা পদব্রজে যাওয়া আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। সেইজন্য কখন কখন ভাড়াটীয়া গাড়ী কিছু দূর পাঠাইয়া দিতাম, যতটুকু তাঁহার কষ্টের লাঘব হয় ততটুকু চেষ্টা করিতাম।

শ্রীহট্টে আসিয়া দেখিলাম, সকল বিশিষ্ট ভদ্রলোকেই গুরুদেবকে বিশেষ ভক্তি ও মান্য করেন এবং যখন যেখানেই দেখা হউক, কেহই তাঁহার পদধূলি লইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। গুরুদেবের নিকটে আসিতে পারিয়া এবং প্রায়ই তাঁহার দর্শনের সুযোগ পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম; আমাদের প্রতি গুরুদেবের স্নেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরবিবাদের কথা

যাহা সকলের মুখে প্রায়ই শুনা যায়, তাহা গুরুদেব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য ; গুরুদেবের প্রতি সরস্বতী দেবীর বিশেষ কৃপাই ছিল, কিন্তু লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। দেশে যা কিছু জমি ছিল, তাহা হইতে বৎসরের আবশ্যকীয় চাউলের অভাব কমই হইত ; কিন্তু প্রতি বৎসর পূর্ণ ফসল হয় না, তাহাতে বৎসরের চাউলও সময় সময় কম পড়িত। এতভিন্ন আয়ের অন্য কোন উপায় ছিল না। চাষবাসের খরচ ও নিত্য নৈমিত্তিক খরচের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই ঋণ করিতে হইত। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে কতকটা জঙ্গলের বন্দোবস্ত লওয়া ছিল। তাহা হইতে কোন আয়ের সুবিধা হইত না, অথচ রাজস্ব দিবারও কোন উপায় ছিল না।

শিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থাকায় গুরুদেব নিজগ্রামে পুঁটিয়ার মহারাণী মাতা শরৎ সুন্দরীর নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ছোট ছোট বালিকাদের শিক্ষার জন্য নিজ বাটীতে একটি পাঠশালাও স্থাপন করেন। মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে উপযুক্ত লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত নিজেই ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য মাসিক কিছু পাইতেন ; তাহাতেও সংসার খরচের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুলান হইত না। সাংসারিক কষ্টসত্ত্বেও কাহারও নিকট কোনরূপ অর্থের অভাব জানাইতেন না বা কোনরূপ অর্থ প্রার্থনা করিতেন না। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে ঋণ করিতে বাধ্য হইতেন। আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন, কিন্তু কখনও অর্থাভাব জানাইতেন না। শিষ্যদের কাহারও নিকট কখনও অর্থ চাহিতে শুনি নাই। এইরূপ মানসিক অবস্থার কারণ ৺মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। তিনি জানিতেন ৺মায়ের ইচ্ছা হইলে ৺মাই কোন উপায় করিয়া দিবেন।

গুরুদেবের অর্থের স্পৃহা একেবারেই ছিল না। তিনি যখন যে কার্য্য

করিতেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই করিতেন, সকলেই ইহা জানিত শিষ্যদের নিকট হইতেও অর্থ লইতে কুণ্ঠিত হইতেন।

শ্রীহট্টে থাকাকালে শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ চট্টোপাধ্যায় (এখন রায় বাহাদুর) সেখানকার অতিরিক্ত জজ্ স্বরূপ গিয়াছিলেন। কথায় কথায় জানিলাম, তাঁহার গুরুবংশে কেহ নাই এবং কোন নিঃস্বার্থ সৎ লোক পাইলে তিনি তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে পারেন। গুরুদেবের কথা স্মরণ করিয়া আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি ঐরূপ লোকই আপনার নিকট আনিয়া দিতে পারি।" তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন। পত্রদ্বারা গুরুদেবকে আনাইয়া তারাপদবাবুর নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া দিলাম। তারাপদ বাবু বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিবেন স্থির করিলেন; এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সস্ত্রীক গুরুদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্রমশঃ তারাপদবাবুর দুই পুত্র সস্ত্রীক, এক কন্যা ও জামাতা গুরুদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীহট্টে থাকিবার সময় গুরুদেবের অনেক যোগবিভূতি দর্শন করিবার অবকাশ হইয়াছিল। একবার আমার স্ত্রীর জ্বর হইয়াছিল এবং জ্বর সময় সময়ে এতই প্রবল হইত যে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য স্থগিত হইবার উপক্রম হইত। তখন গুরুদেব স্বাধীন ত্রিপুরার ভিতরে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমার চিঠিপত্র নিয়মমত পৌছিতে পারে নাই। এক দিন সন্ধ্যার সময় আমার স্ত্রীর পীড়া বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তিনি প্রকাশ করেন যে, যে সকল আত্মীয় স্বজন দূরে ছিল তাহাদিগকে সংবাদ দিলে ভাল হয়। সাধ্যমত চিকিৎসক আনাইয়া দেখাইলাম। তিনি রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বিশেষ কষ্ট পাইয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে পীড়া ক্রমশঃ কমিয়া গেল। সেই দিনই

ডাকযোগে গুরুদেবের পত্র পাইলাম, তিনি লিখিয়াছেন, কোন ভয় নাই; পূর্ব্বরাত্রির ১২টার পর হইতে কি রকম থাকেন জানাইতে লিখিয়াছিলেন। ঠিক্ সেই সময় হইতেই রোগ কমিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

আমার নিজের একবার জ্বর হইয়াছিল। একদিন অন্তর জ্বর হইত, কিন্তু জ্বরের তেজ অতিশয় বেশী হইত। একদিন জ্বর ত্যাগের সময় জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। গুরুদেবের বাটীতে লোক পাঠাইয়া খবর দেওয়া হইল; তিনি সেই দিনই সন্ধ্যার পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে জ্বর আসিবার সময় ছিল; কিন্তু গুরুদেব অল্পক্ষণ আমার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া রহিলেন এবং একটী স্তব পাঠ করিলেন। তার পর আর জ্বর আসিল না।

আর একবার একটী বিশেষ ঘটনা হয়, তাহাও এ স্থানে উল্লেখ করিতেছি। একটু অধিক স্থূলাকার হওয়ার জন্য কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার আমাকে বলিয়াছিলেন যে আপনার "Fatty-heart" হইতে পারে। এক সময়ে ঐরূপ ভয়ের কারণ হইয়াছিল, প্রায়ই বুক ধড়ফড় করিত এবং মনে হইত কোন সময় হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। একজন লোক সঙ্গে না লইয়া বাটীর বাহির হইতে ভয় করিত। ভয়ের কথা গুরুদেবকে জানাইলাম। তিনি ত ৺মা ছাড়া কিছুই জানেন না; বলিলেন ৺মাকে জানাইব। গুরুদেব আমার জন্য ৺মার পূজা করিলেন এবং পত্র লিখিয়া জানাইলেন, যে আমার প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই; তিনি পূজার সময় দেখিলেন যেন ৺মা হাসিতেছেন; এবং আরও লিখিলেন যে আপনার হৃদ্‌যন্ত্রের কোন পীড়া নাই, হজমের দোষের জন্য পেটে বায়ুর সঞ্চার হইয়া এরূপ হয়, তাহা চিকিৎসা করিলেই আরাম হইবে। ঐ চিঠি পাইবার পূর্ব্বেই আমি

একজন ভাল চিকিৎসককে দিয়া পরীক্ষা করাইলে তিনিও ঠিক্ ঐরূপ বলিলেন। দুইটা মিলিয়া যাওয়াতে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; এবং সেই রকম চিকিৎসা করাইয়া উপকার পাইলাম।

এক সময়ে গুরুদেব আমার বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার দেশের একজন লোক মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে সদরে আসিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় বসন্ত পীড়ার খুব প্রকোপ চলিতেছিল এবং ঐ লোকটী জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। গুরুদেব তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং ঘণ্টা চারি পরে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে তাঁহার জ্বর ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে ভাত খাওয়াইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীহট্টে গুরুদেবের অনেক বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে একটী পেন্‌সন প্রাপ্ত Extra Asst. Commissioner (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) সহরের নিকটেই বাস করিতেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাসায় আসিয়াছিলেন এবং গুরুদেব থাকিতেও একবার আসিয়াছিলেন। একদিন গুরুদেবের সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকটীর বাড়ী যাই এবং সেইখানে ঐ ভদ্রলোকটী personal God সম্বন্ধে গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি নিজে একজন ব্রাহ্ম ভক্ত ছিলেন এবং সাধুচরিত্র ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত আলোচনা কালে গুরুদেব যেরূপ সহজে বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল আর ২।১ বার যদি গুরুদেবের সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তাহা হইলে তাঁহার হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস আসিবে।

আমার শ্রীহট্টে থাকা কালে গুরুদেবের নিজ বাটীতে ৺মায়ের মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তি অনেক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় এক ভাস্করকে প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয়। মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে অনেক

বিলম্ব হইয়াছিল। শ্রীহট্টে থাকা কালে পূজাবকাশের সময় কলিকাতায় যাইয়া গুরুদেবের সঙ্গে আমি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমায় ভাস্করের বাটীতে গমন করিয়াছিলাম। ভাস্করকে মূর্ত্তি যে ভাবে গঠন করিতে বলা হইয়াছিল, সে ভাবে মূর্ত্তি গঠন হয় নাই। তথাপি মায়ের কষ্টি পাথরের মূর্ত্তি গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত করায়, তিনি কিছু সময় একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাস্কর পুনরায় আদেশানুযায়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকার করিল। তৎপরে আমরা উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। রাস্তায় গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মূর্ত্তি মনোমত না হওয়াতে কি ঐরূপ কাঁদিতেছিলেন?" তিনি বলিলেন "না, বাবা! ঐ মুখ দেখিলে আমার এত আনন্দ হয় যে আমি অশ্রু সামলাইতে পারি না।"

বাটীতে মূর্ত্তি স্থাপনের সমুদয় কার্য্য গুরুদেব নিজেই করিয়াছিলেন; আমরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ৺মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর গুরুদেব বাটীতে থাকিয়া দিনকতক নিজেই ৺মায়ের সেবাপূজা করিয়াছিলেন। মনে হইল, বোধ হয় তিনি আর বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবেন না। কিন্তু ৺মায়ের পূজা করিতে পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই সমান অধিকারী। গুরুদেব তাঁহার নিজ পোষ্য পুত্রকে সস্ত্রীক, এবং এক বয়স্থা বিধবা ভাগিনেয়ীকেও স্বয়ং দীক্ষা দান করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ৺মার পূজা করিতে শিখাইয়া দিলেন। যাঁহারা মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ দীক্ষা প্রদানে কোন বাধা নাই। সুতরাং তখন আর গুরুদেবের অন্যত্র যাওয়ার অসুবিধা রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "৺মাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি বলিয়াই কি তিনি কেবল আমার বাটীতে আছেন? তিনি সকল স্থানেই আছেন, আমি বাটী না থাকিলেও

৺মায়ের পূজা অন্তের দ্বারা হইতে পারে তার বন্দোবস্ত করিয়াছি।”

শ্রীহট্ট হইতে বরিশাল যাইবার জন্য আমার প্রতি হুকুম হইল। বরিশাল যাইতে অনিচ্ছা সত্বেও আমার জিনিস পত্র তথায় পাঠাইয়া দিলাম, এবং সেই সময় কয়েক দিনের বিদায় লইয়া গুরুদেবের বাটী গমন করিলাম, কারণ, তথায় আমার দুই পুত্রের উপনয়ন-সংস্কার-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। আমি গুরুদেবকে জানাইয়াছিলাম, যে বরিশাল আমার পছন্দ হয় নাই। ২।১ দিন গুরুবাটীতে থাকিতে থাকিতে সংবাদ আসিল যে আমাকে বরিশাল যাইতে হইবে না।

গুরুগৃহে থাকা কালে দেখিলাম, গুরুদেবের কিছু কিছু মুসলমান ভক্তও আছেন। আমার সাক্ষাতে একটি মুসলমান সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ৺মাকে দিবার জন্য গুরুদেবের নিকট উপস্থিত করিল। ঐখানে থাকিতে থাকিতে একদিন দেখিলাম, ঐখানকার পোষ্টমাষ্টার বাবু অনেক দিন জ্বরে ভুগিতেছেন, তিনি চিকিৎসারও কার্য্য করিতেন, কিন্তু নিজের কিছুই করিতে পারেন নাই। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার ঔষধ খাইবেন?” পোষ্টমাষ্টার বাবু সম্মতি প্রকাশ করায়, গুরুদেব তাঁহাকে ৺মায়ের নির্ম্মাল্য ও চরণামৃত আনিয়া দিলেন। পোষ্টমাষ্টার বাবু পরদিন হইতেই রোগমুক্ত হইলেন।

গুরুদেবের বাটী হইতে সিলেট যাইবার পথে সংবাদ আসিল, আমাকে বদলি হইয়া বর্দ্ধমান যাইতে হইবে, এবং তৎপূর্ব্বে কয়েক দিন শ্রীহট্টে থাকিতে হইবে। কয়েক দিবস শ্রীহট্টে থাকিয়া বর্দ্ধমান চলিয়া যাই। গুরুদেবের নিকট হইতে দূরে যাইতে হইবে জানিয়া মনে কষ্ট হইল বটে, কিন্তু নিরুপায়, কর্ম্মনির্ব্বন্ধবশতঃ যাইতেই হইবে। গুরুদেবের নিকটে থাকিয়া তাঁহার দৈবশক্তি দর্শনে ক্রমশঃ বুঝিতেছিলাম, যথার্থই সদগুরু

লাভ হইয়াছে। তিনি আমাদের সমস্ত ভারই একরূপ লইয়াছিলেন,—সুখদুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইয়া সহজেই শান্তিলাভ করিতাম।

তাঁহার বাহ্য বেশভূষা কিছুই ছিল না, তিনি সামান্য দরিদ্রের ন্যায় চলাফিরা করিতেন, অতএব তাঁহার আভ্যন্তর অবস্থা যে কত উন্নত তাহা কেহই সহজে বুঝিতে পারিত না। একটা উদাহরণ দিয়া এ অধ্যায় শেষ করিব।

গুরুদেবের নিকট আশ্রয় লওয়ার পূর্ব্বে তিনি যখনই কলিকাতায় থাকিতেন, তাঁহার বিশেষ বন্ধু এবং হিতৈষী কবিরাজ ৺রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন মহাশয়ের বাটীতেই থাকিতেন। যদিও ৺রাজেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় বিষ্ণু উপাসক বলিয়া মনে হইত, তথাপি তিনি গুরুদেবকে বিশেষ ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন। তিনি গুরুদেবকে 'মাষ্টার মহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে সাধুপুরুষ বলিয়া জানিতেন এবং সেইরূপ ব্যবহারও করিতেন। আমাদের স্নেহের চক্ষে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব আমাদের নিকটেই থাকিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; এবং গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভে আমাদের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। এক সময়ে কোন ছুটী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, গুরুদেবও আমার কাছেই ছিলেন; সেই সময় কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য ২।১ দিন কষ্টও পাইতেছিলেন। গুরুদেব একদিন প্রাতে আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে গেলেন। সেই সময় দেখিলাম, ডাক্তার, ধাত্রী সকলেই বিশেষ চিন্তিত ভাবে সময় কাটাইতেছেন; আবশ্যক হইলে যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় বাটীর ভিতর গিয়া গুরুদেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কতক্ষণ পরে গুরুদেব আসিয়া

বলিয়া গেলেন, ৺মাকে জানাইয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই বিনা যন্ত্রের সাহায্যে প্রসব হইবে। ১৫ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারকে যন্ত্রাদি লইয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম এবং আধঘণ্টার মধ্যে বিনা হস্তক্ষেপে প্রসব হইয়া গেল। সেই সময় আমি কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে ব্যক্তিগণের নিকট বলিয়াছিলাম যে এত বড় একজন সাধু বাটীতে উপস্থিত, সুতরাং বিপদের কোন ভয় নাই; তবে কবিরাজ মহাশয় যে সময়ে তাঁহার সাহায্য লইলেন তাহার কিছু পূর্ব্বে সাহায্য লইলে অনেক পূর্ব্বেই প্রসূতির কষ্ট লাঘব হইত। তারপরে গুরুদেব আমায় বলিয়াছিলেন, "বাবা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছি যে।" আমি ঐ সম্বন্ধে আমার দোষ স্বীকার করিলাম; কেন না আমি জানিয়া শুনিয়া চুপ্ করিয়া থাকিতে পারি না। গুরুদেব এই পর্য্যন্ত বলিলেন, "প্রকাশ হইয়া পড়া ভাল নয়।" ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি কত গুপ্তভাবে থাকিতেন এবং থাকিতে ইচ্ছা করিতেন।

নবম অধ্যায়।

স্বাধীন ত্রিপুরার মধ্যে কৈলাসহর নামক স্থানে গুরুদেব কতক জঙ্গল বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। জঙ্গল বলিয়া কোন রাজস্ব দিতে হইত না। পরিষ্কার করাইয়া তাহা হইতে কোনও আয়ের উপায় করিতে পারিলে রাজস্ব দিতে হইবে এইরূপ কথা ছিল। এই ভাবে রাজস্ব মাপ পাইয়া আসিতেছিলেন। গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গল পরিষ্কার হইলে কৃষিকার্য্য দ্বারা জমির উৎকর্ষ সাধন করিয়া ঐ স্থানে গো ইত্যাদি পশুপালনের চেষ্টা করিবেন এবং একটী আদর্শ আশ্রম করিবেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া জঙ্গল কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক —মা লক্ষ্মীর অনিচ্ছার জন্যই হউক বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অনুপযুক্ততা বা অনবধানতাবশতঃই হউক—কার্য্য কোন রকমেই সফলতা লাভ করিল না, বরং কিছু লোকসান দিতেই হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ চা-বাগানের হুজুক বৃদ্ধি হওয়ায় ত্রিপুরার রাজ সরকার হইতে হুকুম আসিল যে চা বাগান তৈয়ারী করিতে হইবে, নচেৎ রাজস্ব মাপ হইবে না। বাধ্য হইয়া গুরুদেব চা বাগানের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সংসার-বিরাগী ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণের পক্ষে চা-বাগান তৈয়ারী করিবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা কতদূর সুকঠিন, তাহা সকলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিবেন বটে, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিয়া চা-বাগান গড়িয়া তোলার লোক কোথায় পাওয়া যাইবে! তাই লিমিটেড্ কোম্পানী করিয়া কার্য্য করিবার প্রস্তাব হইল। গুরুদেবকে যাহারা ভক্তি করিতেন, তাহারা কিছু কিছু টাকা দিয়া সেয়ার

খরিদ করিলেন বটে, পরন্তু যাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার লইলেন তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন এবং কোম্পানীও লোপ পাইয়া গেল। ২।৩ বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য গুরুদেবের শরীর আরও খারাপ হইয়া গেল। এক এক বার সেখান হইতে ঘুরিয়া আসিতেন এবং কয়েক মাস ধরিয়া অজীর্ণ বা জ্বর রোগে ভুগিয়া তবে নিস্তার পাইতেন। তাঁহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বন্ধুরা বা ভক্তেরা টাকা দিয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি পরিশ্রম না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু এখনকার কালে বিষয়-বুদ্ধিহীন লোককে বঞ্চনা করা অতি সহজ; এবং ছাত্র বা ভক্ত হইলেও অর্থলোভে এইরূপ কার্য্য করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হন না, ইহাই সম্পূর্ণভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে চা কোম্প্যানী ত লোপ পাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের যে সমস্ত জমি স্বাধীন ত্রিপুরার মধ্যে ছিল, তাহাও সরকার বাহাদুর হইতে রাজস্বের দাবীতে নীলাম হইয়া গেল। এই ঘটনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর মধ্যে চির বিবাদ বিদ্যমান। যেখানে সরস্বতী দেবীর কৃপা থাকে, সেখানে মা লক্ষ্মী কৃপা করিতে চান না—যেখানে মা লক্ষ্মী কৃপা করেন, সেখানে সরস্বতী দেবীর কৃপা প্রদর্শিত হয় না। অন্ততঃ গুরুদেবের জীবন ঐ বিষয়ে একটী প্রমাণস্বরূপ বলা যায়।

উপরোক্ত চা বাগান সম্পর্কে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুদেব এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি সমস্ত বিষয়ই জ্ঞাত আছি, তাই বলিতে পারি, লোভ বলিয়া কোন জিনিস গুরুদেব জানিতেন না, এবং তিনি বিষয়কার্য্যে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি আমার নিকট বলিতেন, "বাবা, টাকা পয়সা

ছুঁইতে আমার ইচ্ছা হয় না............।" আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়া অবধি তাঁহাতে কখন অর্থ বা বিষয় সম্বন্ধে লোভ বা স্পৃহা অনুমাত্রও দেখি নাই। ইহাও বলিতে পারি যে, চা-বাগান লোপ পাওয়ার জন্য বা তাঁহার স্বাধীন ত্রিপুরার জমি নীলাম হইয়া যাওয়াতেও তাঁহাকে এক দিনের জন্যও বিষণ্ণভাবে থাকিতে দেখি নাই। তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ছিলেন। তিনি সংসারের ভিতর থাকিয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামের সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দেবোত্তর করিয়া দেন এবং অপর অর্দ্ধেক পোষ্য পুত্রকে দান করেন; এবং পোষ্য পুত্রকেই ৺বিশ্বমাতার সেবায়ত নিযুক্ত করেন। তাহার পর আর নিজ বাটীতে গমন করেন নাই।

বাটী ত্যাগ করিবার পরে গুরুদেব অধিকাংশ সময় আমার কলিকাতার বাটীতে বা আমার কার্য্যস্থানে আমার নিকটে থাকিতেন; এবং কখন কখন ৺কাশীধামে গিয়া থাকিতেন বা বন্ধুদিগের নিকটে যাইতেন। কয়েকজন শিষ্য হওয়ায় মধ্যে মধ্যে তাহাদেরও নিকট যাইতে হইত। আহ্বান না করিলে শিষ্যদের নিকট যাওয়ার কথা আমার স্মরণ হয় না। গুরুদেব নিজগৃহে থাকা কালে তাঁহার এক বিধবা ভাগিনেয়ী তাঁহার সেবা করিতেন। গুরুদেব তাঁহাকে মা বলিতেন। গ্রামের সম্পত্তি দেবোত্তর করা এবং পোষ্য পুত্রকে দান করিবার পূর্ব্বেই সেই মা (যাঁহাকে কখন কখন বড় মাও বলিতেন) ৺বারাণসীধামে চলিয়া আসিয়াছিলেন। আর একটী বাল-বিধবা, যাহাকে তিনি ছোট মা বলিতেন তিনিও গুরুদেবের ভাগিনেয়ীর সঙ্গে বারাণসী আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই গুরুদেবের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন এবং গুরুদেবকে বিশেষভাবে আদর যত্ন করিতেন। তাঁহাদের জন্যই গুরুদেবকে মাঝে মাঝে বারাণসীধামে যাইতে হইত।

একদিন গুরুদেবকে বলিয়াছিলাম, ৺বিশ্বমাতাকে কাশীতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি নিজে কাশীতে বাস করিলে কিরূপ হয়। গুরুদেবের একই কথা ছিল, "৺মা তো সর্ব্বত্রই আছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, কাশীই কি—বাড়ীই কি ;" তাই ৺বিশ্বমাতাকে বেগমপুর হইতে সরাইবার মত করেন নাই।

গুরুদেব পূর্ব্বে যখন ৺রাজেন্দ্র নারায়ণ কবিরাজের নিকট থাকিতেন, তখন কবিরাজ মহাশয় গুরুদেবের শারীরিক উন্নতি সাধনের জন্য ঔষধ সেবন করাইতে চেষ্টা করিতেন। গুরুদেবের নিকটই শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, ঔষধে তাঁহার কোন ক্রিয়া করে না, বরং রোগ বৃদ্ধি করে। তথাপি কবিরাজ মহাশয় মধ্যে মধ্যে ঔষধ দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঔষধে উপকার ত হইতই না—কখন কখন রোগ বৃদ্ধি পাইত। আমিও ২।১ বার ঔষধ দিবার চেষ্টা করিয়া ঐরূপই ফল দেখিয়াছি।

তিনি যখনই স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত কৈলাসহর বা অন্য স্থান হইতে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন, প্রায়ই নানারূপ অনিয়মবশতঃ পীড়িত হইয়া আসিতেন। অজীর্ণই তাঁহার প্রধান পীড়া ছিল। কিছুদিন যত্ন করিলে শরীর সুস্থ হইত। ৺কালীবাড়ী হইতে চরণামৃত বা নির্ম্মাল্য আনিয়া দিলে শীঘ্রই রোগমুক্ত হইতেন। ইহাই তাঁহার বিশিষ্ট

যখন যেখানে থাকিতেন কখনই গৃহস্থকে বিরক্ত করিতেন না, যাহা পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তামাকের একটু বেশী অনুরক্ত ছিলেন ; কারণ শৈশবাবস্থা হইতেই উহাতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। পরের হুঁকায় তামাক খাইতেন না, বা নিজের হুঁকা পরকে দিতেন না। হুঁকা না পাইলেও একটু পাতা পাইলেই তামাক সেবন করিতে পারিতেন। আহারাদির কোনই গোলমাল ছিল না,—

আমিষ কি নিরামিষ—যখন যাহা পাইতেন—তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতেন, তবে কখন কখন ভাতও সহ্য হইত না,—রুটী-লুচি ত দূরের কথা।

তামাক সেবন ও আমিষ ভোজন সম্বন্ধে একবার তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গীয়া পত্নীর অনুরোধ মতই ঐ দুইটী ত্যাগ করেন নাই।

পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে—একখানি সাদা ধুতি ও একখানি লংক্লথের চাদর, একজোড়া চটী জুতা ও একটী ছাতা ব্যবহার করিতেন। একটী ছাতা ও একজোড়া চটী জুতাতে তাঁহার অনেক দিন চলিত। গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত, কিন্তু দাড়ি ও চুলে ঢাকা থাকিত বলিয়া লোকে দেখিতে পাইত না। শীতকালে একটা মোটা সূতি গেঞ্জী এবং একখানি গরম গায়ের কাপড় হইলেই চলিত। আমি তাঁহাকে কখনও সার্ট বা কোট গায়ে দিতে দেখি নাই, বা রং করা আলখাল্লা ব্যবহার করিতেও দেখি নাই। পূজার সময় কপালে যে চন্দনের ফোঁটা দিতেন, মুখ না ধোয়া পর্য্যন্ত সেই একটী চিহ্ন থাকিত। ছড়ি বা লাঠি ব্যবহার করিতেন না। শরীর কৃশ ছিল এবং দুর্ব্বলও ছিল বলা যায়। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ছড়ি ব্যবহার করায় অনেক সুবিধা আছে দুর্ব্বল শরীরকে সাহায্য করে এবং অনেক সময় বিপদ হইতে মানুষকে রক্ষা করে। তাহাতে বলিয়াছিলেন, "ছড়ি ব্যবহার করিলে ৺মায়ের উপর নির্ভরতা কমিয়া যায়।"

তিনি সাধারণতঃ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বিছানায় বসিয়াই অনেকক্ষণ ভগবচ্চিন্তা করিতেন। তারপর উঠিয়া শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা করিতেন। তিনি প্রত্যহই প্রত্যেক শিষ্যের জন্য আবশ্যকীয় জপাদি করিতেন। বলিতেন, প্রত্যেক শিষ্যের জন্যই প্রত্যহ পৃথক পৃথক জপ করিতে হয়। বেলা ৮টা কি ৮॥টার সময় প্রাতঃকালের কার্য্য শেষ হইলে

অতি সামান্য কিছু জলযোগ করিতেন। তারপর দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। পরে স্নানাদি করিয়া পূজায় বসিতেন। প্রায় বেলা ১টার সময় আহার করিতেন। আহারের কিছু নিয়ম ছিল না। যখন যেরূপ হজম করিতে পারিতেন সেইরূপ আহার করিতেন—কখন ভাত, কখন চিঁড়া, কখন সুজি, কখন বা বার্লি। আহারের পর খবরের কাগজ দেখিতে দেখিতে বা কোন পুস্তক পড়িতে পড়িতে বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামের পরেও পুস্তকাদি পাঠ করিতেন বা কিছু লেখাপড়ার কাজ করিতেন। তারপর সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া লেখাপড়ার কাজ করিতেন। রাত্রি ৯।১০টার সময় সামান্য কিছু জলযোগ করিতেন তারপরেও লেখাপড়ার কাজ করিতেন, বোধ হয় রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত। তারপর শয়ন করিতেন। মাঝে মাঝে রাত্রে উঠিয়া বসিয়া জপাদি করিতেন। কোন সময়ে বলিয়াছিলেন "যদি কাহারও জন্য কিছু কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সেই লোক নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যতটুকু জাগিয়া থাকে সেই সময় কিংবা উহার ঘুম হইতে জাগিবার পূর্ব্বেই তাহা সম্পাদন করা আবশ্যক।"

যখন কাহারও সহিত আলাপ করিতেন, তখন তাঁহাকে প্রফুল্ল ছাড়া অন্যরূপ দেখা যাইত না; এবং তিনি বালকের ন্যায় সরলভাবে কথা কহিতেন। কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে এত সহজ ভাষায় ও সহজ ভাবে তাহার সমাধান করিয়া দিতেন যে তাহা একটী শিশুও যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। আলাপের প্রসঙ্গ যেরূপ হউক না কেন, তদুপলক্ষ্যে কখন কোনরূপ অহঙ্কারের ভাব দেখা যাইত না, বরঞ্চ প্রায়ই বলিতেন 'আমি কি বুঝি'?

শিষ্যদের নিকট হইতে যাহা কিছু প্রাপ্তি হইত, তাহার কতক কাশীতে তাঁহার দুই মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং কতক বাড়ীতে তাঁহার পোষ্যপুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

একটা খরচ তাঁহার বার্ষিক ছিল বলিলেই হয়। তিনি যখন ভবানীপুরে রাজা রামকৃষ্ণের আসনে জপ করিয়াছিলেন, তখন দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিনে ৺মায়ের ভারপ্রাপ্ত পূজক গুরুদেবের নিকট গিয়া প্রকাশ করেন যে, ৺মা স্বপ্নে জানাইয়াছেন যে মহাষ্টমীতে গুরুদেবের পয়সায় ভোগ না হইলে ৺মা অন্য ভোগ লইবেন না। গুরুদেব শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "তিনি ৺মায়ের গরীব সন্তান, ৺মা তাঁহাকেই খাওয়াইবেন, তিনি ৺মাকে কি করিয়া খাওয়াইবেন? তবে ৺মায়ের যখন ইচ্ছা হইয়াছে, দেখুন আমার ঝুলিতে বোধ হয় চারিটী টাকা আছে —তাহা লইয়া গিয়া ৺মায়ের ভোগ দিন।" সেই অবধি ৺মার মহাষ্টমীর ভোগের নিমিত্ত গুরুদেব চারিটী করিয়া টাকা প্রতিবর্ষে পাঠাইয়া দিতেন।

বেগমপুরে যে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার কাছে ভূমি হইতে ৪।৫ হাত উচ্চে একখানি ছোট পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে সেইখানে গিয়া ৩ দিন ৩ রাত্রি জপতপে কাটাইতেন। ঐ সময় নিরম্বু উপবাস করিতেন, কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না, বা বাক্যালাপ করিতেন না, তবে কিছু তামাক, টিকা ও হুঁকা কল্কে সঙ্গে রাখিতেন। শৌচাদি কার্য্য রাত্রে নির্জ্জন সময়ে সারিয়া লইতেন, ইহাই মনে হয়। উপবাসী থাকিলে শৌচপ্রস্রাবের প্রয়োজনও অনেকটা কমিয়া যায়।

কলিকাতায় আমার বাটীতে থাকিবার সময় একবার ঐরূপ জপতপাদি করিয়াছিলেন জানি। ত্রিতলের একটী কুঠরীর দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া থাকিতেন। গভীর রাত্রিতে কখনও খড়মের (কাষ্ঠ পাদুকা) শব্দ পাওয়া যাইত, বোধ হয় শৌচ প্রস্রাবাদির জন্য নামিয়া যাইতেন।

পূজার সময় যখন ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন হৃদয়ের আবেগভরে ক্রন্দনের ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। চক্ষু হইতে জল-ধারায় বুক ভাসিয়া

যাইত, নিকটে কেহ থাকিলে জানিতে পারিত—দূরের লোকেরা কিছুই জানিতে পারিত না। পূজার সময় একটী ঝুলি কাছে থাকিত, তাহাতে পূজার উপযোগী কিছু কিছু উপকরণ থাকিত—কর্পূর, গন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি। এই ঝুলি তাঁহার সঙ্গের সাথী ছিল। লোকসমক্ষে হৃদয়ের গভীর ভাব কখনও প্রকাশ পাইতে দিতেন না। গভীর রাত্রে আহারাদির পর যখন সমস্ত বহির্জ্জগৎ নিস্তব্ধ হইত, সেই সময়ে কেহ ধর্ম্ম কথা তুলিলে কিছু কিছু প্রাণের কথা বলিতেন। দিবাভাগে সাধারণ কথাবার্ত্তার সময়ে কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিলেই কথা প্রসঙ্গে অনেক সদুপদেশ পাওয়া যাইত এবং উঠিয়া যাইবার সময় মনে হইত যেন একটা স্নিগ্ধ ও পবিত্র ভাব লইয়া আসা গেল। এমন সরল মধুর ভাব আর চোখে পড়ে নাই। বহু পুণ্যফলেই এরূপ সাধুসঙ্গ হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশের জমিজমা পোষ্যপুত্র ও দেবতার নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া আসার পর হইতে আর বাটী যান নাই। একবার নিকটবর্ত্তী স্থানে কোনও বন্ধুর বাটীতে গিয়া দিন কয়েক ছিলেন; সেটাও কোন একটা কার্য্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করার জন্য। সেইখানেই তাঁহার পোষ্যপুত্র ও অন্য সকলে আসিয়া দেখা করিয়া যাইতেন। কৈলাসহরের সমুদয় জমি রাজস্বের দায়ে নীলাম হইয়া যাওয়ায় সেখানকারও বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

১৩৩১ সালে একবার ৺কাশীধামে গিয়া কয়েক মাস ছিলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার শরীরের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়াছিল, এমন কি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন তখন হাত পা মুখ পর্য্যন্ত ফুলিয়া ছিল। কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই কোন শ্মশানে নির্জ্জনবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবা! আপনার শরীরের এরূপ

অবস্থায় কি করিয়া শ্মশানে নির্জ্জন-বাস করিবেন ?” তাহার উত্তরে বলিলেন, “সে জন্য ভাবিতে হইবে না, ৺মা চালাইয়া লইবেন।” আমি আর আপত্তি করিতে পারিলাম না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল লক্ষ জপ করা এবং ১০৮ বার পুটিত চণ্ডী পাঠ করা। কাহার জন্য ঐ কার্য্যে ব্রতী হইতে-ছিলেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, তাঁহার সৎ ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে পারিলাম না।

হাওড়ায় অন্তর্গত শিবপুরের শ্মশান ঘাটে যে ঘরবাড়ী আছে তাহার মধ্যে দ্বিতলের গৃহটী স্থির করা হইল। তাঁহার জপ পাঠ ইত্যাদিতে প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত সময় লাগিবে, ততক্ষণ তিনি মৌনী থাকিবেন ; তার পর স্বপাকে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিবার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বপর্য্যন্ত লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার বা কথাবার্ত্তার সময় রাখিবেন, পুনরায় সন্ধ্যার পর জপাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

আশ্বিন মাসের শেষ তারিখে আবশ্যকীয় উপকরণাদি সহ গুরুদেবকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম। সেই ঘাটেই শ্মশানে ঢুকিবার রাস্তার পার্শ্বে ৺মাকালীর একটী মন্দির ছিল এবং একটী শিব মন্দিরও ছিল। একজন সাধু ৺মায়ের পূজার জন্য সেখানে সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি গুরুদেবের দর্শন পাইয়া, অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আবশ্যক হইলে গুরুদেবকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন, ইহা আমাদিগকে জানাইলেন।

১লা কার্ত্তিক হইতেই গুরুদেব সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কয়েক দিন পরেই সংবাদ পাইলাম যে ১লা কার্ত্তিক হইতেই গুরুদেবের হাত, পা বা মুখে যেখানে যাহা ফুলা ছিল তাহা আর নাই। তিনি যখন সঙ্কল্প করিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন, ৺মায়ের এমনই করুণা

ছিল, যে সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর কোন-রূপ অসুস্থ হইত না।

যতদিন আলিপুরের কার্য্যে ব্রতী ছিলাম, ততদিন প্রতি সপ্তাহে (অর্থাৎ প্রতি রবিবারে) একবার করিয়া গুরুদেবের নিকট গিয়া দর্শন করিয়া আসিতাম। তিনি ঐ শ্মশানঘাটে চৈত্রমাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং কার্য্য সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমি পরে জানিতে পারিলাম যে, ঐ কার্য্য তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য করিয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়

গুরুদেব পত্র দ্বারা মধ্যে মধ্যে নানা উপদেশ দিতেন। ঐ উপদেশ-গুলি সাধারণের উপকারে আসিতে পারে, তাই যতটুকু আবশ্যক কেবল ততটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

কৈলাসহর

৩০।৭।১৭ বাং

*　*　*　*　*

" * চাকুরী, অর্থ, সংসার, এই সমস্তই ৺মার পূজা।

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং
সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাত
স্তদস্তু তব পূজনং ॥

*　*　*　*　*

ইন্দ্রিয়দিগের রাজা মন; রাজাকে দমন করিলেই আপনা হইতেই প্রজার দমন হইবে। মনের দমন সম্বন্ধে অর্জ্জুন বলিলেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমনের উপায় দ্বিবিধ,—শারীরিক-অভ্যাস ও মানসিক-বৈরাগ্য। *

* * * বৈরাগ্যের মূল সূত্র,—বিষয়ের অস্থিরতা, অনিত্যতা, অকিঞ্চিৎকরতা এবং অনুপাদেয়তার দৃঢ় উপলব্ধি। মাছের তরকারী খাইতে বসিয়া যদি তাহার আদ্যন্ত (আদি অর্থাৎ অপকাবস্থায় তাহার গন্ধ ও শোণিত এবং অন্ত্রাদির দৃশ্য, তথা অন্ত অর্থাৎ আহারের পরবর্ত্তী অবস্থা) মনে মনে নিয়ত রীতিমত আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে মৎস্যাহারে রুচি আপনা হইতেই কমিয়া আইসে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধেই এই কথা।

* * * *

* * * *

কেবল ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে, সর্ব্ববিষয়েই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তার সহিত অনুষ্ঠানের আরম্ভ—পুরুষকার—সিদ্ধির পক্ষে অনিবার্য্য। আমাদের যত ইন্দ্রিয়, রিপু বা বৃত্তি আছে তাহাদের প্রত্যেকটী আমাদের অশেষ মঙ্গলের নিদান; অমঙ্গল—কেবল অপব্যবহারের ফল। জগজ্জননী জীবনরক্ষার্থ আহার দিয়াছেন, আহার গ্রহণের জন্য ক্ষুধা দিয়াছেন, ক্ষুধা নিবৃত্তির সঙ্গে রসনার তৃপ্তি বা আনন্দ দিয়াছেন। ক্ষুধা না থাকিলে কেবল জ্ঞানিগণই অন্নগ্রহণ করিতেন, অজ্ঞেরা অনাহারে মরিয়া যাইত। ক্ষুধা থাকাতে সকলেই অন্নের জন্য—জীবন রক্ষার জন্য, জীব-জগতের স্থিতির জন্য—ব্যাকুল। ক্ষুন্নিবৃত্তির সঙ্গে রসনার তৃপ্তি না দিলেও হইত, খাদ্য সুমিষ্ট না হইয়া কটু তিক্ত হইলেও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য লোকে তাহা খাইত; কিন্তু ৺মা কেবল মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়াই খাদ্যকে এত মিষ্ট করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ৺মায়ের সেই অপার স্নেহের অপ-

ব্যবহার করি; আমাদের মধ্যে অনেকেই জীবনরক্ষার উদ্দেশ্য ভুলিয়া রসনার তৃপ্তির জন্য উন্মত্ত হয়, অগ্নিমান্দ্য জন্মাইয়া জীবন নষ্ট করে। * *

* * * *

ইন্দ্রিয় দমনের অতি সহজ উপায় অনেক আছে। এক গুলিতেই বন্য গজের সমস্ত উৎপাত থামিতে পারে; কিন্তু যিনি তাহাকে দিয়া কার্য্য সাধন করিতে চাহেন, তিনি বহু কষ্টে তাহাকে বশ করেন।

* * ৺মার কাছেই দণ্ডে দণ্ডে বল চাহিবেন, উপদেশ চাহিবেন, সহায়তা চাহিবেন; ৺মাই সমস্ত আশা, সমস্ত সদিচ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

(২) বেগমপুর
১৪।১১।১৯ বাং

* * * *

"গ্রাম্য দলাদলি, বিবাদ বিসংবাদ এবং মনোমালিন্যের অবধি নাই। সমস্ত দিন বৃথা জল্পনায় অতিবাহিত হয়; কাজ কিছুই হয় না। সন্ধ্যা হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত মৌনী থাকিব; এবং ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ৭ ঘণ্টা লোকের সঙ্গে কথা কহিব, এইরূপ মনে করিতেছি। এইরূপ ব্যবহারে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, কেহ উপহাসও করিতে পারে। কিন্তু কি করা, আত্মহিত দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

(৩) বেগম পুর
১৬৷৩৷২০ বাং

* * * *

"দৃঢ়তা হইতে প্রত্যক্ষতা; তাহার পর অনুরাগ। যাহা প্রত্যক্ষ নহে,

তাহাতে অনুরাগ কোথা হইতে আসিবে? এ প্রত্যক্ষ ঐন্দ্রিয়িক নহে, আধ্যাত্মিক। অতি প্রাকৃতিক প্রত্যক্ষও অসম্ভব নহে, সাধকদিগের জীবনে তাহাও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহার জন্য লালায়িত হইবার প্রয়োজন নাই। আত্মোপলব্ধি—যাহা বুঝা যায়, কিন্তু বোঝান যায় না, তাহাই প্রাপ্ত, তাহাই জপসিদ্ধি। ৺মার চরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে থাকুন, কৃতার্থ হইবেন। ৺মা নির্দ্দয়, ৺মা কৃপণ, ৺মা পরীক্ষা করেন, এ সব ভ্রান্ত কথা ছাড়িয়া দিন। ৺মা আমাদের জন্য ব্যস্ত—আমাদিগকে লইয়াই তাঁহার সংসার, আমাদের জন্য তাঁহার সম্পদ, এই সত্যকথা মনে দৃঢ়রূপে ধারণা করুন।"

(৪) বেগমপুর

৮।৪।২০ বাং

"বর্ত্তমান সময়ে গুরু প্রায়ই শিষ্যের বিত্তাপহারক, শিষ্যের মনেও গুরুকে দেখিলে বা ভাবিলে সেই ভাবেরই উদয় হয়, সুতরাং শিষ্যের দ্বারা গুরুর আর্থিক উপকার হইলেও গুরুর দ্বারা শিষ্যের আধ্যাত্মিক উপকার ততটা হয় না। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে গুরুর প্রসন্নতা নিতান্ত অপরিহার্য্য, কারণ শিষ্যের মঙ্গলের জন্য গুরুকে প্রত্যহ তিন বেলাই কিছু কিছু খাটিতে হয়। যে স্থলে শিষ্যের কথা স্মরণ হইলেই গুরুর চিত্ত প্রফুল্ল হয়, সেই স্থলেই এ খাটুনির পূর্ণ ফল পাওয়া যায়, নতুবা এ খাটুনি উষরক্ষেত্রে ধান্যবপনের ন্যায় নিষ্ফল হয়। * * *

কিন্তু আপনার এই গুরুর প্রসন্নতা অর্থের উপরেই নির্ভর করে, যদি এরূপ মনে করেন, তবে বুঝিবার ভুল হইয়াছে।"

(৫) বেগমপুর।

১৭।৪।২০ বাং

* * * *

"দুর্গামণ্ডপের উপর বৈঠকখানা হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বাহ্য পূজকের পক্ষে পূজার স্থানটী যতদূর সম্ভব পবিত্রভাবে এবং সম্মানের সহিত দেখিতে হইবে। মণ্ডপের উপর বৈঠকখানা করিলে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আপনাকে অনুমতি করিতে আমার হৃদয় অগ্রসর হইতেছে না। কলিকাতায় অনেক লোকে পরামর্শ দিতে পারে বিচিত্র নহে; কিন্তু কলিকাতায় আধুনিক সভ্যতাই প্রবল, এবং আধুনিক সভ্যতা বাহ্য সুবিধাই চায়।"

(৬) বেগমপুর।

১৪।১১।২০ বাং

* * * *

"জীবনের সুখ দুঃখের পর্য্যায় সর্ব্বদাই ঘটিতেছে, দিন রাত্রির ন্যায় এই দুইটী অবস্থা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। পণ্ডিতেরা সুখে বিনয় এবং দুঃখে ধৈর্য্যের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইহা হইতেও উৎকৃষ্ট একটা ব্যবস্থা আছে। ৺মার চিন্তাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখই আছে, ইহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই। যদি এই চিন্তাকে মনের মধ্যে স্থির রাখিতে পারেন, তাহা হইলে দুঃখ কখনও মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

* * * *

রাগের ঔষধ বলিতেছি। রাগ হইলেই খানিকটা চুপ করিয়া থাকিবেন, তাহার পর হাসিয়া ফেলিবেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবেন। রাগরূপ শত্রুটা আহার না পাইয়া ক্রমে শুকাইতে শুকাইতে একেবারে মরিয়া যাইবে; তখন দেখিবেন, কত আনন্দ।

(৭) বেগমপুর।

৩০।১১।২০ বাং

"স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, বাড়ীতে নাগেশ্বর ফুল গাছের তলে ৺মার পাষাণময়ী মূর্ত্তি রহিয়াছে, আর একটী ব্রাহ্মণ আমাকে বলিতেছেন, 'তুই মা মা করিয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছিস, আর বাড়ীতে পূজা পাইতেছেন না।"

[তখন ৺মার মূর্ত্তিস্থাপনের কথা হইতেছিল। পূর্ব্বে ৺গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল, কৈলাসহরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন।]

(৮) বেগমপুর।

৫।২।২১ বাং

* * * *

"স্বপ্নে যে স্থানে কালীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সে স্থান অনুসন্ধান করিতে অর্থাৎ খুঁড়িয়া দেখিতে আপনি লিখিয়াছেন। আমাদের আদিপুরুষের এখানে বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে লোকালয় ছিল না, বাসের একরূপ অযোগ্য নলবনে আবৃত নিম্নভূমি ছিল। সদাশিব অথবা তাহার পরবর্ত্তী কেহ এখানে কোন পাষাণ-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এমন একটা প্রবাদও নাই। এ অবস্থায় মাটী খুঁড়িয়া কোন ফল পাইব বলিয়া আশা হয় না। ৺মা এখানে আছেন, এ কথার অর্থ ৺মার আবির্ভাবই আমি বুঝিয়া লইতেছি। তবে ইহার মধ্যে যদি আর কিছু অজ্ঞাত বা গুপ্ত থাকে, ৺মা তাহা প্রকাশ করুন।"

(৯) বেগমপুর।

২৯।৪।২১ বাং

* * * * *

"আমার বেদনা (উদরে) মাস দেড়েক অত্যন্ত যন্ত্রনা দিয়া দিন আটেক কিছু কমিয়াছিল, তাহার পরে আবার ৮।১০ দিন খুব

বৃদ্ধি পাইয়া সম্প্রতি পুনরায় কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। * * আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমার অবশিষ্ট দিন এই ভাবেই অতিবাহিত হইবে। আমাকে এক্ষণে ৺মা যে স্থানে এবং যে অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহার বিধান ব্যবস্থা সমস্তই সাধারণ হইতে পৃথক। ঔষধ খাওয়ার নিষেধ পাইয়া মনে করিয়াছিলাম, রোগ হইলে ঔষধ খাইতে পারিব না, ৺মার আবার এ কিরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ ব্যবস্থা তাঁহার খামখেয়ালী নহে, এই পথে এই ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। রোগের চিকিৎসা নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, পুণ্যের পুরস্কার নাই, অত্যাচারের প্রতিকার নাই, এই রাজ্যের এবং এই অবস্থার ইহাই ব্যবস্থা। সুতরাং চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন, এই অবস্থায় সংসারের সেবা চলিতে পারে না। নিজের মন এবং প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, আমি এই অবস্থারই উপযোগী, সংসার-সেবার উপযোগী নহি। সংসারে থাকা এবং সংসারের সেবা করা আমার কাছে নিতান্তই তিক্ত বোধ হইতেছে। সংসারে যাহা করিতেছি তাহা ৺মার কার্য্য মনে করিয়াই করিতে পারিতেছি, নতুবা এক মুহূর্ত্তও সংসারে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ৺মার কৃপায় শ্রীমান শচীন্দ্র গত ২৫শে শ্রাবণ অষ্টাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, সুতরাং আমার পক্ষে সংসার হইতে পৃথক হইবার ইহা উত্তম সুযোগ মনে করিতেছি। গত ২।৩ বৎসর যাবৎ এই চিন্তাই মনের মধ্যে খেলিতেছিল, এখন সেই সুযোগ উপস্থিত। তবে কি ভাবে আমি নিঃসম্পর্ক হইব, এখন এই বিবেচনায় পড়িয়াছি। যতটা আত্মকথা আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম, তাহা গুরু শিষ্য ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশযোগ্য নহে। * *

* * * *

আমি এখন দুইটী পন্থা দেখিতেছি,—১। বাড়ী ঘর যাহা আছে;

তাহা ৺কালীর নামে দেবোত্তর করিয়া এবং তাহার পরিচালনের জন্য শচীন্দ্রকে আমমোক্তার করিয়া দেওয়া। * * * *
কিন্তু অর্থাভাব যখন রহিয়াছে, তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, নিজের জন্য না হউক, ৺কালীর জন্যই আমাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে এবং ৺কালীর সংসারের জন্য খাটাই আমার সাধন-ভজন মনে করিতে হইবে। ঠিক্‌ভাবে ইহা করিতে পারিলে, ইহা মন্দ নহে ; কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা এবং অশান্তি আক্রমণ করে, এই এক আশঙ্কা।

২। দ্বিতীয় উপায়—শ্রীমানের নামে দানপত্র সম্পাদন করিয়া এবং কালী স্থাপনের সঙ্কল্প ও স্বপ্নাদেশ লঙ্ঘন করিয়া যথার্থ কৌশলের পথ অবলম্বন করা,—এরূপ করিলে সংসারের চিন্তা বা অর্থচিন্তা আমাকে অশান্তি দিতে পারিবে না। শচীন্দ্রের বাড়ী বা আপনার বাড়ী, রাজপ্রাসাদ বা বৃক্ষমূল, ষোড়শোপচার, শাকান্ন বা ফলমূল তুল্য মনে করিয়া যখন যে অবস্থায় থাকি তখন সেই অবস্থায় ৺মায়ের কোল মনে করিতে পারি।

* * * *

* * * *

* * * *
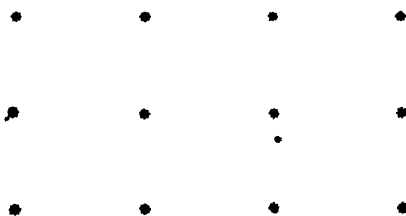
কিন্তু এই সকল চিন্তা করা বৃথা, কেহই কাহারো সুবিধা করিয়া দিতে পারে না, ৺মার কৃপায় এবং নিজের অদৃষ্ট অনুসারে যাহার যেরূপ চলিবার কথা সেরূপই চলিবে।’

(১০) বেগমপুর।

৭।৭।২১ বাং

*　　*　　*　　*

"নৌকায় উঠিয়া কিছুকাল পরে শুইলাম। নিদ্রা হয় নাই, কেবল নিদ্রার আবেশ হইতেছে, এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম, সায়াহ্নকালে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছি, কাহারো সঙ্গে কোন কথা নাই, শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা নাই, খাবার স্থান হইল, অন্ন ব্যঞ্জন আসিল, আমি বলিলাম আমার জ্বর হইয়াছে, সে কথার কেহ উত্তর করিল না। মনে করিলাম, ক্ষুধা হইয়াছে কিছু খাওয়া যাউক। পাতে বসিয়া দেখি, ভাতের চারিপাশে অন্যান্য ব্যঞ্জন অতি অল্প পরিমাণে আছে, কিন্তু বাটিভরা পোনা মাছের ঝোল, মাছ দেখা যাইতেছে। ভাতে হাত দিতে যাইব এমন সময় দেখি, আমার মুখের কাছে একখানি হাত উপস্থিত, তাহাতে ঔষধের মত কি আছে। আমি অভিপ্রায় বুঝিয়া হাঁ করিলাম। খানিকটা ঔষধ আমার মুখে দিলেন, আমি ঔষধ গিলিয়া মুখ বুজিলাম, কিন্তু তথাপি হাত সরিল না, সুতরাং আবার হাঁ করিলাম এবং অবশিষ্ট ঔষধ মুখে দিয়া হস্ত অদৃশ্য হইল। স্বপ্ন দেখিয়া জাগিলাম। *　　*　　*

*　　*　　*　　*

বাড়ী পৌঁছিলে জ্বরের কথা জানিয়া কি আহার করিব জিজ্ঞাসা করিলে, স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষার জন্য, আমি মাছ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং উত্তরে জানিতে পারিলাম, আমার জন্য পোনা মাছের ঝোল পৃথক্ রূপে পাক হইয়াছে। তখন ৺মারই এ সকল কার্য্য বুঝিলাম।

*　　*　　*　　*

স্বপ্নাদি গোপন রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি আনন্দের উন্মত্ততায় সেই

রাত্রিতেই সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম; তাহা না হইলে আমার বিশ্বাস, শুক্রবার রাত্রিতে আহারের পর আর জ্বর হইত না।"

(১১) বেগমপুর।
২৫।১।২২ বাং

* * * *

"কেহ মন্ত্র গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ব্যবসায়ী গুরুদের আনন্দ হয়, কিন্তু তাহাতে আমার ভয় হইয়া থাকে, কারণ আমার মত সাধন-ভজন-বিহীন ব্যক্তির পক্ষে নিজের ভার বহন করা কঠিন, তাহার উপরে অন্যের ভার গ্রহণ করা অসঙ্গত। তবে আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। একদিকে যেমন ভয় আছে, তেমনি অন্যদিকে একটা অপরাধের ভয়ও আছে। প্রকৃত আগ্রহের সহিত যদি কেহ দীক্ষা চাহে, আর নিষিদ্ধ শিষ্যের কোন লক্ষণ যদি তাহাতে না থাকে, এবং পরীক্ষায় যদি সে উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ কিছুদিন সহবাসের দ্বারা যদি তাহার যোগ্যতা বুঝা যায়, তাহা হইলে দীক্ষা না দেওয়াও ঘোরতর দোষ, সুতরাং আমি উভয় দিকে সঙ্কট গণনা করি।"

[৺মার আদেশ না লইয়া ৺গুরুদেব কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না।]

(১২) বেগমপুর
২।২।২২ বাং

* * *

"সংসারে অধর্ম্মের জয় হয় কেন, আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এ প্রশ্ন অতি পুরাতন, চারি যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এখন বিশেষতঃ কলিকাল, অধর্ম্মের সুখ সুবিধা না দেখিলে লোক অধর্ম্মের

দিকে আকৃষ্ট হইবে কেন এবং কলির কারাগারই বা কিরূপে পূর্ণ হইবে? গতকল্য এ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় যে দুইটী শ্লোক পড়িয়াছিলাম, আপনার জন্য তাহা পাঠাইলাম।

অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥
সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচং চৈবারমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্ম্মেন বাগ্বাহূদর সংযতঃ॥

(মনু ৪র্থ অঃ—১৭৪, ১৭৫ শ্লোক)

অর্থাৎ লোকে অধর্ম্মের সাহায্যে সুখভোগ করে, জাঁকযমক ধুমধাম করে; মিথ্যার সাহায্যে শত্রুকে পর্য্যন্ত জয় করে, কিন্তু পরিণামে এক সময়ে সমূলে বিনষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন, অধর্ম্ম-কর্ম্ম আত্মজীবনে না ফলিলে পুত্রের জীবনে ফলে, পুত্রের জীবনে না ফলিলে পৌত্রের জীবনে ফলে, কিন্তু অধর্ম্ম কথনও ব্যর্থ হয় না। সুতরাং অধর্ম্ম-পথে চলা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কার্য্য নহে। পণ্ডিতেরা অধর্ম্ম-বৃত্তিকে গবাদির শস্য-লোভ এবং পতঙ্গের আলোক-প্রীতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এ জন্যই ভগবান্ মনু বলিতেছেন, সত্য, ধর্ম্ম এবং আর্য্য-বৃত্তিতে সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্তে রত থাকিবে, এবং বাক্য বাহু এবং উদরকে সংযত রাখিয়া শিষ্য ও পুত্রাদিকেও ধর্ম্মের অনুশাসনেই শাসন করিবে।

* * যে ৺মার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তিনি বিশ্ববিজয়িনী, তাঁহার সন্তানের বিরুদ্ধে কোন শত্রুই মাথা তুলিতে পারে না।

* * আমাদের প্রধান সম্পত্তি ৺মা। যে ৺মার মঙ্গলময়ী প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁহাকে নিঃশেষভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহার চিত্ত কখনও বিচলিত হইতে পারে না। ৺মার নিকটে আমরা শিশু, প্রকৃত মঙ্গল যে কি, তাহা আমরা জানিনা। অনেক সময়ে রাজপদের সঙ্গে

অমঙ্গল আইসে, অনেক সময়ে ভিক্ষাবৃত্তিতেও প্রচুর মঙ্গল হয়। কিসে মঙ্গল হয় তাহা যখন জানি না, তখন এটা ওটার নাম উল্লেখ না করিয়া, ৺মা যাহা মঙ্গল বলিয়া জানেন সেই অজানা মঙ্গলের জন্যই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। আপনি ৺মার উপর নির্ভর রাখিয়া নির্ভীক এবং অক্ষুণ্ণচিত্তে যথাশক্তি এবং যথাবিবেক কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে থাকুন, ৺মা অবশ্যই আপনার মঙ্গল করিবেন। মন যাহা চায় যদি তাহা না পান, তবে বুঝিবেন, ইহাতে ৺মার মঙ্গল হস্ত আছে, শিশু কাঁদিলেও তাহার উদর রোগের সময় ৺মা তাহাকে মিষ্টান্ন খাইতে দেন না।"

* * * *

"কন্যার অল্প বয়সে সন্তান হইবে বলিয়া আপনার চিন্তা কেন? যার যার কর্ম্মফল সেই সেই ভোগ করিবে; ঈশ্বরের কাজের ভার আপনি লইতে পারেন না। মনকে ৺মায়ের চরণে কেন্দ্রীভূত করুন, সব আবর্জ্জনা দূর হইয়া যাইবে।"

(১৩) বেগমপুর
২৫।৪।২২ বাং

* * * *

"অন্যকে দৈন্য জ্ঞাপন করা অথবা অন্যের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হৃদয়ে প্রবৃত্তি কিছুতেই হয় না। এ সম্বন্ধে আপনার কথা স্বতন্ত্র, কেননা আপনার কার্য্য আমার এবং আমার কার্য্য আপনার। আপনি এত জড়িত না থাকিলে, আমার কোন চিন্তাই ছিল না। তথাপি আমার হৃদয় চিন্তাশূন্য আছে, জানি না ৺মা কি উপায় করিবেন, কিন্তু তিনি বিনা ভিক্ষাতে আমার জীবনের এই কার্য্যটা সম্পাদন

করিয়া দিবেন, হৃদয়ে এইরূপ একটা প্রেরণা যেন কোথা হইতে আসিতেছে। জানি না ৺মার মনে কি আছে। * *
মনে করিয়াছি সঙ্কল্প ছাড়িব না, অথচ কেবল ৺মার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব, ইহাতে তিনি যাহা করেন।

* * * * *

বন্যার জল নামিয়াছিল, আজ তিন দিন যাবৎ বৃষ্টি-বাতাস এবং আবার জলবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে।

এ দেশের হাওরগুলি (অর্থাৎ বিলের ভিতরে যেখানে জল বেশী থাকে) তৃণ-শস্য-বিহীন সমুদ্রের মত দেখা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে গ্রামগুলি দ্বীপের মত ভাসিতেছে, এই তিন দিনের বাতাসে অনেক নৌকাডুবি ও লোক মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যাঁহার সংসার তাঁহারই ব্যবস্থা, আমাদের বলিবার কিছু নাই।"

(১৪) (আমার পত্নীর নিকট লিখিত)

বেগমপুর ২২।৩।২৩ বাং

* * * * *

"বাবার আরোগ্যলাভের জন্য বৈধভাবে যাহা কর্ত্তব্য আমি সে সমস্তই করিব। আপনি যে তাঁহার রোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, ইহা আপনার মত সাধ্বী সতীর উপযুক্ত কথাই বটে। আপনি যাহা করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার মত প্রিয় শিষ্যের জন্য আমিও তাহা করিতে পারি এবং করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ কার্য্য বৈধ নহে। জীব-ন্যাস, রোগ-

চালন প্রভৃতি কার্য্য ষট্‌কর্ম্মের অন্তর্গত। তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন, ষট্‌কর্ম্মে মহাপাপ এবং ষট্‌কর্ম্মী কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যদি ঐহিক মঙ্গলই একমাত্র মঙ্গল হইত, তবে তাঁহার জন্য বৈধাবৈধ বিচার না করিয়া সমস্তই করিতে পারা যাইত। কিন্তু মানুষের সমস্ত মঙ্গল পরলোকে। ঐহিক মঙ্গল নিতান্ত সামান্য, যাহা আছে তাহাও আমরা সকল সময়ে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ৺মা কোন্ মঙ্গল অভিপ্রায়ে কি করেন, তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। যে দক্রু রোগে কষ্ট পায়, সে অবশ্যই দক্রুর যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দক্রু নিবারণ হইলে কুষ্ঠ রোগ দেখা দিতে পারে, এই কথা যদি কোন চিকিৎসকের মুখে সে শুনিতে পায়, তাহা হইলে দক্রু নিবারণের জন্য তাহার আর কোন ব্যাকুলতা থাকে না। বাবার বর্ত্তমান কষ্টে তাঁহার কি অমঙ্গল নিবারিত হইতেছে, তাহা একমাত্র ৺মাই বলিতে পারেন।

আপনি এ সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহার আরোগ্যের জন্য একান্তচিত্তে ৺মার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকুন, ইহাই আমাদের একমাত্র অধিকার, এবং এই প্রার্থনার ফলেই ৺মা তাঁহাকে আরোগ্য প্রদান করিবেন। ধ্যান করিতে করিতে প্রার্থনা করিবেন, এবং ধ্যানের সময়ে ৺মার বরাভয় মুদ্রার দিকেই বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিবেন। মানুষ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় বিরক্ত হয়, কিন্তু সন্তানের প্রার্থনায় ৺মার বিরক্তি নাই। আপনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা এই ধ্যান এবং প্রার্থনার ভাব সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখিবেন। লৌহের উপরে চুম্বকের টান একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, কিন্তু ৺মার উপরে ভক্তের মনের টান তাহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য, তাহা অপেক্ষাও প্রবল। তাঁহাকে চিন্তা করিলে ভক্তের নিকটে তাঁহাকে আসিতেই হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু তাঁহার প্রতি যে মনের টান হয় ইহাই আশ্চর্য্য, ইহাই সৌভাগ্য

এবং ইহাই সুকৃতির ফল। বর্ত্তমানে আপনি যে ৺মার দিকে মনের এই প্রবল টান অনুভব করিতেছেন, বাবার রোগটা কি ইহার মূল নহে? ঐরূপ টান তাঁহারও হইয়াছে। অমঙ্গলকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মঙ্গলের আবির্ভাব হয়, ইহা তাহার একটা দৃষ্টান্ত। রোগ অবশ্য শীঘ্রই দূর হইবে, কিন্তু রোগের সঙ্গে সঙ্গে এই টানটাও যেন না চলিয়া যায়, সে বিষয়ে সাবধান থাকিবেন। ইহাই বিপদের সুফল।"

(১৫) বেগমপুর ৫।১১।২৩ বাং

* * * *

"আপনারও নিন্দুক আছে জানিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, কিন্তু দুঃখিত হইলাম না। নিন্দুক আমাদের উপকারী, সে আমাদের ধোপার কাজ করে। মানুষ মাত্রেরই দোষ আছে, কিন্তু কেহ তাহা উল্লেখ না করাতে আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। ইহাতে দোষ প্রচ্ছন্ন থাকে, ক্রমে চরিত্রকে মলিন করে। নিন্দুকের কথায় চরিত্রের দিকে দৃষ্টি পড়ে, কোন দোষ থাকিলে তাহা সংশোধন হইয়া যায়, তাই নিন্দুক আমাদের চরিত্রের ধোপা। ধোপা কি কম উপকারী?

কিন্তু নিন্দা শুনিয়া যদি দুঃখ হয়, ক্রোধ হয়, বা নিন্দুকের অমঙ্গল কামনা মনে আইসে, তাহা হইলে প্রকৃতই সে অনিষ্ট করিল বলিয়া জানিবেন। যখন নিন্দা শুনিবেন, তখন প্রসন্নচিত্তে হাসিবেন; আর নিন্দুকের মঙ্গল হউক, তাহার মনের কুৎসিত অবস্থা দূর হউক, এই বলিয়া ৺মার কাছে প্রার্থনা করিবেন। এইরূপ করিলে নিন্দুক আপনার বিষে আপনি ভস্ম হইবে; অথচ আপনার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না।"

(১৬) (আমার পত্নীর নিকট লিখিত)

কলিকাতা

১৬ই বৈশাখ, ১৩৩০ বাং

* * * *

"আপনার রাগ যতটা ছিল, এখন আর ততটা নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। বোধ হয়, আপনার মনে আছে আমি আপনাকে বলিয়াছি, রাগ হওয়া মাত্রেই কোন কথা বলিবেন না অথবা কোন কাজ করিবেন না। গ্রহণের সময় রাহুচণ্ডালে সূর্য্যদবকে আচ্ছন্ন করিলে সকল বস্তু যেমন তাহার ছায়া বা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেই সময়ে ৺মার নাম করা ভিন্ন সাংসারিক আর সকল কাজই অশুদ্ধ হয়। সেইরূপ রাগে যখন বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে, তখন যাহাই বলা যায় এবং যাহাই করা যায় তাহাতেই দোষ ঘটে। সেইজন্য এই মানুষিক গ্রহণটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোন কথা বলিতে বা কোন কাজ করিতে নাই।

বাবার পীড়ার বৃদ্ধির সংবাদ দিয়া, এক পত্রে ৺মাকে কিছু 'ঘুষ' দেওয়ার কথা লিখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমার মত আপনাকে জানাইতে পারি নাই। সাংসারিক ভাবে লোকে দেবপূজাকে ঘুষের চক্ষেই দেখে, কিন্তু আপনার চক্ষের দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল করিতে হইবে, সাংসারিক দৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা দেখিলে চলিবে না। ৺মাকে মা বলিয়া ডাকেন—মুখে না মনে-প্রাণে, অন্তরে ডুব দিয়া তাহা দেখিতে হইবে। নিজের কাজ হাসিল করিবার জন্য ডাক্তার, পুলিস, রাজকর্ম্মচারী, প্রভৃতিকে ঘুষ দিতে হয়; কিন্তু আপনার গর্ভধারিণীকে কোন কাজে ঘুষ দিতে হইবে, একথা আপনার প্রাণে স্বপ্নেও কোনদিন জাগিয়াছিল কি? যদি মানুষ-মাকে ঘুষ দিবার কথা মনে না আইসে, তবে যিনি নিদ্রায় জাগরণে দেশে বিদেশে

সম্পদে বিপদে আমাদিগকে সর্ব্বদা কোলে লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, সেই জগজ্জননীকে ঘুষ দেওয়ার কথা মনে কেন আসে? ইহার কারণ, আমরা তাঁহার নৈকট্য অনুভব করিতে পারি না, তাঁহাকে দূরস্থ, পর মনে করি; তাই তাঁহাকে ঘুষ দিয়া বা ফাঁকি দিয়া নিজের কার্য্য উদ্ধার করিতে চাই। ৺মা যে আমার চেয়ে আমার মঙ্গলামঙ্গল বেশী বুঝেন, ভবিষ্যৎ বেশী দেখেন এবং আমাকে সুখে রাখিবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, ইহা আমরা বুঝি না; তাই যাহাকে বিপদ মনে করি তাহা দেখিলেই ব্যস্ত হইয়া পড়ি এবং তাঁহাকে ঘুষ দিতে চাই। পূজার অর্থ ঘুষ নহে, হৃদয়ের শ্রদ্ধা। আমার অমুক কার্য্য সিদ্ধ হইলে ৺মাকে ভাল করিয়া পূজা দিব, এইরূপ মানস করাকে ঘুষ বলা যায়, কারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সে পূজাটী দেওয়া হয় না। প্রার্থনা করা মানুষের স্বভাব, ভালমন্দ না জানিলেও শিশু মার কাছে প্রার্থনা করে, কেহ তাহাকে ইহা শিখাইয়া দেয় না। সেই প্রার্থনার সময়ে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত ৺মার চিত্তকে আকর্ষণ করা, ইহাই পূজার প্রকৃত অর্থ। আমি নিতান্ত গরীব, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার দিয়া ৺মাকে সন্তুষ্ট করি, এ আকাঙ্ক্ষা আমার হয় বটে, কিন্তু তাহা পাই কোথা? সেই জন্য সুন্দর ফুল, বেলপাতা, চন্দন, অভাবে চক্ষের জলই আমার পূজার উপকরণ, কিন্তু একজন রাজার পক্ষে তাহা নহে, এইজন্যই যথাশক্তির উল্লেখ এবং বিত্তশাঠ্যের নিষেধ। যখনই ৺মার সন্তোষ বিধান করিতে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে, তখনই যথাশক্তি উপহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন, ইহাই তাঁহার পূজা। কাঙ্গালের পূজা বিল্বপত্র এবং ধনীর বহুমূল্য উপকরণ; ৺মার কাছে উভয়ই তুল্যমূল্য, মূল্যের তারতম্য কেবল শ্রদ্ধা এবং অশ্রুজলে। কোন শিশু আমতলায় এক ভক আম পাইয়া যদি উহাকে পাকা আম মনে করে, এবং আমটা লইয়া মার কাছে দৌড়াইয়া যাইয়া বলে 'মা, এই পাকা আমটা কাটিয়া

তুইও খা এবং আমাকেও দে' তাহা হইলে সেই অকিঞ্চিৎকর বস্তু হাতে লইয়া ৺মার প্রাণে তখন কি আনন্দ হয়, তাহা আপনি অনুভব করিতে পারেন। ভক্তের পূজাও ঠিক এইরূপ, মনে রাখিবেন; কার্য্য উদ্ধারের জন্য মার মনস্তুষ্টি, মনে করিবেন না। বিপদের সময় যে ৺মাকে ডাকি এবং ৺মার পূজা দেই, তাহা ঘুষ নহে, বিপদের সময়ে ৺মাকে ডাকিয়া এবং ৺মার অর্চ্চনা না করিয়া আর উপায় নাই, তাই এসব করি। বিশ্বাসী ভক্তের এইটা প্রকৃতিগত।

বাবার অসুখে আপনি অধৈর্য্য হইয়াছেন, কিন্তু আমি ধৈর্য্য হারাই নাই; আমার বিশ্বাস আছে, ৺মা এই বিপদ দূর করিবেন এবং বাবাকে উচ্চ সম্মানের পদে বসাইবেন। মনে করিতে পারেন, ৺মাকে ডাকিয়া কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। স্থানে এবং কালে আমাদের দৃষ্টি অতি সীমাবদ্ধ। আমরা কেবল নিকটে এবং সম্মুখেই কিছু দেখিতে পাই, কিন্তু পিছনে এবং দূরে কি ঘটিতেছে বা ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই দেখিতে পাই না, সব বিষয়ে ৺মার হাতে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। উপস্থিত সামান্য অমঙ্গল দ্বারা যে গুরুতর অমঙ্গল দূর হয় নাই, তাহা কেমন করিয়া বলিবেন? বাবা যে এবার কষ্ট পাইবেন, মালা ছিঁড়িয়া ৺মা তাহা আগেই বলিয়া দিয়াছেন। মালা ছিঁড়াতে আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল, কিন্তু ৺মা যে ভাবে বাবাকে নিরাপদে কোলে রাখিয়া চালাইতেছেন, তাহাতে আমার খুব সাহস হইয়াছে।

আপনারা উভয়েই একত্র বসিয়া জপ পূজা করিবার অভ্যাস করিবেন। কার্য্য বাহুল্যের জন্য না ঘটে, রোজ আধ ঘণ্টা, পনর মিনিট বা অন্ততঃ পাঁচ মিনিট একত্র বসিবার ব্যবস্থা কি হইতে পারে না? ইহাতে উভয়েরই যথেষ্ট উপকার আছে। অবশ্য গুরু যখন নিকটে থাকেন, তখন এ সকলের প্রয়োজন হয় না, গুরুর সেবাতে সকল কার্য্য

সিদ্ধ হয়, কিন্তু গুরু যখন দূরে থাকেন তখন এ কার্য্যটী অপরিহার্য্য। তিন বেলা না হয়, দুই বেলা হউক, এক বেলা হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই।”

(১৭) কলিকাতা।
২৫শে আষাঢ়,
১৩৩০ বাং

*   *   *   *   *

“গত বুধবার আমি মাকড়দা (হাওড়া আম্‌তা রেলের উপর) গিয়াছিলাম, এবং বুধবার সন্ধ্যার সময় হইতে শনিবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তথাকার নির্জ্জন শ্মশানে আসন পাতিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে অন্নজল গ্রহণ করি নাই, তামাক পর্য্যন্ত খাই নাই এবং কথাও বলি নাই। ইহাতে আমার কোন অসুখ বা কষ্ট হয় নাই, মনে বেশ শান্তি পাইয়াছি। * * শ্মশানে থাকিতে বৃষ্টিতে কিছু কষ্ট দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমি আসন ত্যাগ করি নাই, অথবা তাহা স্থানান্তরিত করি নাই। বৃষ্টি এবং মশার হাত হইতে রক্ষা পাইলেই শ্মশানে আমি মনের সুখে কাজ করিতে পারিব।

একদিন তারাপদ বাবুকে লইয়া কেওড়াতলায় গিয়াছিলাম। সেখানে সুবিধামত স্থান পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তেমন নির্জ্জনতা পাওয়া যাইবে না। * *

* মৌনী থাকা বড় সুবিধা। কথাবার্ত্তা বলিলে সাধু বলিয়া লোকে মনে করে, এবং রোগ কিসে যায় ও টাকা পয়সা কিসে হয় জানিবার জন্য দিবারাত্রি স্ত্রী পুরুষ নানালোকে উৎপাত করে।

আমার যখন সে বিষয়ে কাহারও কোন উপকার করিবার শক্তি নাই, তখন মৌনী থাকা সুবিধা। মধ্যে মধ্যে ঐরূপ কোন স্থানে থাকি,

এবং মধ্যে মধ্যে আপনাদের কাছে আসি এবং কাশীতে যাই, এইরূপে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে পারিলে মন্দ হয় না। * * *

* * শ্মশানে আশ্রয় লইয়া প্রথমে জগতের মঙ্গলের জন্য এবং ভারতের উদ্ধারের জন্য পুটিত শত চণ্ডীপাঠের স্বস্ত্যয়ন করিব, মনে করিতেছি।"

(১৮) ৺কাশীধাম।

* * * *

"৺মার কাছে আমাদের অপরাধের সীমা নাই। জানা অপরাধ যত, অজানা অপরাধ তাহার শতগুণ, কিন্তু সন্তানের অজ্ঞান এবং দুর্ব্বলতা জানিয়া শুনিয়াই ৺মা তাহা গ্রহণ করেন না, করিলে সন্তানের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইত, তবে যথাশক্তি জপ পূজাটা ৺মা চাহেন এবং তাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন। * * * * সংসারে অর্থ উপার্জ্জন হয় এবং ব্যয় হইয়া যায়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নানা পথেই অর্থ ব্যয় হয়, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ব্যয়ই মজুত থাকে, কিন্তু রাজসিক এবং তামসিক ব্যয়ের ফল মনের ক্ষণিক সুখ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইষ্ট দেবতার প্রীতি, গুরুদেবের প্রীতি এবং বিপন্নের দুঃখমোচন করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক এবং তাহাই কর্ত্তব্য। * * * * শ্রদ্ধা এবং সন্তোষের সহিত যখন যাহা দিতে পারেন তাহাই দিবেন। * *

ধর্ম্মরাজ্যে আত্মসমর্পণই প্রধান কার্য্য। বাবার হাতে দ্বিধাশূন্য চিত্তে আত্মসমর্পণ করুন, ৺মার চরণে আত্মসমর্পণ আপনা হইতেই আসিবে, তাহা হইলে মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। মানুষের সাধনভজনের ইহাই চরম।"

একাদশ অধ্যায়।

আমি পূর্ব্বে ৺গুরুদেবের দীক্ষাগুরুর কথা জানিতাম না। দেহত্যাগের পূর্ব্বে যখন তিনি আমার কলিকাতাস্থ বাটীতে ছিলেন, তখন তাঁহার গুরু ভাই শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ মহাশয় ও চিরকুমার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয়। পরে উক্ত দুর্গানাথ বাবু পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামানন্দ মহাশয়ের জীবনী লেখার সময় জানিতে পারিলাম, যে উক্ত স্বামী রামানন্দই উহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন। সেই সময়েই ৺গুরুদেবের ব্যবহৃত একখানি পুস্তকে ৺কালীমাতার প্রতিমূর্ত্তির সহিত এক সাধুপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি আটার দ্বারা জোড়া দেখিতে পাই। দুর্গানাথ বাবুকে ঐ সাধুর প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলে তিনি বলিলেন, উহাই তাঁহাদের গুরুদেব স্বামীজীর মূর্ত্তি। দুর্গানাথ বাবু স্বামী রামানন্দের জীবনীতে ৺গুরুদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

৺গুরুদেব যে গুরুর দ্বারা পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখনও মুর্শিদাবাদ জেলায় জীবিত আছেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম উমানন্দ। তিনি নীরব সাধক ছিলেন এবং তাঁহার সাধন সম্পদের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। তিনি কয়েক মাস পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন ভুলুয়া বাবা বলিয়া এক সাধক তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন।

৺গুরুদেব ১৩১৫ সালে "নীতিহার" আখ্যা দিয়া সংস্কৃত ভাষায় ১০৮টী শ্লোক রচনা করেন, এবং উহা মহামহোপাধ্যায় ৺যাদবেশ্বর তর্করত্নের নামে উৎসর্গ করেন। শ্লোকগুলি আধুনিক চাণক্য শ্লোক

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা হইতে ২।৪টী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"সাধনং পৌরুষং মন্যে সাধনং পরমং বলম্।
সাধনেন বিহীনস্য জীবনং শ্বাসমাত্রকম্॥"

"নিদ্রালস্যমনুৎসাহঃ সন্দেহো দীর্ঘসূত্রিতা।
সমাশ্রয়ন্তি যং তস্য জীবনং মরণোপমম্॥"

"ধার্ম্মিকস্য ভয়ং পাপাৎ ধনিনোধন লাঘবাৎ।
সংযমিনো ভয়ং লোভাৎ ভয়ং মূর্খস্য সর্ব্বতঃ॥"

"বহুনা তপসালব্ধা মানুষং জন্ম দুর্লভম্।
স্ত্রীসেবাহারনিদ্রাভির্মূঢ়ৈস্তৎ গমিতং বৃথা॥"

"কার্য্যকালে সমায়াতে কর্ত্তব্যবিমুখা যদি।
চৌরে পলায়িতে যত্নৈঃ কিং করিষ্যতি বর্ব্বরঃ॥"

"ধ্যানং সঞ্জায়তে নৃণাং ঈশ্বরে বাথ নশ্বরে।
ঈশ্বরে মুক্তিদং জ্ঞানং নশ্বরে নাশকারণম্॥"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় "নীতিহার" সম্বন্ধে "কমলায়" এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"সাধক সুকবি শরচ্চন্দ্রের 'নীতিহারে'র শ্লোকগুলি শ্রবণ করিলেই মনে হয় ইহা ঋষিবচন। নিজে সত্যের অনুভব না করিলে এমন প্রাণস্পর্শী সরল ভাষায় ঐরূপ সত্য ব্যক্ত করা যায় না। শরচ্চন্দ্রের সাধনা ও সত্যানুভবের সংমিশ্রণে তাঁহার কবিত্বশক্তি কিরূপ সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার মনীষা ও চিন্তাশক্তি কিরূপ সফল হইয়াছে এবং জগতের কিরূপ উপকার করিয়াছে, তাহা পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন।"

১৩০৭ সালে ৺গুরুদেব কৃত "দেবীযুদ্ধ" প্রকাশিত হয়। তিনি তখন শ্রীহট্ট মৌলভীবাজারে হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। ইহার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি নিজ বাড়ী বেগমপুরে অবস্থান করেন, তখন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। উহা এক অদ্ভুত গ্রন্থ। ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথাই উহাতে আছে। উহাতে সাধনার কথা অনেক পাওয়া যায়। যখন দেবগুরু বৃহস্পতি স্বয়ং ব্রতী হইয়া দেবতাবৃন্দকে মহাশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত করেন, তখন সাধনার পথে কি কি বিঘ্ন পরে পরে উপস্থিত হইয়াছিল এবং দেবগুরু কি ভাবে ঐ সকল বাধা অপসরণ করাইয়াছিলেন, তাহা সাধকদিগকে বিশেষ আকৃষ্ট করিবেই। ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর যে কয়েকটী স্তব আছে সে কয়েকটীর ভাব সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া অতি সুন্দরভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে। যে কোন ধর্ম্মপ্রাণ পাঠক "দেবীযুদ্ধে" ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমস্তকথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হইবেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ ৺যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় 'দেবীযুদ্ধ' সম্বন্ধে বলিয়াছেন "আমার দৃষ্টিতে কোন বঙ্গীয় কবির ছন্দ ও অলঙ্কার-পতন এবং ব্যাকরণগত দোষ এড়াইতে পারে নাই, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় 'দেবীযুদ্ধ' পুনঃ পুনঃ পড়িয়া একটী দোষও বাহির করিতে পারি নাই। বাঙ্গালার তিনচন্দ্রের (হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, শরৎচন্দ্র) মধ্যে এই চন্দ্রই (অর্থাৎ শরচ্চন্দ্র) আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এমন তাল-মান-লয় বিশুদ্ধ কাব্য আমার চক্ষে পড়ে নাই।"

সাহিত্যিক প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ১৩০৮ সালের 'প্রদীপ' পত্রে "দেবীযুদ্ধ" সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ইহা ভক্ত হৃদয়ের স্বাধীন উচ্ছ্বাস, সুতরাং সমালোচকের অধিকারের অন্তর্গত নহে।"

"দেবীযুদ্ধে" দেবদানবের মধ্যে যুদ্ধের কথা আছে। দানবের রাজত্ব

সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া কাব্যকর্ত্তা যে সব ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, দেবদানবের সম্বন্ধের কথা বলিতে গিয়া যে জাতীয় ভাবের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। দেবীর শ্রীমুখ হইতে যে ভুবনবিজয়মন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহা অদ্ভুত। মহাশক্তির দুই পরিচারিকা জয়া বিজয়ার মুখ দিয়া যে তর্ক বা ভক্তির কথা প্রকাশ হইয়াছে তাহাও অতিঅদ্ভুত। বিজয়া বলিতেছে,—

"কি জানি মা! তব বুঝিনা বিধান!
এত দয়া তব দেবতার প্রতি;
দানব কি তব সপত্নী সন্তান?

তবে কেন মাগো! দানবে না চাহি,
দেবতার লাগি কাঁদে তব প্রাণ?

দানব কি কভু ডাকে না তোমারে?
মাগো! সে কি পদে অর্পেনা অঞ্জলি?

পড়িলে বিপদে দানবের প্রাণ
কাঁদেনা কি ডাকি বিশ্বমাতা বলি?

বিশ্বজুড়ি জীব পায় ও চরণ
ডাকিলে বিপদে হইয়া কাতর,

সকলেই তব আদরের ধন,
শুধু কি জননী! দৈত্য তব পর?"

জয়ার কি বলিবার আছে জিজ্ঞাসা করিলে, জয়া বলিল,—

"জানিনা রে বাছা!" উত্তরিল জয়া,
"বচন-বিন্যাস বিস্তর জানিনা,
খাই দাই সুখে, থাকি মার কোলে,
বিশ্বের সংবাদ কিছুই রাখি না।

দয়া মায়া মার আছে কিবা নাই,
বিচার করিতে আমি তার কে?
ধরিল যে বিশ্ব আপন উদরে,
ভালমন্দ তার জানে না কি সে?

সন্তানের কাজ, খাই দাই, খাটি,
ব্যাকুল হইলে মা বলিয়া ডাকি,
আনন্দময়ীর আনন্দ বদনে
আনন্দের হাসি প্রাণভরে দেখি।

হাসিয়া কহিলা জগৎ-জননী,
"হইল না বুদ্ধি অবোধ জয়ার,
সৃষ্টির ব্যাপারে ভালমন্দ বাছি
জন্মিল না বুদ্ধি সমালোচিবার!

বিজয়া আমার বড় বুদ্ধিমতী,
প্রত্যেক কাজে সে ভাল মন্দ বাছে,
সৃষ্টির ব্যাপারে যুক্তিহীন কিছু
করিলে, নিস্তার নাই তার কাছে।

শুন তবে, বলি, বিজয়ে! আমার
নিজ পর বলি নাই ভেদ-জ্ঞান ;
আমিই করেছি সৃষ্টি সবাকার,
সকলেতে মম মমতা সমান।

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব,
পশু, পক্ষী, কীট, কেহ পর নয়,
পরের লাগিয়া কহ লো বিজয়ে!
এমন ব্যাকুল কাহার হৃদয়?

বিশ্বের ভিতরে হেন কেহ নাই
ডাকিলে যে জন আমারে না পায় ;
চিনেনা শুনেনা, ডাকিতে জানেনা,
এমন জনে বা ছেড়েছি কোথায়?

জননীর সঙ্গে সন্তানের কভু
চলিতে পারে না স্নেহ-বিনিময়,
জানে বা না জানে, ডাকে বা না ডাকে,
জননীর স্নেহে বঞ্চিত সে নয়।

তবে কেহ সুখী কেহ দুঃখী কেন?
কেন ছোট বড় একই জাতিতে?
কেন এ বৈচিত্র্য, কেন এত ভেদ,
এমন বৈষম্য কেন এ জগতে?

কারণ ইহার শুধু কর্ম্মফল,
কর্ম্মডোরে বাঁধা রয়েছে জগৎ,
কর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ-ভোগ,
কর্ম্মে ক্ষুদ্র কেহ, কেহ বা মহৎ।

জাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব, দৈত্য, নর,
কর্ম্মে ইহাদের আছে স্বাধীনতা,
পারে বা না পারে, আছে ইহাদের
বিশ্বের মঙ্গলে খাটিতে ক্ষমতা।

ভাল মন্দ কর্ম্মে সঙ্কল্পই মূল,
মঙ্গল সঙ্কল্পে খাটে যেই জন
অক্ষয় মঙ্গল তারে করি দান,
দেখি না, কার্য্য সে করিল কেমন।

শুভ সঙ্কল্পের এই স্বাধীনতা
দেব দৈত্য নরে করিয়াছি দান,
না পাইলে তাহা হইত ইহারা
পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সমান।

এই স্বাধীনতা পৌরুষ-জননী,
শুভাশুভ দুই পৌরুষের ফল,
পরম পৌরুষ আত্ম-বিসর্জ্জন,
পরম সাধন বিশ্বের মঙ্গল।

স্বাধীনতা দৈত্যে করিয়াছি দান,
জীব-নাশ তরে সৃজি নাই তারে,
তথাপি, দেখনা, নিত্য সে করিছে
কত অত্যাচার জীবের উপরে।

আহারে, বিহারে, আমোদের তরে,
জীব-হত্যা নিত্য করিছে দানব ;
অত্যাচার তার সহিতে না পারি
অস্থির হয়েছে দেবতা মানব।

করিয়া দৈত্যেন্দ্র স্বাধীনতা লাভ,
করেছে তপস্যা সৌভাগ্যের তরে ;
করিতেছে ভোগ পুরুষার্থ-ফল,
অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছি তাহারে।

অকারণে জীব হিংসিয়া দনুজ
করিছে যখন বিশ্বের পীড়ন,
সহিয়া থাকিতে পারি না ত আর,
শুনিতে পারি না জীবের ক্রন্দন।

জীবের মঙ্গলে বিশ্বের মঙ্গল ;
বিশ্বের মঙ্গল অন্য কিছু নয় ;
জীব-রক্তপাতে কলঙ্কিত যেই,
বিশ্ব-হিত তা'তে সম্ভব কি হয় ?

বিশ্ব-হিতে জাগে প্রবৃত্তি যাহার,
আমা প্রতি ভক্তি জাগে যার প্রাণে
পারে না সে কভু নির্দ্দয় হইতে,
পারে না সে কষ্ট দিতে অন্য জনে

পশু, পক্ষী, কীট, কেহ নহে পর
দেবঁতা-মানবে অনুরাগ তার ;
পরের লাগিয়া সতত ব্যাকুল,
বিশ্ব-হিতে মত্ত অন্তরাত্মা যার।

বিশ্বহিত সদা বিস্মৃত দানব;
পরহিংসা তার হয়েছে প্রকৃতি ;
না করিলে রক্ষা দৈত্য-অত্যাচারে,
বিপন্ন বিশ্বের কি হইবে গতি ?

আছি প্রতিশ্রুত দেবতার কাছে,
দানবে বিপত্তি ঘটাবে যখন,
নিজে অবতীর্ণ হইয়া ধরায়,
করিব সে ঘোর বিপত্তি মোচন।

ডাকিছে দেবতা, কাঁদিছে মানব,
উঠিতেছে সদা শূন্যে হাহাকার ;
হইয়া একাংশে অবতীর্ণ তথা,
এ বিশ্ব কণ্টক করিব উদ্ধার।"

দেবগুরু বৃহস্পতির মুখ দিয়া একস্থলে বলাইয়াছেন :—

"মন্ত্ররূপ মহাশক্তি, ভক্তাধীন মাতা,
ভক্তি-মন্ত্র-যোগে তিনি প্রসন্না নিশ্চিত।

মন্ত্র তাঁর কৃপা-বীজ, মন্ত্র তাঁর ভাষা,
মন্ত্রে তাঁর আরাধনা, মন্ত্রে পরিতোষ ;
বিনা মন্ত্রে অসম্ভব শক্তির সাধনা ;
মন্ত্রহীন অনুষ্ঠানে ঘটে নানা দোষ।"

জগন্মাতা স্বয়ং বলিতেছেন :—

"অনন্ত সম্বন্ধ সৃষ্টিতে আমার,
আছে বিশ্ব যুড়ি অনন্ত বন্ধন ;
কিন্তু মাতৃ-সুত সম্বন্ধের মত
নাহি আর কিছু মধুর এমন !

বহু যপ, তপঃ, যজ্ঞ, পরিশ্রমে
অন্য সাধনেতে সিদ্ধি লাভ হয় ;
ডাকিলেই সিদ্ধি মাতৃ সাধকের,
জন্মিয়াই শিশু লভে সে প্রত্যয়।" .

"দেবীযুদ্ধ" প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী থাকা সত্বেও, সাধক শরচ্চন্দ্র কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই ; তার প্রধান কারণ এই, তাঁহার উপর ৺লক্ষ্মীর কৃপা ছিল না। "দেবীযুদ্ধ" লেখার সময় ৺জগজ্জননী তাঁহার লেখনী যে ভাবে চালাইয়াছিলেন, সেই ভাবেই লেখা হইয়াছিল, সুতরাং উহা একরূপ ভাবাবস্থাতেই লেখা। ৺গুরুদেব বলিয়াছিলেন, "দেবীযুদ্ধের"

কোন অক্ষর তিনি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। কেবলমাত্র তিনি একটী ভূমিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহাই প্রকাশিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

৺গুরুদেব "দেবীযুদ্ধ" সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন :—

"অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিলাম, দুর্গোৎসবের সময়ে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ঘরে ঘরে পঠিত হয়, কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ছাড়া অন্যে তাহা বুঝেনা। যদি প্রাতঃস্মরণীয় কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাসের রীতি অনুসরণ করিয়া দেবীচরিত লেখা যায়, তবে অন্ততঃ দুর্গোৎসবের সময়ে লোকে ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিতে পারে। এই ভাবনাটা কিছু দৃঢ় হইলে. ১৩০২ সালের আষাঢ়ী শুক্লা ত্রয়োদশীতে লেখনী লইয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিলাম—তখন জানি নাই যে, ঐ তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনটা যেরূপ ব্যর্থ হইয়াছে, "দেবীযুদ্ধ"ও সেইরূপ বিফল হইবে! মধ্যে মধ্যে নানা অন্তরায় ঘটে, মধ্যে মধ্যে লিখি, ছাপাখানার খরচ কিরূপে জুটিবে, মধ্যে মধ্যে সে চিন্তাও করি; এইরূপে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া ১৩০৩ সালের ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশীতে গ্রন্থ সমাপন হইল।

"কিন্তু যে দিন হইতে "দেবীযুদ্ধ" লিখিতে আরম্ভ করিলাম, সেই দিন হইতে একটা অভিনব রোগ দেখা দিল। সে রোগটা যে কি, আজিও তাহা বুঝিতে পারি নাই। লেখনী হস্তে লইয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিলেই প্রাণটা যেন অস্থির হইয়া উঠিত, সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ, হস্তে কম্প, চক্ষে অশ্রু দেখা দিত। একদিন দুই দিন নহে, "দেবীযুদ্ধ" লিখিতে বসিলেই এই অবস্থা হইত। অথচ অন্য লেখাপড়ায় যখন বসিতাম, তখন এসব কিছুই থাকিত না, তখন স্থির, ধীর, শান্ত! হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলেও হিষ্টিরিয়ার সকল লক্ষণ ইহাতে ছিল না, সুতরাং ইহাকে ঠিক হিষ্টিরিয়া বলিতে পারি না।"

রাজসাহী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ৺কুঞ্জলাল গুপ্ত মহাশয়ের "মধুরূপা বা জীবনযজ্ঞ" ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার ভূমিকা ৺গুরুদেবের দ্বারা লিখিত। ঐ ভূমিকাতে লিখিয়াছেন,—"সাধন-ভজনের কথা গোপন রাখিবার উপদেশ তন্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে প্রায় প্রত্যেক কথায় রহিয়াছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও বলে,—"আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা।" ইহার আর যে কারণই থাকুক, প্রকাশে যে বিঘ্ন ঘটে এবং মনে অশান্তি আনয়ন করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তন্ত্র-শাস্ত্রের অনেক স্থানেই আছে,—'প্রকাশে সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।'

* * * *

"পাশ্চাত্যদেশে কেহ কিছু প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিলে, তিনি অমনি তাহা লিখিতে বসিয়া যান, যাহার তাহার কাছে বলিয়া বেড়ান, এমন কি কেহ তাহা অসম্ভব বা অযৌক্তিক বলিলে তর্ক-যুদ্ধে লাগিয়া পড়েন। আপন উক্তির সংস্থাপন করিতেই হইবে, তাহার জন্য যুক্তি বা সমর্থন যেখানেই পাওয়া যাউক। এই প্রণালী সাধনের অন্তরায়। * * * ইহাতে মনোবৃত্তি বহির্মুখীন হইয়া পড়ে, সাধনে সিদ্ধির জন্য যে অন্তর্মুখীনতার প্রয়োজন, তাহা থাকে না।

"প্রাচ্যদেশে, বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে, এ প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার রীতি, সাধন-লব্ধ সম্পদ্ ভক্ত বিশ্বাসী বা শিষ্য ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না। উপদেশ সম্বন্ধেও এই কথা; যে শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ গ্রহণ না করিয়া যুক্তি তর্কের অবতারণা করিবে, তেমন অভক্ত বা অশিষ্যকে তত্ত্ব-উপদেশ দিবে না। এই কারণেই ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা অতি গুহ্য। * *

"এই গুহ্য-বিদ্যা প্রধানতঃ উপদেশাত্মক, কিরূপ অভ্যাস করিলে কি প্রকার শক্তি লাভ হয়, ইহাই যোগশাস্ত্রের উপদেশ, কিরূপ ক্রিয়া করিলে কি প্রকার ফল পাওয়া যায়, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশাসন। এই অভ্যাস এবং ক্রিয়া লইয়া উপদেষ্টা উপদিষ্ট উভয়েই ব্যস্ত, কিন্তু তাহার ফল বা সিদ্ধি লইয়া কাহারও ব্যস্ততা নাই। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই অন্নের প্রয়োজন, অন্নের জন্যই জল, তণ্ডুল ও ইন্ধনাদির আয়োজন। যতক্ষণ ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই, ততক্ষণই পাকের উদ্যোগে দৌড়াদৌড়ি, কিন্তু যখন ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন আর কে দৌড়াদৌড়ি করে? সাধনেও এইরূপ। সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্তই যত উপদেশ, যত অভ্যাস, যত আলোচনা, কিন্তু যখন সিদ্ধিলাভ হইল, প্রাণের ক্ষুৎপিপাসা মিটিল, তখন আর উপদেশ, অভ্যাস বা আলোচনার প্রয়োজন কি? এই জন্যই আর্য্যদিগের অধ্যাত্মশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ বহু গ্রন্থ আছে, কিন্তু সিদ্ধি লাভের পরবর্ত্তী ঘটনার বর্ণনাযুক্ত কোন গ্রন্থ নাই। অনেক স্থলে অনেক মহাপুরুষের জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গাধীন মাত্র, সিদ্ধাবস্থার বর্ণনার উদ্দেশ্যে নহে।"

১৩৩০ সালে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত "রামপ্রসাদ"গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার ভূমিকা ৺গুরুদেব ১৩৩০ সালের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। উহাতে নানারূপ তত্ত্বকথা ব্যক্ত আছে, এবং তাহা হইতে ভূমিকা-লেখকের মনের ভাব ও সাধনার কথা কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ঐ ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। ঐ ভূমিকার প্রথমেই এইরূপ আছে, "ভক্তজীবনী, ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিশেষতঃ ভক্তের নিকট অতি আদরের বস্তু, ভবরোগক্লিষ্ট বদ্ধজীবের পক্ষে অতি উপকারী পথ্য।" কিন্তু 'প্রকৃত ভক্তের প্রকৃত জীবনী

সংগ্রহের নানা অন্তরায়।' "ত্যাগ ও অন্তরায়ের পথে না চলিলে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। এই মার্গের পথিক সাংসারিক সকল বিষয়েই নিজের জন্য আস্থাশূন্য, সকল ব্যাপারই তিনি অনুরাগের পাত্রের জন্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। * * *

কেবল আহার নিদ্রা প্রভৃতি অনিবার্য্য কার্য্য কথঞ্চিৎরূপে সংসারে সম্পাদন করিয়া প্রায় সর্ব্বদা তিনি অধ্যাত্মজগতেই বাস করেন।"

এই সমস্ত কথাগুলি স্বয়ং লেখকের (সাধক শরচ্চন্দ্রের) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য। ৺গুরুদেব আসন-সিদ্ধও ছিলেন। যখনই বসিতেন আসন আপনাপনি হইয়া যাইত। সর্ব্বদাই মা জগদম্বার চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন ; অথচ কাহাকেও কিছু জানিতে দিতেন না। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "ভক্তের হৃদয়ে যে আনন্দ লহরী নিয়ত খেলা করিতেছে, তাহার হিসাব রাখিবার তাঁহার অবসরই বা কোথায়, আর প্রয়োজনই বা কি ?"

তিনি আরও বলিয়াছেন—"অনুরক্ত ভক্ত কেহ সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া যদি সাধক-জীবনের ছবি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা সমাজের নিকট কতকটা অধিগম্য হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ অনুরক্ত ভক্ত অতি বিরল।" আমি কার্য্যবশতঃ সর্ব্বদা গুরুদেবের নিকট থাকিতে পারিতাম না, এবং নিজ হাতে লেখার অসুবিধা থাকায়, আমিও আমার কর্ত্তব্য কার্য্য অর্থাৎ সাধক (৺ গুরুদেবের) জীবনের ছবি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা সমীচীনভাবে করিতে পারিলাম না।

সাধন সম্বন্ধে ৺গুরুদেব ঐ ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন, "সাধনের তিনটী স্তর। প্রথম স্তরে তত্ত্বান্বেষণ। সাধন কি, সাধ্য কে, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ কি, সাধনের প্রয়োজন কি, ইত্যাদি প্রশ্ন প্রথমাবস্থায় জিজ্ঞাসুর চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। যখন এই সকল প্রশ্নের সমাধান হয়, তখন সাধক বুঝিতে পারেন, সাধ্য-

বস্তু "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই অবস্থায় সাধ্য প্রথম পুরুষ, অবধারিত বস্তু।

"দ্বিতীয় অবস্থায় সাধ্যের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধস্থাপন এবং আত্মীয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা। এই অবস্থার সাধন মন্ত্র 'তৎ-ত্বমসি'। যিনি প্রথম-পুরুষরূপে অবধারিত হইয়াছিলেন, তিনি এখন মধ্যম পুরুষরূপে প্রত্যক্ষী-ভূত হইলেন। সাধনের চরম পরিণতি, অর্থাৎ প্রকৃত সিদ্ধির অবস্থায় এই ব্যবধানটুকুও দূর হইয়া যায়, সাধক তখন 'সোহং' মন্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাদ্য একাত্মভাবে আপনাতে জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন।

" 'তৎসৎ', মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস হইলেই সাধনের আরম্ভ হয়, আর একাত্ম বা 'সোহং' জ্ঞান জন্মিলেই তাহার নিবৃত্তি হয়। সাধ্য যে কাল পর্য্যন্ত প্রথম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষরূপে অবস্থান করেন, ততদিন উপাসনা; যে মুহূর্ত্তে তিনি উত্তম পুরুষরূপে উপলব্ধ হন, যে মুহূর্ত্তে তিনি, তুমি এবং আমি এক হইয়া যায়, তিনি, তুমি এবং আমি এই তিনের প্রভেদ জ্ঞান থাকে না, সেই মুহূর্ত্তেই সাধনা বা উপাসনার সমস্ত প্রয়োজনের পর্য্যবসান হয়। তখন সাধক পরমহংস, সাধন ভজন, জ্ঞান বিজ্ঞান, ব্রত নিয়মের অতীত পুরুষ.।

"মানব অনন্ত, জগদম্বার মূর্ত্তি বা ভাবও অনন্ত। সাধকের শক্তি, বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি লইয়াই উপাসনা। ঈশ্বরের অনন্তশক্তি এবং অনন্ত ভাব অগ্রে উপলব্ধি করিব, তাহার পরে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইব, একথা যে ভাবে, তাহার উপাসনা হয় না। যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবে, সেত ঈশ্বর হইতেও বড়; সুতরাং তাহার আর উপাসনা কি? সাধক হইতে

সাধ্য চিরদিনই বড়, সকল প্রকার সাধনের মূলেই এই ভাব। সাধ্য আছেন, আমি আছি এবং সাধ্যের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই জ্ঞান বা বিশ্বাসই সকল প্রকার সাধনের মূল সূত্র। এই সূত্র ধরিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেই সেই সম্বন্ধ ক্রমশঃ গাঢ়তর হইবে, এবং সেই গাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যের উপলব্ধি বিভূতিলাভ করিয়া আমাকে ধন্য করিবে, এই আশাই সাধকের প্রথম সম্বল।

* * * *

"প্রথমেই আকাঙ্ক্ষা হয়, আমার প্রিয়তমকে আমি কি বলিয়া ডাকিব। তখন সমাজ খুঁজিয়া বেড়াই, পরিবার খুঁজিয়া বেড়াই, অভিধান খুঁজিয়া বেড়াই, হৃদয়ের ভিতরে খুঁজিয়া বেড়াই, কি বলিয়া প্রিয়তমকে ডাকিলে আমার প্রাণ শীতল হইবে। প্রত্যেকের হৃদয়ের অবস্থা অনুসারে সম্পর্ক নির্ণীত হয়, ডাক নির্ব্বাচিত হয়। এই কারণেই হিন্দুদিগের মধ্যে মাতৃভাব, পিতৃভাব, পুত্রভাব, গুরুভাব প্রভৃতি নানা ভাবের সাধন-প্রণালী প্রচলিত।

"মানব জীবনে যত প্রকার সম্বন্ধের অভিজ্ঞতা আছে, তন্মধ্যে মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। আর কাহারো দ্বারা সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূর হইতে পারে না, কেবল মাতাই তাহার সকল প্রকার অভাব দূর করিতে পারেন। শিশুর আসন, শয্যা, আহার, পানীয়, যান, বাহন, ভৃত্য এবং ঈশ্বর,—সমস্তই মা। শিশু যতক্ষণ মাতৃক্রোড়ে থাকে, ততক্ষণ তাহার অভাব নাই, ভয় নাই, আনন্দের সীমা নাই; মাতার প্রতি শিশুর যে স্বাভাবিক নির্ভরতা ও বিশ্বাস, তাহা স্বয়ংসিদ্ধ এবং জন্মলব্ধ। যে সৌভাগ্যশালী সাধক দীর্ঘকালের সাধন দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে পারেন, তাহারই জন্ম সার্থক। শিশুর নিকটে সিংহ,

ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি ভীতিজনক ও প্রাণহানিকর যাহাই আসুক না কেন, শিশু মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া নিশ্চিন্ত। শিশু খেলা করিতে করিতে যদি বজ্রনাদ শুনিতে পায়, অমনি দৌড়িয়া সে মাতার কাছে যায় এবং মাতার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত হয়। মাতৃপ্রভাব এবং মাতৃনিহিত শক্তিই শিশুর ব্রহ্মাণ্ডকে সংযত রাখিতেছে, শাসন করিতেছে। মাতার মত শক্তিশালিনী এবং মাতার মত জ্ঞানশালিনী শিশুর ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ নাই। সহস্র পণ্ডিত এবং সহস্র আত্মীয় যাহা সমস্বরে সত্য বলিতেছেন, মা যদি একবার বলেন তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মিথ্যাই থাকিয়া যাইবে, সহস্র প্রমাণের বলেও তাহা আর সত্য হইতে পারিবে না। সকল ভাবের সিদ্ধিই সাধন-সাপেক্ষ, কিন্তু মাতৃভাবের সিদ্ধি সাধনের অপেক্ষা রাখে না।

"বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক অভিজ্ঞতার আঘাতে যদি শিশুর এই ভাব বিহত না হইত, তবে আর মানবজীবনে সাধনের প্রয়োজন থাকিত না, মানব বিনা সাধনেই মুক্তিলাভ করিত। কিন্তু শৈশবের বিশ্বাস ও নির্ভরতা শৈশব অতিক্রান্ত হইলেও অব্যাহত রাখিতে পারে, মানবকুলে এইরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ।

"মাতার প্রতি শিশুর যেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকে, ঈশ্বরের প্রতি সেইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরতা লাভ করাই সাধনের কার্য্য। এইটুকু যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইষ্টলাভ বা মুক্তি অসম্ভব। সাধ্যে ঠিক এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং অটল নির্ভরতা মাতৃভাব-সাধকের পক্ষে যতটা সরল, সহজ ও স্বাভাবিক, ততটা অন্যের পক্ষে নহে। মাতৃভাব অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রকৃতি জন্ম হইতেই, বোধ হয় গর্ভাবস্থা হইতেই, গঠিত অভ্যস্ত ও নিয়মিত হইতে থাকে। এই স্বাভাবিক ভাব ভাঙ্গিয়া সাধনের সময়ে ভাবান্তর অবলম্বনও যেমন কঠিন, তাহাতে সিদ্ধিলাভও

সেইরূপ সুদূরপরাহত। শক্তি সাধক,—মাতৃসাধক এই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থাই অবলম্বন করেন। তাঁহাকে ভাব ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয় না, অনভ্যস্ত-ভাবে অভ্যস্ত হইতে হয় না, অনাত্মীয়ের সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হয় না। দূরবীক্ষণে জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্বের ন্যায়, লৌকিক জননীর ভিতর তিনি বিশ্বজননীর যে প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করেন, সেই প্রতিবিম্বই বাস্তবের কার্য্য করে,—তাঁহাকে বিশ্বমাতার কোলে পৌঁছাইয়া দেয়।

"রামপ্রসাদ এই ভাবেরই সাধক ছিলেন, তাই সহজে তিনি বিশ্ব-মাতার কোলে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় নির্ভরতা এবং সরল মাতৃভাবের প্রতিকৃতি তাঁহার সঙ্গীতমালার প্রত্যেক মণিতে, তাঁহার ভাবের পরতে পরতে চিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহার নির্ভরতা, আব্দার ও অভিমান শিশুরই যোগ্য। যে ৺মাকে প্রত্যক্ষ না করে, তাহার জীবনে এগুলি আসিতে পারে না। মাতৃস্নেহ আকর্ষণ করিবার পক্ষে শিশুর সরলতা এবং নির্ভরতাই প্রবল অজেয় শক্তি। রামপ্রসাদের এই শক্তি ছিল, এবং ইহাতেই আকৃষ্ট হইয়া ৺মা তাঁহাকে ধরা দিয়াছিলেন।"

ঐ ভূমিকাতেই আর এক স্থলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"যাঁহার জন্য সাধনা করা যায়, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভাবেই লাভ করা সিদ্ধি। সাধকেরা বলেন, কুল-কুণ্ডলিনী না জাগিলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না, ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিতে হইলে শরীরস্থ কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ চাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে সিদ্ধিলাভে কুল-কুণ্ডলিনী ও ইষ্টদেবতা এই উভয়েরই জাগরণ অপরিহার্য্য। কুল-কুণ্ডলিনী না জাগিলে ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করা গেল না, আবার কুল-কুণ্ডলিনী জাগিলেন, তিনি দূর হইতে ইষ্টদেবতাকে দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তিনি নিদ্রিত-অর্থাৎ * * * নিষ্ক্রিয়, সুতরাং এই অবস্থায় সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

"এই কুল-কুণ্ডলিনী ব্যাপার যোগিগণ এবং বহু তন্ত্রে স্বয়ং মহাদেব বর্ণনা করিয়াছেন। বহু সাধক আবার সেই বর্ণিত বিষয়ে চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপনাপন শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া থাকেন। যাহারা এই বর্ণিত ও চিত্রিত বিষয় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষদর্শী যোগীদিগের উপদেশ মতে সাধনপথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের এই কুণ্ডলিনী চক্র যথা-কালে প্রত্যক্ষ না করিবার কোন কথা নাই। তবে বিশ্বাস ও সাধনা চাই। এই দুইটার অভাবে অন্তর্জগতে ক্রিয়া ও সিদ্ধি উভয়ই অসম্ভব।

"কুণ্ডলিনীর জাগরণ সিদ্ধ মহাপুরুষের শক্তি সহকারেও হইতে পারে, কিন্তু উহা সহ্য করা ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। * * * * কুণ্ডলিনী জাগিলেই যে সিদ্ধি বা মুক্তি হইবে, এমন নহে। কুণ্ডলিনী শক্তি একবার জাগিলেই যে আমরণ জাগিয়াই থাকিবেন, এমনও নহে, তিনি কিছুদিন দেখা দিয়া আবার লুকাইতে পারেন। কিন্তু তিনি কি ভাবে দেখা দেন আর কি ভাবে লুকান, তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন কি পরিমান দৈব এবং কতটা পুরুষকারের উপর নির্ভর করে, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং তাঁহার জাগরণ হইতে প্রবাহিত আনন্দ কীদৃশ, এই সকল বিষয় শাস্ত্রের বর্ণনা বা অন্যের উপদেশে উপলব্ধ হইতে পারে না। সৌভাগ্য-বলে যাহার রসনায় শর্করাসংযোগ হয়, সেই কেবল চিনি কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে।"

ঐ ভূমিকাতে 'কুল-কুণ্ডলিনী দেহধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। তজ্জন্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উহার অর্থ জানিতে চাহিয়া-ছিলেন। উত্তরে ভূমিক-লেখক লিখিয়াছিলেন, " * * * আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছু বলিতে স্বোপলব্ধি অনুসারে বলা যত সহজ, তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া তত সহজ নহে।"

'স্বোপলব্ধি' কথা বলিয়া ভূমিকালেখক আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। লেখকের নিজের উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ লিখিতে পারিয়াছিলেন।

এই সকল আলোচনা হইতে ভূমিকালেখকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কতদূর জ্ঞান হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভূমিকালেখকের মন্ত্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল এবং কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রৎ হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টরূপেই জানা যায়।

৺গুরুদেবের রচিত একটী স্তোত্র এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম :—

আত্মসমর্পনং স্তোত্রং।

পাদাব্জে শশিশেখরঃ শশিকলাশোভান্বিতা যে নখাঃ
তেষাং দীপ্তিমতাং শনৈঃ প্রখরভা ব্যাপ্নোতি দিঙ্‌মণ্ডলম্।
ধ্বান্তৌঘাঃ পরিতঃ পরিভ্রমপরাঃ প্রস্থান পর্য্যুৎসুতাঃ
একান্তে জগতামনন্যগতয়ঃ সীমান্তরং প্রস্থিতাঃ॥ ১॥

আজানুব্যবলম্বিতাং কটিতটে কাঞ্চীং শুভাং বিভ্রতী
বাহূনাং প্রকরৈঃ পরাং বিরচিতামুচ্চৈঃ সমুদ্বর্ত্তিনীম্।
শ্যামা নৃত্যতি দৃশ্যতামহ মহাকালেন যোগে রতা
যাং দৃষ্টা ভববন্ধনাত্তবপদং গচ্ছন্তি মুক্তা নরাঃ॥ ২॥

বামোর্দ্ধে করবালধারণপরা মোহান্ধতাচ্ছেদিনী
তস্যাধোঽসুরমর্দ্দিনী ধৃতবতী মুণ্ডং মুহুর্দ্দোলিতম্।
দক্ষেচোর্দ্ধকরেঽভয়ং ভয়হরা নিম্নে বরং মাঙ্গলং
ভক্তেভ্যঃ প্রদদাতি ভক্তজননী কালাব্ধিনিস্তারিণী॥ ৩॥

মুণ্ডালিঃ পরিলম্বিনী পরিকর প্রকৃষ্টসংঘট্টিনী
আভাতি স্ফটিকালি সংগতবতী শুভ্রাভ্রভাঃশালিনী।
ত্যক্তা যে মনুজাঃ শ্মশান-শয়নে শোকান্বিতৈর্ব্বান্ধবৈঃ
তেষামন্বপরাং গতিং গতবতাং কাঽন্যোদশা প্রাপিতা॥ ৪॥

শীর্ষে কেশসমুচ্চয়ো বিগলিতো গুল্ফান্তমালম্বিতঃ
লোলাগ্রা রসনা পরং রসবতী রক্তাক্তদন্তাবলী।
নীলাভা জলদপ্রভা প্রভবতী তামিস্রজালৈর্বৃতা
কালী নৃত্যতি কালগর্ব্ববিজয়া প্রেতাস্ত্যা যজ্ঞস্থলে॥ ৫॥

দিগ্বস্ত্রা শিবভামিনী শিবশিবেত্যারাবনিস্যন্দিনী
নেত্রাণাং ত্রিতয়েন সা ত্রিনয়না সূর্য্যাগ্নিদীপ্তিঙ্করা।
তেষামেকতমং নিধায় চ মহাকালে সদা সুৎসুকম্
অন্যদ্ভক্তজনেঽপরং ত্রিভুবনে শ্যামা জগদ্রক্ষতি॥ ৬॥

ব্রহ্মাণ্ডোদরধারিণী ত্রিজগতামুৎপাতমুৎপাটিনী
সম্পীনস্তনধারয়া নিখিলজীবানাং ক্ষুধানাশিনী।
হুঙ্কারৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ সুররিপূন্ বিঘ্নাশ্চ সন্তাড়িনী
কালী পালয়তি ক্ষিতিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্ব্বন্দিতা॥ ৭॥

ভূতপ্রেত পিশাচকেরুনিকর প্রধ্মান গীতস্তবা
নিঃসঙ্গৈঃ শবমাশ্রিতৈর্জ্জপফলে সিদ্ধৈঃ সমারাধিতা।
নিস্তব্ধে বিরলে নিশীথ সময়ে নদ্যাস্তটে কালিকা
নৈভৃত্যোহথ যথা তথা নিজগৃহে ভক্ত্যা সদা স্তূয়তাম্॥ ৮॥

মাতস্তে করুণাকণাং বিতর মাং সংসারভারার্দ্দিতম্
দুঃখাব্ধাবপি তারয় প্রতিপলং চিন্তোর্ম্মিসংক্ষোভিতে।
প্রচ্ছন্না বিচরন্তি চাত্র বিপদশ্ছিদ্রাগ্রমন্বেষ্য যাঃ
তাভ্যো মাং পরিরক্ষ দুর্গতিহরে দুর্গে শিবে শঙ্করি ॥ ৯ ॥

দৌর্ব্বল্যং হরপার্ব্বতি প্রতিরয়ং সৎকার্য্য সম্পাদনে
বালানাং খলুদেহি মে পরবলং মাত্রাকুলং রোদনম্।
দেহি প্রার্থনসম্বলং সুহৃদয়ং পারুষ্যহীনং মনঃ
কণ্ঠে মে চ সরস্বতীমনুপলং মামেতি বাঙ্নাদিনীম্ ॥ ১০ ॥

চিত্তং মে ভবভাবনা-কলুষিতং মোহান্ধকারাবৃতং
চিন্তা বিভ্রমসঙ্কুলং হতবলং সন্দেহ সন্দোলিতম্ ॥
সংস্তব্ধং সততং বিষাদ-বিকৃতং নৈরাশ্য-শঙ্কু-ক্ষতং
এতেনাম্ব করোমি কিংবদ ভবেকা মে গতিস্তাং বিনা ॥ ১১ ॥

অভ্যর্চ্চ্যাং সুরমানবৈঃ প্রতিদিনং নৈবেদ্যগন্ধাদিভিঃ
ধূপাদ্যৈর্ব্বলিভিঃ ফলৈঃ কুসুমসম্ভারৈঃ স্ফুরদ্গন্ধিভিঃ।
পূজাভির্জ্জগদম্বিকে বিবিধরত্নানাং সমুৎসর্জ্জনৈঃ
ত্বামাদ্যে কথমাহ্বয়ামি নয়নাম্ভোমাত্র বিত্তেন মে ॥ ১২ ॥

জানেঽহং ন তপো ন চ প্রজপনং মাতর্নপূজাং ব্রতং
হোমং বাথ পুরশ্চরং তব দয়ানামাদি সংকীর্ত্তনম্।
জিহ্বা মে ন সমুচ্চরত্যহ সদা মামেতি শব্দামৃতং
কেনাহং কৃপয়া বিনা জননি তে প্রাপ্নোমি পাদাম্বুজম্ ॥ ১৩ ॥

আশাশল্যমনুক্ষণং প্রকুরুতে মাং বিদ্ধমাকাঙ্ক্ষিণং
তৎ সন্তাড়িতমানসঃ খলু সদানাপ্নোমি শান্তিং পরাম্।
নৈরাশাখ্যসমিদ্ধ বহ্নিশিখয়া দগ্ধোঽস্মি সর্ব্বক্ষণং
দীনং মাং পরিরক্ষ দীনজননি ত্বং দৈত্যসম্মর্দ্দিনী ॥ ১৪ ॥

দেহ প্রাণমনাংসি মে কুরু শিবে ধন্যানি পাদার্চ্চিষা
আত্মানং সরিপুং তথেন্দ্রিয়কুলং শক্তিঞ্চ বিক্ষেপিণীম্।
স্বীকুর্ম্মম মম প্রবৃত্তিনিবহং মাং পাহি ভারার্দ্দিতং
ইচ্ছাচাস্তু তবানুগা ভবতু মে সর্ব্বং তবাদ্যাবধি ॥ ১৫ ॥

১২৯৯ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৯৩)
চৈত্র। খোরসেদপুর, নদীয়া।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৩৩৩ সালে আমার কলিকাতাস্থ বাটীতে অবস্থানকালে ৺গুরুদেব ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যে তাঁহার পুরাতন বন্ধু যাঁহারা তখন জীবিত ছিলেন তাঁহাদের সহিত একবার শেষ দেখা করিয়া আসিবেন। সেই অনুসারে তিনি কলিকাতার বাহিরে দুই তিন স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তখনও জানিতে দেন নাই যে তিনি শীঘ্রই দেহরক্ষা করিবেন। পাছে তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুরা ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব, আমি বুঝিয়াছিলাম। পরে বুঝিলাম, আমার ভুল হইয়াছিল।

ঐ বৎসর শীতকালে আমি ছুটী উপলক্ষ্যে বাটীতে ছিলাম। ৺গুরুদেব বলিলেন, তাঁহার ইচ্ছা কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিবার আছে ঐ সকল পুনরায় আর একবার দেখিয়া আসিবেন, কারণ অনেক দিন ঐ সকল স্থান দেখেন নাই। ঐরূপ ইচ্ছানুসারে কলিকাতায় কয়েকটী দর্শনীয় স্থান দেখিয়া আসিলেন। তখনও আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারি নাই, যে ৺গুরুদেব শীঘ্রই আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন।

৺গুরুদেবের সঙ্কল্প ছিল, যে ৺কাশীধামে থাকিয়া কোন এক দেবতার জপ, হোম, পুরশ্চরণ ইত্যাদি করিবেন, এবং তজ্জন্য অন্ততঃ দুইমাস কাল হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, ঐরূপ পুরশ্চরণ অতিশয় শ্রমসাধ্য এবং অনেকে উহা করিতে পারেন না। আমি বলিয়াছিলাম, 'বাবা, এইরূপ কার্য্য কি আপনাকে করিতেই হইবে? আপনার শরীর অতি দুর্ব্বল, আপনি কিরূপে সহ্য করিবেন?' তাহাতে ৺গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'অনেকদিন হইতে সঙ্কল্প করিয়াছি উহা করিব, ৺মা আছেন, আমার ভয় কি?' বুঝিলাম তিনি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন,

তাহা করিবেনই। আমি আর কিছু বলিলাম না। শীতকালের উপযোগী বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ৺গুরুদেব অগ্রহায়ণ মাসে ৺কাশীধাম রওনা হইলেন। তখনও আমাদিগকে বুঝিতে দেন নাই, যে মর্ত্ত্যধামে তাঁহার সহিত আমাদের আর দেখা হইবে না।

অল্পদিন পরে আমাকে একটী লোক বলিয়াছিলেন, যে আমার মঙ্গলের জন্য একটী সাধু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তিনি আর অধিক দিন থাকিবেন না। 'সাধু' শব্দে বুঝিয়াছিলাম ৺গুরুদেবই ঐ 'সাধু,' কিন্তু 'তিনি অধিক দিন থাকিবেন না' ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

আমি অল্পদিনের মধ্যে মেদিনীপুর বদলী হইয়া গেলাম, তখন আমার চাকুরীর প্রায় দেড়মাস মাত্র বাকী ছিল। ৺গুরুদেবের নিকট হইতে মেদিনীপুরে নিয়মিতভাবে পত্র পাইতেছিলাম। তিনি হবিষ্যান্নের পরিবর্ত্তে দুগ্ধাদির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। ৺মার এমনই খেলা, যে ৺গুরুদেব সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে ঐ কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ৺গুরুদেবের শরীর কোনরূপে অসুস্থ হইত না।

পত্রে জানিলাম ৺গুরুদেবের পুরশ্চরণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, হোম ও ব্রাহ্মণভোজন বাকী ছিল। তাহারও আয়োজন হইল। কিন্তু হোমে যে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় বিশেষরূপে শুষ্ক না থাকায় কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, কাষ্ঠের ধূম ৺গুরুদেবের চক্ষের পীড়াদায়ক হইয়াছিল। বিশেষ কষ্ট সত্ত্বেও সঙ্কল্পিত কার্য্য ভাল রূপেই শেষ হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল বিনা অন্নাহারে থাকার পর সাধারণ আহার আরম্ভ করায় ৺গুরুদেবের পরিপাক যন্ত্রের পীড়া দেখা দিল। একে বহুকাল কঠোরতার ফলে ৺গুরুদেবের পরিপাকযন্ত্রের পীড়া—বায়ুর আধিক্য এবং তজ্জন্য শূলপীড়া—মাঝে মাঝে কষ্ট দিত।

তাহার উপর দুইমাসের অধিক অনিয়মের ফলে ঐ পীড়া প্রত্যহই দেখা দিতেছিল এবং তজ্জন্য ৺গুরুদেবের কষ্ট হইতেছিল, এইরূপ সংবাদ পাইতাম। দুই একদিন পত্রাদি পায় নাই, হঠাৎ একখানি তারযোগে সংবাদ আসিল, ৺গুরুদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন। হঠাৎ এই সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, মনে হইতে লাগিল তিনি আমাদিগকে এত ভাল বাসিতেন, আমাদিগকে না জানাইয়া দেহ রক্ষা করিবেন, এইরূপ সম্ভব মনে হয় না। পরে নিশ্চিত সংবাদ পাইলাম যে ৺গুরুদেব আর ইহজগতে নাই, তিনি কয়েক ঘণ্টামাত্র শূল বেদনায় কষ্ট ভোগ করিয়া ৺জগজ্জননী বিশ্বমাতাকে স্মরণ করিতে করিতে মায়ের ছেলে মায়ের কাছে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি 'বিশ্বমাতা' নাম বড় ভালবাসিতেন, তাই বেগমপুরের নিজ বাটীতে যে ৺কালী মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "বিশ্বমাতা"। তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে ২।১ বার বলিয়াছিলেন 'মা আমায় নে মা', 'আমায় কোলে নে মা', এবং পরে জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পার্থিব কোন লোক বা বিষয় সম্বন্ধে কোন কথাই মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। যাহারা নিকটে ছিল, তাহাদের সহিতও কোন কথা বলেন নাই। কোনরূপ মায়ায় আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সন ১৩৩৩ সালে ১৩ই ফাল্গুন রাত্রি ৯।৯॥ টার সময় পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধামে ৺গুরুদেব দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। ৺কাশীধামের মণিকর্ণিকায় তাঁহার নশ্বর দেহের সৎকার বিধিপূর্ব্বক করা হইয়াছিল।

৺গুরুদেব ৺কাশীধামে শেষ যে বাসায় ছিলেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ কবিরত্ন মহাশয়ও সেই বাসায় ছিলেন ; এবং তিনি ও ৺গুরুদেবের ভাগিনেয়ী দীনময়ী দেবী শেষ সময়ে ৺গুরুদেবের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এখানে ৺গুরুদেবের নিজ-রচিত কয়টি গান উদ্ধৃত করিলাম :-

(১)

চিরদিন কি এমনি যাবে।
চিরদিন কি এমনি যাবে মা,
আমার চিরদিন কি এমনি যাবে।
ইন্দ্রিয়-তাড়নে রিপুর পীড়নে,
এমনি কি গো সদাই হৃদয় দাহ হবে।
আমি ভাল মনে করে মন্দ বেছে লই,
অনিষ্টে সন্তুষ্ট ইষ্টে রুষ্ট হই ;
আমার ভাবে গণ্ডগোল আপন পরে ভুল,
আমার জন্মটা কি এমনি অন্ধের বাজার হবে।
হে মা প্রেমানন্দে পূর্ণ তোমার এ সংসার,
অজ্ঞানে আমায় করেছে আঁধার,
আমি নিজে পথ দেখি না, অন্যে বলি কাণা,
এই রোগে কি আমায় চিরদিন ভোগাবে।
আমি লাভের তরে চলি মহাজনের পথে,
ভাগে দোকান খুলি দুর্জ্জনের সাথে,
আমি নিকাশে যা পাই, হাতে দেখি নাই,
সাতে পাঁচে বোল চলেছে হিসাবে।
মাগো এতদিন ভাগ্যে যা ছিল হয়েছে,
আর যে সময় নাই যম আমার কাছে ;
এখন দুগ্ধ পোষ্য ছেলে, বাঘের মুখে ফেলে,
ভীত গাভীর মত সরে কি দাঁড়াবে।

আর সকলের থাকে দশটা উপায় ধরা,
নয়টা থাকে হাতে একটা গেলে মারা,
মা তোর উমানন্দের সম্বল, মায়ের চরণ কেবল,
মা লুকালে সে আর কার কাছে দাঁড়াবে।

---

(২)

কত দিনে সে দিন হবে।
কত দিনে সে দিন হবে মা,
আমার কত দিনে সে দিন হবে।
যে দিন ধরা 'পরে উত্তর শিয়রে
কালী বলে দেহ শবাসনে রবে।

যে দিন চঞ্চল নয়ন শিবনেত্র হবে,
অস্থির এ দেহ স্পন্দহীন রবে;
যে দিন অনলে অনিলে শূন্যে জল স্থলে,
হবে একাকার, ভেদ বুদ্ধি যাবে।

যে দিন পদাঘাতে আর চরণ-বন্দনে,
মরিচে মাখনে পুরীষে চন্দনে,
অমৃতে গরলে মূত্রে গোলাপ জলে,
দুধে আর মদে সমবুদ্ধি হবে।

যে দিন প্রেমে আর ক্রোধে হবে কোলাকুলি
তুল্য মূল্য হবে স্তুতি গালাগালি,
যে দিন শত্রুতা মিত্রতা বিদ্বেষ মমতা,
এক সূত্রে গাঁথা গলার মালা হবে।

হে মা মরিলে সকলের এই দশাই হয়,
এ ত মা সংসারের নূতন কিছু নয়,
মা তোর উমানন্দ চাহে প্রাণ থাকিতে দেহে
জীবনে তাহার মরণ সিদ্ধি হবে।

---

(৩)

(শুধু) আমার জন্যে মা হয়েছেন শ্যামা।
আমি যে মা বই কিছু বুঝি না জানি না। (তাই)
শ্যামা স্বয়ং পরব্রহ্ম তাঁর কিসের ধর্ম্ম কিসের কর্ম্ম;
শুধু আমার জন্য লীলা খেলা স্নেহ করুণা।
আমি মায়ের নাম ভরসা করি অপার সাগর দিচ্ছি পাড়ি;
না পেলে প্রাণে মায়ের সাড়া গোষ্পদে তরি না।
আমার জন্য রবিশশী দিবানিশি হাসি খুসি;
সুখে দুঃখে অম্ল মধুর বিশ্বরচনা।
আমার জন্য মা আমার বহেন বুকে দুখের ভার,
বিশ্বভাণ্ডার পূর্ণ রাখেন উপহার নানা।
আমার জন্য ঘরে ঘরে, বিশ্ব যুড়ে মা বিরাজ করে
ক্ষুৎপিপাসায় রোগে শোকে তাই পাই সান্ত্বনা।
আমার ভোজন গমন শয়ন স্বপন সাধন ভজন মায়ের চরণ,
আমি তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণের তত্ত্ব জানি না (ধারও ধারি না);
উমানন্দে প্রেমানন্দে কখন হাসে কখন কাঁদে,
মায়ের ভাবে ডুবে যেন সে হারায় চেতনা।

২রা বৈশাখ, ১৩৩০।

পরিশিষ্ট।

৺গুরুদেবের লিখিত যে সকল পদ্য ও প্রবন্ধ

আমার হস্তগত হইয়াছে,

তাহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র এই পরিশিষ্টে দেওয়া হইল

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ

মহাশয়ের লিখিত "শরচ্চন্দ্রের সাহিত্য-সেবা" প্রবন্ধও

এই পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিলাম।

---

(১)

পুঁটিয়ার কার্য্যত্যাগের সময় ছাত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ

খেলার সামগ্রী নহে ছাত্রের জীবন।
ইহাতেই স্বজাতির উত্থান পতন॥
পার যদি চালাইতে জ্ঞান ধর্ম্ম পথে।
দেবত্বে উজ্জ্বল কীর্ত্তি রহিবে জগতে॥
না পারিলে অধঃপাত ঘটিবে নিশ্চয়।
দেবতা বংশের হ'বে পশুত্বে বিলয়॥
অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য,—তপস্যা যুগল।
ধন বা দাসত্ব নহে এ তপের ফল॥
মানুষ দেবতা হয় ইহার কৃপায়।
চতুর্ব্বর্গ লাভ হয় এই তপস্যায়॥
সম্মুখে সংসার ক্ষেত্র অনন্ত প্রসর।
বৎসগণ! দৃঢ় পদে হও অগ্রসর॥
এ নহে নন্দন বন,—সংসার কেবল।
অশ্রু শোণিতের ঘোর অভিনয় স্থল॥
জীবন থাকিতে কেহ পাবে না বিশ্রাম।
দেব দানবের হেথা যুদ্ধ অবিরাম॥
বিপদ হেরিয়া কিন্তু করিবে না ভয়।
অন্তিমে দেবের জয় জানিবে নিশ্চয়॥
অবশ্য হইবে তৃপ্ত আত্মার পিপাসা।
সিদ্ধিতে বিলম্ব হেরি ছাড়িওনা আশা॥
বীজ বুনিলেই ফল ধরে কি কখন?
ধৈর্য্য ধরি যত্নে জল করিবে সেচন॥

"জননী জনম ভূমি" রাখিও স্মরণ।
মায়ের মরমে ব্যথা দিওনা কখন॥
ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদেরি হাতে।
দিবানিশি এই কথা জাগে যেন চিতে॥
দূরে রাখি শোক দুঃখ বিপদ বিষাদ।
সুখে দীর্ঘজীবি হও, এই আশীর্ব্বাদ॥

পুঁটিয়া
১২৯৯ বাং, ১৯শে মাঘ।

(২)

অভিভাবকের কর্ত্তব্য।

(১) আপনার চরিত্রকে আদর্শ করা (নিজে মন্দ হইয়াও উপদেশের জোরে ছেলে ভাল হইবে মনে করা ভুল)।

(২) গৃহকে আদর্শ-বিদ্যালয় করা (নিজের এবং পরিবারস্থ প্রত্যেকের কার্য্য ন্যায়-নীতি-ধৈর্য্য-সন্তোষ-ক্ষমা-দয়া-সত্য-সাধুতা-ধর্ম্ম-একতা তেজস্বীতাদ্যোতিক ও শৃঙ্খলাযুক্ত এবং আলস্য ও বিলাস-বিহীন হইবে)।

(৩) স্বাস্থ্য বিধান—(ক) শারীরিক—জল, বায়ু, খাদ্য, শ্রম ও আমোদ (খেলা)।

(খ) কুসঙ্গত্যাগ, নৈতিক ও ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান ও প্রাথমিক অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান (স্নান, সন্ধ্যা, গায়ত্রী যপ, ন্যাস বা প্রাণায়াম, নাম-সংকীর্ত্তন ইত্যাদি)—সাধু কার্য্যে ও সাধু-চরিত্রে শ্রদ্ধাজনন।

(৪) শিক্ষক নিয়োগ—(ক) শিক্ষকের উপযোগিতা—বিদ্যা, পারগতা, ভালবাসা, রুচি এবং চিরদিন শিক্ষক থাকিবার সঙ্কল্প, সুতরাং পারদর্শিতা দেখাইয়া উন্নতি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা।

(খ) শিক্ষকের সুবিধা—প্রলোভনযোগ্য বেতন, ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্যে পেনসন ও অকাল মৃত্যুতে পরিবারের সাহায্য, পিতৃহীন শিক্ষক-সন্তানের অধ্যয়ন—সাহায্য, সর্ব্বদা শিক্ষকের প্রতি আদর, শোক দুঃখ আপদ বিপদে শিক্ষকের সহায়তা।

(গ) শিক্ষকের শাসন—পণ্ডিতের শাসন মূর্খ দ্বারা না হয় (মূর্খ সম্পাদক ইত্যাদি)—গোপনে নিরপেক্ষ লোক দ্বারা অপরাধের অনুসন্ধান —অপরাধ ভ্রান্তিজাত হইলে ক্ষমা—অপরাধ ইচ্ছাজাত হইলে শিক্ষকের দূরীকরণ—শিক্ষককে দূর না করা পর্য্যন্ত তাহার অপরাধ গোপন রাখা।

(৫) শিক্ষকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও বালক সম্বন্ধে পরস্পরের অভাব অভিযোগ অবগতি।

(৬) শিক্ষার উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব—উন্নতি—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, এবং আধ্যাত্মিক—কেবল অর্থোপার্জ্জন, কেবল সুখ, কেবল বিলাসিতা, কেবল রাজপ্রসাদ নহে। এই কথা মনে রাখা এবং সন্তানকে বলা।

---

(৩)

অক্ষর পঞ্চাশৎ।

কৈলাসহর।

১৩১৭ সাল, ১৩ই বৈশাখ।

অ

অধর্ম্মের অপযশ হয় অনুক্ষণ,
অহরহ অনুতাপ, অকালে মরণ

আ

আসল ছাড়িয়া যার নকলে আদর,
আহাম্মক বটে সেই, আদত বর্ব্বর।

ই

ইতর অসাধু-সঙ্গ যে করে ইচ্ছায়,
ইতর বলিয়া লোকে মনে করে তায়।

ঈ

ঈশ্বরের প্রতি থাকে যাহার বিশ্বাস,
ঈষৎ পাপেও সেই ভাবে সর্ব্বনাশ।

উ

উত্তমের সহবাস, উদার বচন,
উপযুক্ত কালে কর্ম্ম উন্নতি-লক্ষণ।

ঊ

ঊর্দ্ধদিকে লক্ষ্য যার, সে হয় উন্নত,
অধো দিকে লক্ষ্য যার, হয় অবনত।

ঋ

ঋণ পাপ বড় পাপ, যার ইহা থাকে,
অশান্তি দংশন তারে ক্ষিপ্ত প্রায় রাখে।

ৠ

সন্ধি ছাড়া দীর্ঘ ৠর ব্যবহার নাই;
বাঙ্গালায় দেখা তার কদাচিৎ পাই।

ঌ

ঌ কারের যদি কিছু থাকে ব্যবহার,
লকারেও সিদ্ধ হয় প্রয়োজন তার।

ৡ

দীর্ঘ ৡ কেবল করে সংখ্যার পূরণ,
বাঙ্গালায় নাই তার কিছু প্রয়োজন।

এ

এক কথা, এক কর্ম্ম, এক নিষ্ঠা যার,
সংসারে বিপদ কভু ঘটে না তাহার।

ঐ

ঐক্যশালী সব জাতি জগতে স্বাধীন ;
পরের দাসত্বে বাঁধা যারা ঐক্যহীন।

ও

ওল খেয়ে অর্শ রোগী হয় নিরাময়।
ওলাউঠা দেখি শুধু জল দোষে হয়।

ঔ

ঔদরিক অত্যাহারে ঘটায় বিপদ,
ঔদ্ধত্যের একমাত্র প্রহার ঔষধ।

ক

কলম কাগজ কালি থাকুক সুন্দর ;
লেখা না জানিলে ভাল হয় কি অক্ষর ?

খ

খল আর খড়্গা হয় তুল্য দুই জনা,
খণ্ড খণ্ড করে সব, জুড়িতে পারে না।

গ

গন্ধহীন ফুল আর গুণহীন নর,
দুগ্ধহীন গাভী কেহ করে না আদর।

ঘ

ঘরে ঘরে সুখ দুঃখ হাসি কান্না আছে,
মাছ যথা থাকে জলে, পাতা সব গাছে।

ঙ

ঙ বটে জন্ম খঞ্জ, গতি শক্তি হীন,
অগ্রজের কাঁধে চড়ি চলে চিরদিন।

চ

চলিতে চরণ বিধি করিলেন দান ;
গাড়ি ঘোড়া হাতী নৌকা কে তার সমান ?

ছ

ছয় ঋতু, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী,
সংগীতের বর্ণমালা সা রি গ ম পা ধা নি।

জ

জনক জননী গুরু, পরম দেবতা,
দুর্লভ মানব দেহে যাঁরা জন্মদাতা।

ঝ

ঝম্ ঝম্ ঝরে জল ভাঙ্গি আসমান।
ঝড়েতে আশ্রয় নাই মাটির সমান।

ঞ

ঞটি নিরীহ, থাকে জ্ঞাতি পদতলে,
গোঁসাঞি মিঞার কভু কাছা ধরে চলে।

ট

টক নয়, মিষ্ট নয়, সেই শুদ্ধ জল ;
কাঁচা টক, পাকা মিষ্ট, সেই ভাল ফল।

ঠ

ঠকের সকলি ঠক, ঠক তার ঝাড়,
বাছাই করিলে ঠক, ঠক গাঁ উজাড়।

ড

ডর নাই, ভয় নাই, নির্ভীক, অটল,
সেই বীর সেই ধীর, সেই মহাবল।

ঢ

ঢল ঢল গঙ্গাজল, তরী টলমল ;
ঝড় যদি উঠে, গতি ঈশ্বর কেবল।

ণ

ণ আর ন এর চল নিরর্থক নয়,
যে যার কর্ত্তব্য সাধে উচিত সময়।

ত

তনু আর আর ধনে দেখি অত্যন্ত আদর,
উভয়েই বটে কিন্তু নিতান্ত নশ্বর।

থ

থর থর কলেবর, বুকে ধড়ফড়,
মুখে কিন্তু বীরত্বের কথা কড়াকড়।

দ

দয়া তুল্য ধর্ম্ম, কি অভয় তুল্য দান,
মর্ত্ত্যে কোথা, স্বর্গেও দেবতা নাহি পান।

ধ

ধর্ম্ম, বিদ্যা, চরিত্র, অমূল্য তিন ধন,
আছে যার, বশে তার রহে ত্রিভুবন।

ন

নয়ন, শ্রবণ, নাসা, মুখ, হস্ত, পদ,
সব আছে, এর বড় কি চাও সম্পদ?

প

পলকে প্রলয় হয়, রাজ্য ধন যায়,
তবু পাপী করে পাপ ভুলিয়া মায়ায়।

ফ

ফল, ফুল, শস্য, মূল, তৃণ, পত্র দিয়া
সাজাইলা ধরা বিভু জীবের লাগিয়া।

ব

বড় হ'তে বাঞ্ছা যদি, আগে হও ছোট,
অধিক বাড়িলে আগে পরে হবে খাট।

ভ

ভয় যার আছে তার বীরত্ব কোথায়?
ভীরুর সকল শক্তি ভয়ে লোপ পায়।

ম

মঙ্গল কামনা করে মানুষের মন,
অজ্ঞানেতে অমঙ্গল করে আহরণ।

য

যত সুখ তত দুঃখ চিরদিন পাই,
কেবল পুণ্যের সুখে দুঃখ-ভাগ নাই।

র

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—পাঁচগুণে
প্রকৃতি পড়েছে ধরা মানবের মনে।

ল

লক্ষপতি হইলেই নহে লোক ধনী,
মনেতে মহত্ত্ব যার, তারে ধনী মানি।

ব

বহুশাস্ত্র, বহুধন, বহু যশোমান;
সর্ব্ব সুখ নহে এক ধর্ম্মের সমান।

শ

শমনের জালে বাঁধা বিশ্ববাসী সব,
তবু কত অহঙ্কার, আস্পর্দ্ধা, গৌরব!

ষ

ষড় রিপু মানুষের দেহের ভিতর,
সিংহ ব্যাঘ্র হ'তেও অধিক ভয়ঙ্কর।

স

সময় বুঝিয়া জানে কহিতে সহিতে,
সহসা বিপদ তারে পারে না পাড়িতে।

হ

হর্ষে বিষাদেতে স্থির, সম দুঃখ সুখে,
সদানন্দে মগ্ন যোগী, সদা হাস্য মুখে।

ং

অনুস্বার দিলে হয় হংস বংশ দংশ,
অনুস্বার বাদ দিলে হস বশ দশ।

ঃ

বিসর্গ দেখিতে পাই যেখানে সেখানে,
বাঙ্গালার উচ্চারণে বাজে না সে কাণে।

ঁ

চন্দ্রবিন্দু কোন দেশে কার্য্যে নাহি লাগে,
কোন দেশে দেখি তারে সকলের আগে।

---

(৪)

বিশ্বাস।

সাধু লোককে বিশ্বাস কর; কেন না, যে স্বভাবতঃ সাধু, সে কাহার প্রতি অবিশ্বাসের কার্য্য করে না। সাধুরা পরের উপকারই করেন, পরের অপকার তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

সত্যবাদীকে বিশ্বাস কর। পিতা, মাতা, এবং শিক্ষক, ইহাঁরা সর্ব্বদা তোমার হিত কামনা করেন; তুমি ইহাঁদের কোন উপকার করিতে না পারিলেও চিরদিন ইহাঁরা তোমার মঙ্গল কামনা এবং মঙ্গল-সাধন করিবেন।

যিনি যে বিষয় জানেন, সে বিষয়ে তাঁহার কথা বিশ্বাস কর। ধর্ম্মে

ধার্ম্মিকের কথা বিশ্বাস কর, বিদ্যা-লাভে শিক্ষকের কথা বিশ্বাস কর, রোগে চিকিৎসকের কথা বিশ্বাস কর, এবং আহারে রন্ধনকারীর কথা বিশ্বাস কর।

সংসার বিশ্বাসে চলিতেছে। পদে পদে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করিলে এ সংসার ভীষণ অসুখ এবং অশান্তির স্থান হইয়া পড়ে। পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী, দাস, দাসী, সুহৃৎ, স্বজন, ইহঁাদিগের স্নেহ মমতা এবং হিতৈষিতায় বিশ্বাস করিয়া আমরা সংসারে কেমন সুখে এবং নিরাপদে আছি, কেমন নির্ব্বিঘ্নে আত্মোন্নতি করিতেছি। যদি ইহঁাদিগকে পদে পদে অবিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে আহার নিদ্রা প্রভৃতি জীবনধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যও অসম্ভব হইত।

বিশ্বাস-ঘাতক, বঞ্চক এবং কপটাচারীকে বিশ্বাস করিও না, করিলে বিপদে পড়িবে। আপনার সাধুতা সম্বন্ধে অন্যের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে প্রতারণা দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ করাই ইহাদের ব্যবসায়। যে কোন দিন কোন প্রকারে তোমার একটা উপকার করিয়া থাকিলে যখন তখন তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়, শীঘ্রই তাহার একটা প্রত্যুপকার করিয়া ফেলিও, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করিও না। যে কথায় কথায় সাধুতার পরিচয় দেয়, সে সাধুতার ব্যবসায়ী; তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিলে সে ইহাতে লাভ করিবে, কিন্তু তোমার লোকসান হইবে।

লোকের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিও না, কার্য্য দেখিয়া বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কর। অন্যের সঙ্গে যে বিশ্বাস-ঘাতকের কার্য্য করিয়াছে, তোমার কাছে সে বিশ্বাস রাখিবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুযোগ পাইলে সে শত্রু কিংবা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে স্বার্থের জন্য সে যে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে না, এমন কথা মনে করিও না।

অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে সাবধান হইয়া তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর। যদি মনে মনে কাহারও প্রতি সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকে, মুখ ফুটিয়া তাহাকে সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কি জানি, যদি অবিশ্বাস সন্দেহ-মূলক হয়, তবে তাহা মুখে প্রকাশ করিলে কেবল নিরর্থক শত্রুতার সৃষ্টি হইবে। সন্দেহ দীর্ঘকাল থাকে না, একটুকু যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিলেই প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া পড়িবে।

সর্ব্বোপরি এই বিশ্বাস কর, যে ধর্ম্মপথে থাকিলে বিপদ ঘটিবে না। দুঃখ, দুর্দ্দিন এবং প্রলোভনে পড়িয়াও যদি জীবনে সাধুতা রক্ষা করিতে পার, তবে একদিন অবশ্যই তাহার পুরস্কার পাইবে।

---

(৫)

ঈশ্বর।

ঈশ্বর অনাদি; তিনি সকলের আগে বর্ত্তমান, বর্ত্তমান ছিল না।

ঈশ্বর অনন্ত; তাঁহার শেষ নাই। এক সময়ে এই সৃষ্টির সমস্ত লয় পাইবে, কিন্তু ঈশ্বর থাকিয়া যাইবেন।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; তিনি সমস্তই জানেন, তাঁহার নিকট কিছুই লুকান যায় না।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; তাঁহার সকল প্রকার শক্তিই আছে, তিনি সকলই করিতে পারেন।

ঈশ্বর এক; বিবিধ জাতি নানা ভাষায় কালী, কৃষ্ণ, আল্লা, গড

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিলেও তিনি একই; যে যেই ভাবে তাঁহাকে ডাকে, সে সেই ভাবে তাঁহাকে পায়।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়; তাঁহার দ্বিতীয় নাই, অর্থাৎ তাঁহার মত আর একজন নাই।

ঈশ্বর পরম দয়াবান; মাতা পিতা কাহারও দয়া ঈশ্বরের দয়ার তুল্য নহে, কারণ তিনি সকলেরই সকল প্রকার অভাব এবং দুঃখ দূর করিতে পারেন।

ঈশ্বর পরম ন্যায়বান্; যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তাহাকে সেই কর্ম্মের উপযুক্ত ফল দেন। জানিয়া শুনিয়া কুকর্ম্ম করিলে ঈশ্বর সকলকেই শাস্তি দেন; আবার সরল মনে ভাল কার্য্য করিলে তিনি তাহার জন্য পুরস্কার দেন।

ঈশ্বর মঙ্গলময়; তিনি কাহারও অমঙ্গল করেন না।

ঈশ্বর সকলের আরাধ্য। যাহার যে বস্তু আছে, তাহার আরাধনা না করিলে তাহার নিকট হইতে সে বস্তু পাওয়া যায় না। জ্ঞান, শক্তি, দয়া, মঙ্গল প্রভৃতি যাহা সকলেরই প্রার্থনীয়, এবং যাহা মরিয়া গেলেও সঙ্গে যায়, বাড়ী ঘর, আত্মীয় বন্ধু, ধন রত্ন প্রভৃতির ন্যায় যাহা পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে না, এমন বস্তু কেবল ঈশ্বরেরই আছে, এবং এই সমস্ত কেবল তিনিই দিতে পারেন; এ অবস্থায়, এই সকল অমূল্য ধন পাইতে হইলে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হয়, তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা করিতে হয়।

১৩০৭ সাল।

---

(৬)

আসন প্রাণায়াম সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ।

বিনা গুরু-উপদেশে, কেবলমাত্র শাস্ত্র-দর্শনে, কোন অনুষ্ঠান করিবে না।

আসন—যাহার কাছে যে আসন সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, যে আসনে অনেকক্ষণ বসিলেও ক্লেশ হয় না, সে সেই আসন অভ্যাস করিবে। যখনই উপবেশনের প্রয়োজন হইবে, তখনই সেই আসনে উপবেশন করিবে।

আসন ত্যাগ—আসন ত্যাগ করিবার সময়ে অতি সাবধানে আস্তে আস্তে আসন-বন্ধ খুলিয়া আগে দুই পা টান করিবে, তাহার পরে ঝিঁ ঝিঁ ধরা ছাড়িলে, আস্তে আস্তে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিবে।

আসন সিদ্ধি—আসন সিদ্ধির তিনটি লক্ষণ :—(১) বসিতে গেলেই বিনা যত্নে অজ্ঞাতসারে অভ্যস্ত আসন আপনা হইতেই হইবে, (২) ঐ আসনে প্রয়োজনমত যতক্ষণ ইচ্ছা অক্লেশে বসিয়া থাকিতে পারা যাইবে, আসনের ক্লেশে ধ্যান-ভঙ্গ হইবে না, (৩) আসনে বসিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিলে আপনাকে শরীর হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হইবে, ধ্যেয় বস্তুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া অনুভব হইবে।

ত্রাটক—আসন করিয়া নাসার অগ্রভাগে কিম্বা সম্মুখস্থ শ্বেতবর্ণ কোন ক্ষুদ্র চিহ্নে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। চিহ্ন—যথা কাল জমিতে চুণের টিপ। এই দৃষ্টি অনেকক্ষণ (যতক্ষণ ইচ্ছা) স্থির রাখিবার অভ্যাস হইলে, শিবনেত্র হইয়া নাসিকার ঊর্দ্ধদেশে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। ইহাই স্তিমিত দৃষ্টি। ত্রাটক অসময়েও হইতে পারে। প্রাণায়াম—বাম নাসায় পূরক, কুম্ভক, দক্ষিণ নাসায় রেচক, দক্ষিণ নাসায় পূরক, কুম্ভক,

বাম নাসায় রেচক, ইহা হইলেই একবার প্রাণায়াম হইল। বার-সংখ্যা অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি করিতে হয়।

মাত্রা বা সময়ের পরিমাণ—পূরকে যে সময় লাগে, তাহাকে একমাত্রা ধরিলে, কুম্ভকে তাহার চারিগুণ বা চারিমাত্রা এবং রেচকে তাহার (পূরকের) দ্বিগুণ বা দুইমাত্রা চাই।

রেচক যত বিলম্বে হইবে, ততই উপকার। যে পরিমাণে কুম্ভকে ধীরে ধীরে অক্লেশে রেচক করিতে পারা যায়, তাহার অতিরিক্ত কুম্ভক করিলেই রেচক দ্রুত হইয়া পড়ে, সুতরাং শরীরের অনিষ্ট হয়। বন্য হস্তীকে বশে আনার মত বায়ুকে বশে আনিবে।

রেচকের পরীক্ষা—বায়ু রোধ করিয়া দৌড়িয়া প্রদীপের কাছে নাক নিয়া রেচক করিলে যদি প্রদীপ না কাঁপে, তবেই রেচক ঠিক হইল। এইটি ঠিক রাখিয়া শক্তি অনুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

প্রাণায়ামের সময়ে ঘর্ম্ম হইলে তদ্দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে।

অম্ল, লবণ, সর্ষপ, অতি উষ্ণ, অতি ঠাণ্ডা, কুৎসিত অন্ন, অত্যাহার, উপবাস, শরীরের অসহ্য কার্য্য, ধূর্ত্তের সঙ্গে বাস, অধিক লোকের সঙ্গে থাকা, অধিক কথা কহা, নিয়মিত কার্য্যের সময়লঙ্ঘন, প্রাণায়ামের বিরোধী। দুগ্ধ, ঘৃত, শাল্যন্ন, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, খাদ্য, মৌন নির্জ্জনে অবস্থান, অগ্নি, রৌদ্রতাপ, ভয়, ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা, ক্ষুদ্রতা এবং মৈথুন চিন্তার পরিহার ইহার অনুকূল।

প্রাণায়াম সিদ্ধির বাহ্য চিহ্ন—শরীরের কৃশতা, স্ফূর্ত্তি, দৃঢ়তা, দীপ্তি, জঠরানলের বৃদ্ধি, মল মূত্রের ও আহার নিদ্রার অল্পতা এবং নীরোগতা।

প্রাণায়ামের আভ্যন্তরিক ফল—শরীর ও বায়ুর স্থিরতাবশতঃ মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা।

প্রাণায়াম নিষেধ—ক্ষুধিত, ভুক্ত, ক্লান্ত, বিরক্ত, এবং পীড়িত অবস্থায়

প্রাণায়ামে অনিষ্ট হয়। রেচকের পর স্থির থাকিবে না, অর্থাৎ রেচক শেষ হইবামাত্র পূরক করিবে। প্রাণায়ামের মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিবে না, একাসনে অক্লান্তভাবে যতক্ষণ সাধ্য প্রাণায়াম করিবে, ক্লান্তিবোধ হইলেই আসন ছাড়িয়া উঠিবে।

সাবধানতা—ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রাণায়াম দেহ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মের উপযুক্ত করিবে—ইহারা সাধ্য কার্য্য মাত্রেই সফলতা দিতে পারে। ইহারা উপায়মাত্র, উদ্দেশ্য নহে।

গ্রন্থাদিতে যে সকল অলৌকিক সিদ্ধির উল্লেখ আছে, কলিকালে কোটির মধ্যে একের ভাগ্যেও তাহা ঘটে কিনা সন্দেহ। যাহারা তীব্র চেষ্টা করে, তাহাদিগকে প্রায়ই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, কলিতে নানা কারণে শরীর, মন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সেরূপ তীব্র চেষ্টা ও তদনুযায়ী সিদ্ধির অনুকূল নহে। তীব্র চেষ্টা ছাড়িয়া নিয়মিত চেষ্টা করিবে, আকাশে উড়িবার আশা না করিয়া সুস্থদেহে সুস্থমনে জীবনের কর্ত্তব্য পালনের শক্তিলাভ করিবার আশা করিবে, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইবে।

কর্ত্তব্য অবধারণ—পবিত্রতা, ধর্ম্মভাব, নিঃস্বার্থতা, ন্যায়পরতা, মানব-প্রীতি এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ, এই গুলিই কার্য্যের নিয়ামক হইবে। কার্য্যের সফলতার ভার ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া, স্থান-কাল-পাত্রানুসারে তাহার ঔচিত্য বিচার করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

জগদম্বা সকলের মঙ্গল করুন। ইতি।

রাজসাহী,
১৩১৬ সাল, ১০ই শ্রাবণ।

(৭)

ভারতের ধূলা।

(ধুয়া)

আয় ভাই! মাখি গায় ভারতের ধূলা।
জানিস্ কি এর মাঝে পবিত্রতা কত আছে?
মাখি দেখ্, মুছে যাবে হৃদয়ের মলা।
আছে সঞ্জীবনী শক্তি এ ধূলায় লুকাইয়া,
পরশে ঘুচিয়া যাবে মরমের জ্বালা।
আয় ভাই! মাখি গায় ভারতের ধূলা।

(প্রথম পদ)

পূরবে জয়ন্তী পীঠ, পশ্চিমে হিঙ্গুলা,
উত্তরে বদরিনাথ, কুমারিকা দক্ষিণেতে,
জান কি ইহার মাঝে তীর্থ কতগুলা?
সরযূ, সিন্ধু কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী
বহে হেথা কত নদী পবিত্র-সলিলা?
কি কব অধিক আর, পবিত্রিতে এই মাটি,
গঙ্গারূপে নারায়ণ আপনি দ্রবিলা।
যোগিপতি মহেশ্বর সতী-দেহ লয়ে কাঁধে
পত্নীশোকে পদব্রজে ভারতে ভ্রমিলা;
অগুরু-চন্দন-চূর্ণ, কুঙ্কুম-কস্তুর ফেলি,
ভস্ম সহ এই মাটি সর্ব্বাঙ্গে মাখিলা।

এখনো ত এ ভারতে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি,
কাটিয়া তিলক ফোঁটা করে দেহ ধলা।
কখনো কি দেখ নাই, মাখিয়া গঙ্গার মাটি,
ঘুচাতে গলিত তীব্র কুষ্ঠ-রোগ-জ্বালা ?
যশোদা-দুলাল হরি শিশুরূপে বৃন্দাবনে
জাননা এ মাটি কত আদরে খাইলা ?
আশ্বিনের মহোৎসবে পূজাকালে, মহাস্নানে
সাদরে এ মাটি লন ভারতবৎসলা !
যত সাধু মহাজন তীর্থে গিয়া, এই মাটি
মাখেন সর্ব্বাঙ্গে, স্নান-তর্পণের বেলা ;
এর মাঝে বস্তু কিছু না থাকিলে,
মিছা কিরে এরে লয়ে সুরে নরে করে এত লীলা

(ধুয়া)

(দ্বিতীয় পদ)

আয় ভাই মাখি গায় ভারতের মাটি।
পরম পবিত্র এ যে জননীর মহারত্ন !
মাটির আদর বিনে হব'না ত খাঁটি।
মাটিরূপে জন্মভূমি—বিরক্তি বিহীন মাতা—
পোষেন নিয়ত, করে কত পরিপাটি,
তবু না চিনিয়া তাঁরে, আমরা নির্ব্বোধ, হাঁ রে।
সাজিয়া ভিক্ষুক, মিছা দ্বারে দ্বারে হাঁটি !
এ অপূর্ব্ব রসধারা কার মোহে ছাড়ি মোরা,
ধবল মর্ম্মর গাত্র প্রাণপণে চাটি !

মর্ম্মর কি দিতে পারে বিন্দুমাত্র রস, হায়,
সারাটি জীবন যদি মরি মাথা কুটি!
কন্দমূল ফল শস্য সুমিষ্ট রসাল যত,
বাঁচি মোরা খেয়ে যেই ভাত, ডাল, রুটি,
সন্দেশ, মিঠাই, চিনি, দধি, দুগ্ধ, সর, ছানা
সকলি জানিও ভাই মার এই মাটি!
হিন্দু কিম্বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিম্বা খৃষ্টিয়ান,
ধর্ম্মেতে হইতে পারি শত-লক্ষ-কোটি;
সুখ-দুঃখে, মনঃপ্রাণে, রক্ত-মাংসে এক বাঁধ,
মায়ের চক্ষেতে নই এক বই দুটি।
জন্মিয়া তাঁহারি গর্ভে, তাঁরেই চুষিয়া বাঁচি,
তাঁরি কোলে শুয়ে থাকি, তাঁরি বুকে হাঁটি;
শ্মশানে, কবরে যাই, মাটি ছাড়া গতি নাই,
এ'ত মাটি নারে ভাই, এ মোদের মা'টি।

(ধুয়া)

(তৃতীয় পদ)

ভুলিতে কি পারি কভু এ মাটির সার?
মান্ধাতা, পরশুরাম, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন,
রাম, কৃষ্ণ জন্মে যেথা, কত শক্তি তার?
বিক্রমেশ, পৃথ্বীপতি, বাবর, আকবর সাহ,
শিবাজি, প্রতাপসিংহ—বীর্য্য-পারাবার,
প্রতাপ-আদিত্য বীর, সীতারাম, মেনা হাতী,
মদন, মোহনলাল—মনে নাই কার?

বশিষ্ঠ, কনাদ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, ব্যাস,
বিশ্বামিত্র, শুক, ধৌম্য, সনৎকুমার,
কালিদাস, জয়দেব, শ্রীগৌরাঙ্গ, রঘুনাথ,
নানক, চানক্য, শুক্র—কত কব আর ?
সীতা, কৃষ্ণা, দময়ন্তী, নূরজাহাঁ, চাঁদবিবি,
দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই, নারীকুলে সার,
যে দিকে চাহিয়া দেখি, নামে গুণে অন্ত নাই
ভারতের রত্নভাগ্য অসীম, অপার !
এতই মনিষী, বীর, মুনি, ঋষি, শাস্ত্রকার,
জন্মে এত নারীরত্ন যেথা একবার,
কে বলেরে সেই মাটি অসার হয়েছে এত,
বারেক জন্মেছে যারা, জন্মিবে না আর ?

(ধুয়া)

(চতুর্থ পদ)

আয় ভাই সবে মিলে আগে হই চাষা।
মাটি মাথে মাটি খায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
সেই ত সন্তান পায় মার ভালবাসা।
মানবীয় সভ্যতায় কৃষক প্রথম স্থানে ;
শুনিয়াছি বেদ নাকি কৃষকের ভাষা ;
তাহে ত কলঙ্ক নাই, আর্য্য যে কৃষকশ্রেষ্ঠ,
ক্ষেত্রজ্ঞ নহিলে কিরে ক্ষেত্র যার চষা !
পেয়েছি আদর্শ ক্ষেত্র—ক্ষিতি, জল, তাপ, বায়ু,

ভারতে সকলি যেন অনুপাত কসা ;
অবহেলে কৃষিতত্ত্ব বিলাসে দিয়াছি মন,
তাই মোরা অন্নহীন, তাই এ দুর্দ্দশা !
আমাদেরি মাতৃধন পরে বহি লয়ে যায়,
আমরা খাইয়া বাঁচি তুষ, ভুষি, খোসা ;
আমাদেরি ধনজনে জগতে গর্ব্বিত তারা,
আমরা সিংহের জাতি অন্নাভাবে মশা !
আমাদেরি পিতৃগণ ক্ষেত্রের মরম জানি
হয়েছিল একদিন পৃথিবীর ভূষা ;
ক্ষেত্র না চিনিলে ভাই, আর যে নিস্তার নাই,
অন্য সাধনে ত দূর হবে না এ দশা !
উপাড়িয়া কুশাঙ্কুর, নির্ম্মল করিয়া জমি,
রোপন করহ দেখি অঙ্কুরিত আশা :
শিশিরে, বর্ষণ-পাতে, ঝড়ে, রৌদ্রে, বজ্রাঘাতে
বাড়িবে সে, দিবে ফল অপূর্ব্ব মনীষা !

(ধূয়া)

(পঞ্চম পদ)

আয় ভাই, ভারতের ধূলা মাখি গায় !
শক্তি-সিদ্ধ পিতৃগণ যবে যেথা বিচরণ
করেছেন, পদ-ধূলি পড়েছে তথায়।
পঞ্চনদ, অনুগঙ্গ, নর্ম্মদা-কাবেরী-তীর—
তাঁহাদের পদ-রজঃ পড়েনি কোথায় ?
খুঁজিয়া সে পদ-চিহ্ন, আয় ভাই ভক্তিভরে,

তুলিয়া সে শক্তিবীজ রাখিয়ে মাথায়।
পিতৃগণ-আশীর্ব্বাদে দূরে যাবে অবসাদ,
হৃদয়ে জন্মিবে শক্তি, বল হবে গায় ;
পর-পদাঘাত খেয়ে যে মাটিতে পড়ে আছি,
সেই যে শক্তির খনি, আয় ভাই আয়।
থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, পুষ্করতীর্থ,
সরযূ-যমুনা-গঙ্গা-শিপ্রা যথা ধায় ;
দন্তকে, সমুদ্রতটে, পূরব-পশ্চিম ঘাটে—
প্রতি পরমাণু দীপ্ত আর্য্য-মহিমায়।
মহাতীর্থ রাজস্থান,—চিতোর, হলদিঘাট,
প্রতাপের পদরেণু পাবরে তথায়,
স্মরিলে যাঁহার নাম রক্ত-ধারা দ্রুত বহে
আজি ওরে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ-শিরায় !
তীর্থে যদি যাবে ভাই, চল তবে আগে যাই
যশোহর, রামগড়, রাজপুতনায় ;
বীরের চরণ-রেণু, বীর-রক্ত, বীর্য্য-লেখা
এখনো মুছেনি বুঝি তাহাদের গায়।

(ধূয়া)

শেষপদ

(সমস্বরে)

চল ভাই, বসে আর কেঁদে কাজ নাই,
কাঁদিলে বাড়ে না বুদ্ধি, কাঁদিলে ঘটে না সিদ্ধি,

কেবল কাঁদিয়া বড় কে কোথায় ভাই!
লইয়া মায়ের খুসি, মায়েরে আদর করি,
মায়ের নয়ন বারি এসরে মুছাই;
মোদের মা মহাশক্তি করিলে তাঁহারে ভক্তি,
পাব সুখ, পাব মুক্তি, আর ভয় নাই!
যাঁহাদের পুণ্য বলে ভুবন-বিখ্যাত মাতা,
তাঁহাদের রক্ত-মাংস এদেহে কি নাই?
সেই রসে, সেই বীর্য্যে এ দেহের অস্থি-মজ্জা,
এখনো যে পদে পদে পরিচয় পাই।
এস হিন্দু, মুসল্‌মান, এস বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান!
রক্ত মাংসে আমাদের ভেদ যদি নাই,
তবে কেন নিরর্থক কল্পিয়া অলীক ভেদ,
হাসাই শত্রুর মুখ, মায়েরে কাঁদাই?

(রাজসাহী—১৫।১২।১৪ বাং)

---

(৮)

আত্মশুদ্ধি।

হিন্দুর সকল কাজেই শুদ্ধি একটা প্রধান ব্যাপার। শুচি এবং শুদ্ধি প্রায় একই কথা। অশুচি বা অশুদ্ধ অবস্থায় যাহা কিছু করা যায় তাহাই ব্যর্থ হয়, তাহাতে কুফল ফলে। সেইজন্য স্নান আহার চলা বসা প্রভৃতি সকল কাজেই হিন্দুর শুচি বাই আছে।

হিন্দুর জপ, তপ, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধির প্রয়োজন, তজ্জন্য আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, ভূমিশুদ্ধি এবং

আত্মশুদ্ধি, এই পাঁচটি শুদ্ধিকার্য্য আগেই করিয়া লইতে হয়, নতুবা সেই সকল জপ পূজা কিছুই শুদ্ধ হয় না, কিছুতেই অভিলষিত ফল পাওয়া যায় না। যে যকল মন্ত্র এবং মুদ্রার সাহায্যে এই সকল শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, সেই সকল পর্য্যন্তও শুদ্ধ হওয়া চাই। মন্ত্রগুলির কেবল বর্ণশুদ্ধি হইলে চলিবে না, তাহার উচ্চারণ পর্য্যন্ত শুদ্ধ হওয়া দরকার। এই শুদ্ধিবাই বা শুচিবাই একটা খামখেয়ালী নহে, একটু চিন্তা করিলেই ইহার প্রয়োজন বুঝিতে পারা যাইবে।

সকল ক্রিয়ার মূলই কর্ত্তা, এবং সকল উপকরণের প্রধানই কর্ত্তার মন। আসনশুদ্ধি প্রভৃতি যতপ্রকার শুদ্ধি আছে, তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য মনটাকে শুদ্ধ রাখা। আসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বেই যদি সেই আসনটী বা স্থান ও দ্রব্যাদি দেখিয়া মনটা অপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে জপ ও পূজাদিতে সুফল পাইবার পক্ষে মনের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত সেরূপ অবস্থা হইতে পারে না।

স্থান আসন প্রভৃতি একটুকু যত্ন করিলেই মনের মত পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মনটাকে পরিষ্কার করিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন; সেইজন্য যাবতীয় শুদ্ধির মধ্যে আত্মশুদ্ধিকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল বাহ্যবস্তুর শুদ্ধিবিধান করিলেই মনের শুদ্ধি সম্পাদিত হয় না, মনের অশুদ্ধি এবং আবর্জ্জনা দূর করিয়া তাহাকে দেবারাধনার উপযুক্ত করিতে অনেক যত্ন-পরিশ্রম, অনেক সাধনার প্রয়োজন। আজন্ম জন্মাবধি যে ভাবে প্রতিপালিত, যেরূপে শিক্ষিত এবং যে সকল ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাহাতে এত অশুদ্ধি, এত আবর্জ্জনা মনের মধ্যে জমিয়া যায় যে, সেগুলিকে ঘসিয়া মাজিয়া দূর করিয়া মনকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। সাধকেরা দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া এই সকল ময়লা দূর করিতে পারিলে তবেই

তাঁহাদের মন প্রকৃত দেবারাধনার উপযুক্ত হয়, এবং তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন, দেবারাধনার ফল প্রাপ্ত হন।

কিন্তু আমি আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলিতেছি না, আমার প্রস্তাবের সে উদ্দেশ্য নহে, এবং আমি সে উপদেশদানের যোগ্য পাত্রও নহি। এখন আর আমরা আধ্যাত্মিক জীব নহি, কলির প্রভাবে মানবের আধ্যাত্মিকতা প্রায় তিরোহিত হইয়াছে, আত্মার দিকে দৃষ্টি করিবার বা তাহার অবস্থা চিন্তা করিবার অবসর আমাদিগের নাই। আমরা এখন আহার, বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বৃত্তি বিভব এবং জয় পরাজয় লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আত্মশুদ্ধির অভাবে এই সকল সামাজিক বাহ্য ব্যাপারে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিয়াও আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না। এই সমুদয় কার্য্যের উদ্দেশ্যই সুখ, শান্তি, তৃপ্তিলাভ করা। কিন্তু আমরা প্রাণপণ খাটিয়া যাহা লাভ করিতেছি, তাহাতেও সুখ শান্তি বা তৃপ্তি পাইতেছি না —কেবল আত্মশুদ্ধির অভাবে। ন্যায়-সত্য-ধর্ম্মপথে অর্থ উপার্জ্জন করা কষ্টকর, অথচ কষ্টের পথে চলিতে আমরা বড়ই নারাজ, তাই চৌর্য্য, প্রতারণা এবং মিথ্যার দ্বারা তাড়াতাড়ি ধনবান হইবার জন্য আমরা অনেকেই ব্যগ্র থাকি। এই সকল উপায়ে অনেকেরই ধনাগম হয় বটে, কিন্তু ধনের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সুখশান্তির পরিবর্ত্তে নরকযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। চোর যখন চুরি করিতে যায়, তখনই তাহার মনের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। ন্যায়ধর্ম্মের কাহিনী চোরে শোনে না, কিন্তু ভয়ের কাছে সকলেই জব্দ, ভয় কাহাকেও ছাড়ে না। চোর যদি চুরির সময়ে ধরা পড়ে, তবে সেখানেই তাহার সুখ শান্তির শেষ।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদি সে ধরা না পড়ে, তাহা হইলেও ভয়ের হাতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। চোরের প্রথম বিপদ্—সেই অপহৃত দ্রব্য কোথায় লইয়া যাইবে এবং কেমন করিয়া লুকাইয়া রাখিবে। তাহার পরে দ্বিতীয়

বিপদ্—সে যাহার নিকট বিক্রয় করিতে যাইবে, সে একশত টাকার দ্রব্য রাখিয়া পাঁচটী টাকা দিবে, তাহাতে স্বীকার না করিলে হয়ত সে চুরি ধরাইয়া দিবে। তৃতীয় বিপদ্—চুরিতে ধরা না পড়িলেও চোরকে প্রায় সকলেই চিনে এবং কেহ তাহার কথায় বা কাজে বিশ্বাস করে না। চতুর্থ বিপদ্—সর্ব্বদাই তাহাকে শঙ্কিত থাকিতে হয়, লাল-পাগড়ী দেখিলেই সে মনে করে তাহাকেই ধরিবার জন্য পুলিশ আসিয়াছে। মিথ্যাবাদী প্রতারক প্রভৃতির অবস্থাও এইরূপ; ধরা পড়িবার আশঙ্কা সর্ব্বদা তাহার চিত্তে একটা নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখে।

সামাজিক লোকের প্রধান সম্বল চরিত্র। চরিত্র হৃদয়ের একটা ভাব, যাহা দীর্ঘকালের ব্যবহারে গঠিত হয়, এবং যাহা দ্বারা চালিত হইয়া লোকে চলাফিরা করে। কোন একজন লোককে আমি জানি, ইহার অর্থ, লোকটীর চরিত্র কিরূপ তাহা অবগত আছি। আমার পরিচিত কোন লোক যদি অকস্মাৎ একটা সঙ্কটে পড়ে, তাহা হইলে সে কিরূপ ব্যবহার করিবে, সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিবে কি না, তাহা আমি বলিয়া দিতে পারি। অতএব চরিত্র গঠনের সময়ে যিনি আত্মশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন, তিনি সুগঠিত-চরিত্র, সচ্চরিত্র বা সাধু-চরিত্র হইতে পারেন। যাহার চরিত্র এইরূপ শুদ্ধভাবে গঠিত হয়, তাহাকেই প্রকৃত মনুষ্য বলা যাইতে পারে। আমরা যে সমাজে বাস করি, তাহাকে মনুষ্য-সমাজ বলে। এই দ্বি-পদ সমাজ মনুষ্য-সমাজ নামে পরিচিত বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে, ইহাদের মধ্যে মনুষ্য সংখ্যা অতি অল্প, বিড়াল, কুকুর, গরু, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক।

মনের আবর্জ্জনার কথা বলিয়াছি। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মনের অসংখ্য আবর্জ্জনা আছে। আমাদের সমাজে অর্থাৎ

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে চতুরাশ্রম যখন প্রচলিত ছিল, তখন প্রথমাশ্রমে শুদ্ধ-চরিত্র গুরুর কৃপায় ব্রহ্মচারীর পক্ষে আত্মশুদ্ধি স্বাভাবিক ছিল। তখন গুরুর কৃপায় মনে কোন জঞ্জাল স্থান পাইত না। কিন্তু এখন গুরুর আশ্রম নাই, ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থাও নাই। এখন যে বার-মিশাল সমাজে বালক বালিকারা প্রতিপালিত হইতেছে, তাহাদের মনে চারিদিক হইতে জঞ্জালরাশি পুঞ্জীকৃত হইতেছে। পিতামাতা সংসার এবং অর্থচিন্তায় ব্যস্ত, সন্তানের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্যপালন করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। শিক্ষকও সংসারচিন্তা, নিজের আরাম, দলাদলি এবং পদোন্নতির যত্নে তৎপর, পাঁচ ঘণ্টায় পাঁচশ্রেণীতে যাইয়া পুস্তকের কথাগুলি বলিয়া দিয়াই খালাস। বালকবালিকা এক প্রকার নাওয়ারিশ জন্তু; এ অবস্থায় পূর্ব্বকালের মত তাহাদের মন যে প্রথম হইতেই সম্পূর্ণরূপে আবর্জ্জনা-বর্জ্জিত হইবে, এরূপ আশা করাই যায় না। খেলা-ধূলা, নানাস্বভাব-সঙ্গী, চাকর চাকরাণী, পাড়াপ্রতিবেশী, সকলের কথাবার্ত্তা এবং আচার ব্যবহার হইতে অনবরত তাহাদের হৃদয়ে জঘন্য আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া তাহাদের চরিত্র গঠন করিতেছে। যে সমাজে বালকবালিকাদিগের অবস্থা এরূপ শোচনীয়, সেই সমাজে বিশুদ্ধচরিত্র মানবের আবির্ভাব একপ্রকার অসম্ভব, তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য এবং দৈবকৃপা না থাকিলে তাহার আশা করা যায় না।

পূর্ব্বে সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুণে বালকবালিকাদিগের সাধু-চরিত্র আপনা হইতে গঠিত হইয়া উঠিত। এখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে তাহা অসম্ভব। চিরদিনই সচ্চরিত্রগঠনে নিজের যত্নের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এখন সেই যত্নের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। আমাদের মনে এত আবর্জ্জনা, এত কদর্য্যভাব, এত নীচতা স্তূপীকৃত হইয়াছে, যে সে সমস্ত সদভ্যাস দ্বারা দূর করা অসম্ভব। কিন্তু আশার কথা এই

যে, একটী কোন বিশেষ নীতিকে প্রাণান্তিক প্রতিজ্ঞার জোর করিয়া অবলম্বন করিতে পারিলে তাহারই প্রভাবে হৃদয়ের দুর্নীতিগুলি ক্রমে শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে মৃতবৎ অকার্য্যকরী হইতে পারে। স্মরণ হইতেছে না কোথায়, অনেক দিন হইল একটী গল্প পড়িয়াছিলাম। বোধ হয় জার্ম্মেনীতে অতি অদ্ভুত রকমের একটী লোক ছিল। চুরি প্রভৃতি কোনও কুকর্ম্ম করিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, সুযোগ পাইলেই সে কাহারও কোন বস্তু চুরি করিয়া ফেলিত, অথবা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিত, কিন্তু চুরি করিয়া সাবধান হইবার অভ্যাস তাহার ছিল না। অপহৃত দ্রব্যটী হয় যেথানে সেথানে ফেলিয়া রাখিত, না হয় যাহাকে তাহাকে দিয়া ফেলিত। কিন্তু এই কদর্য্য চরিত্রের মধ্যে তাহার এই একটা গুণ ছিল যে, সে মিথ্যা কথা বলিতে একেবারেই জানিত না। তাহার হাতে কোন দ্রব্য দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই সে বলিয়া ফেলিত, অমুকের এই জিনিষ অমুক স্থান হইতে অমুক অবস্থায় আনিয়াছি। এই অবস্থায় তাহার ধরা পড়িতে বিলম্ব হইত না। পুলিশে ধরিয়া তাহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিলে তাহার অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীসাবুদের কোন প্রয়োজন হইত না, হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেই সে সব কথা বলিয়া ফেলিত। এই অবস্থায় সে অসংখ্যবার অভিযুক্ত হয় এবং প্রত্যেকবার কারাদণ্ড ভোগ করে। ক্রমে হাকিমরা তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন এবং দেশের মধ্যে তাহার অদ্ভুত চরিত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, পুলিশ তাহাকে মিথ্যা জবাব শিখাইয়া দিয়াছে; কিন্তু হাকিম জিজ্ঞাসা করিলে সে সব শিখান কথা তাহার মনে থাকে না, সে সত্য কথাই বলিয়া থাকে। অবশেষে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বিচারকের নিকট হইতে তাহাকে চাহিয়া লইলেন, এবং তাহাকে নিজের

পরিবারে ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। তাহার সঙ্গে এই সর্ত্ত থাকিল যে, তাহার কোন কার্য্যে মনিব বাধা দিবেন না, কিন্তু যে কার্য্যই করিতে যাউক মনিবকে জানাইয়া যাইবে। সে তাহাতে স্বীকৃত হইল এবং কাজ করিতে লাগিল। মনিবের বাড়ীতে বা কোন পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ীতে কোন ভাল জিনিস দেখিলেই যখন তাহার চুরি করিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু প্রতিজ্ঞা অনুসারে চুরি করিবার পূর্ব্বে সে উদ্দেশ্য প্রকাশ করিত, তখন মনিব বলিতেন, "যাও, তুমি চুরি কর, কিন্তু এই চুরির ফলে কি হইবে, ইহাতে তোমার লাভ বা সুখ কতটা হইবে, এবং যাহার জিনিস চুরি করিবে তাহার মনে কি হইবে, ইত্যাদি কথা আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহার পরে চুরি কর।" এইরূপে তিনি তাহার অভিপ্রেত কার্য্যের আলোচনা করিয়া দুই চারি কথাতেই তাহার অনিষ্টকারিতা তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন এবং সে সেই কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হইত। ক্রমে দেখা গেল তাহার হৃদয়টা খুব সরল; এবং পণ্ডিতের উপদেশে সে একজন পরম সাধু বলিয়া গণ্য হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, তাহার মাতা অশিক্ষিতা হইলেও সত্যবাদিনী ছিল এবং পিতা একজন ভয়ানক চোর ছিল। পিতামাতার নিকট হইতে এই দোষ ও গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার এইরূপ অদ্ভুত চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।

সত্যবাদিতার উদাহরণ হিন্দুশাস্ত্রে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একজন মুনি এত সাবধান ছিলেন যে, পাছে অনবধান-বশতঃ মুখ দিয়া কোন অসত্য কথা বাহির হইয়া যায়, এই ভয়ে এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা মুখ বাঁধিয়া রাখিতেন. এবং কোন প্রশ্ন হইলে, মনে মনে সত্য উত্তর কি তাহা গঠন করিয়া মুখের বন্ধন খুলিয়া কথা বলিতেন।

হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, পুরাকালে ব্রহ্মশাপকে লোকে

বড় ভয় করিত। ইহার কারণ কি? ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ, তিনি যাহাকে যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে, ইহাই নিশ্চয় জানিয়া লোকে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ চাহিত এবং শাপকে ভয় করিত। ব্রাহ্মণ এখনও আছেন, কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিতে বা অভিসম্পাত করিতে তাঁহার কোন্ আপত্তি নাই। কিছু পাইলে হয়ত দাতাকে রাজা হইবার আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আবার ক্রুদ্ধ হইলে চৌদ্দপুরুষকে রসাতলে দিতেছেন; কিন্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদে কাহারও লাভ বা অভিসম্পাতে কাহারও ক্ষতি বড় একটা হয় না। ইহার কারণ যথোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সুতরাং তাঁহার বাক্যও সত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। সত্যের প্রভাব এমনই চমৎকার যে, যাঁহার হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার মুখ দিয়া সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনই বাহির হইতে পারিবে না। যিনি তপস্যার বলে সত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে মিথ্যা, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ স্থানই পাইতে পারে না, কারণ সর্ব্ব বিষয়েই সত্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি যায় এবং দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি সকলের মূলেই তিনি মিথ্যা দেখিতে পান। অপর দিকে, মিথ্যা বলা যাহার অভ্যাস, সে সত্য কথা বলিলেও তাহা মিথ্যা হইয়া যায়, তাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যাই তাহার সমস্ত মিথ্যা করিয়া ফেলে। যে সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলে, তাহার সত্য কথাও কেহ বিশ্বাস করেনা, এ কথা সকলেই জানেন।

এইরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও দেখা যাইবে, যাঁহার হৃদয়ে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত কথা এবং সমস্ত কার্য্যই প্রেমের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। নিত্যানন্দ কলসীর কাণার আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হইয়াও আততায়ীকে প্রেমের আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত করিয়াছিলেন, যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়াও হত্যাকারীদের জন্য ঈশ্বরের নিকট

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রেমের স্বভাব সকল অবস্থায় প্রেমই বর্ষণ করিবে, প্রেমের প্রভাবে হৃদয়ে অন্য কোন নীচবৃত্তি স্থান পাইবে না। প্রেমের প্রভাব এত প্রবল যে হিংস্র মানব বা হিংস্র জন্তুও তাহার প্রভাবে নিজের স্বাভাবিক হিংসা পরিত্যাগ করে। অনেক সাধু সন্ন্যাসী যোগী, ফকির অরণ্যের ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকেন, এরূপ গল্প শুনা যায়। আমরা বর্ত্তমান সামাজিক লোক এ সব কথা বিশ্বাস করি না; কিন্তু তেমন প্রেমিক যদি সমাজে বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনাও আমাদের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হইত। কিন্তু অনুধাবন করিলে প্রেমের এইরূপ প্রভাব সকলেই কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আমি যাহাকে ভালবাসি, সেও আমাকে ভালবাসে; আমি যাহাকে ঘৃণা করি, সেও আমাকে ঘৃণা করে; ইহা সামাজিক প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ বিষয়। গরু, কুকুর সম্বন্ধেও এই কথা। একটা কুকুরকে তুমি গালি দিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হও, সে তোমাকে দেখিলেই ডাকিয়া অস্থির হইবে।

সত্য, প্রেম, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সব গুণ আগ্রহযুক্ত সাধন দ্বারা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। সমাজে যে এই সকল সদ্‌বৃত্তি প্রত্যক্ষ না হইতেছে এমন নহে। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ কলিপ্রভাবে কোন বস্তুই বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। নূতন সভ্যতার কপটতা সমাজকে এতই প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে যে, ন্যায়ের মধ্যেও আমরা কুটিলতা দেখি, প্রেমের মধ্যেও কপটতা কল্পনা করিয়া লই। আমরা যাহার মুখে যে কথা শুনি, তাহার বুকে কপটতা আছে, তাহার মনে কোন স্বার্থসাধনের অভিপ্রায় আছে, ইহা আমরা ভাবিয়া লই, সুতরাং কপট প্রেম আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। প্রেম যদি যথার্থ সরল নিঃস্বার্থ হয়, তাহা হইলে তাহার এমন একটা শক্তি, এমন একটা আকর্ষণ আছে

যে, আমরা তাহাতে আকৃষ্ট, মুগ্ধ এবং বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারি না।

হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির মূলে অপ্রেম রহিয়াছে, এবং এই অপ্রেমের জন্যই মানবসমাজে পরস্পরের মধ্যে এত শত্রুতা প্রত্যক্ষ হইতেছে। দেশে দেশে শত্রুতা, জাতিতে জাতিতে শত্রুতা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শত্রুতা—সমাজের যে দিকে তাকাই সেদিকেই দেখিতে পাই কেবল শত্রুতাই নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। ন্যায়, সত্য, ক্ষমা, পরোপকার, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, পবিত্রতা অবাধে বিরাজ করিলে যে সমাজ সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রফুল্লতা এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মের স্বর্গীয় নিকেতন হইতে পারিত, সেই মানবসমাজ হিংসা দ্বেষ, নিন্দা, চর্চ্চা, কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতার কুফলস্বরূপ ঘোর শত্রুতার আবাস হইয়া নিয়ত নরকের যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে।

মানব চিন্তাশীল জীব, সে জাগ্রত অবস্থায় চিন্তা না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিদ্রাতেও সে চিন্তা করে বটে, কিন্তু সে চিন্তা অসংযত বিশৃঙ্খল মনের কার্য্য, সেজন্য এই বিশৃঙ্খল চিন্তাকে চিন্তা না বলিয়া স্বপ্নই বলা হয়। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যোগী ভিন্ন কেহ চিন্তাশূন্য থাকিতে পারে না, কেননা মন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না, এবং মনের কার্য্যই চিন্তা নামে অভিহিত। মানবের চিন্তা যে রাজ্যে বিচরণ করিত সে রাজ্য ছাড়িয়া এখন মাটীর রাজ্যেই বিচরণ করিতেছে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এখন বিস্মৃত এবং বিদ্রূপের বিষয়, জড়তত্ত্বই মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। জড়তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা মানব সমাজের যে উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহারও মূলে অর্থ উপার্জ্জন এবং সেই অর্থ দ্বারা শত্রুতা সাধন। যাঁহারা জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত, তাঁহারা কিসে মানবের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে এবং কিসে নিজের জাতি অপর

জাতিকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিবে এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। কি উপায় অবলম্বন করিলে, কোন বিষ আবিষ্কার করিতে পারিলে, নিজে নিরাপদ্ থাকিয়া শত্রু অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বিনাশ করা যাইতে পারে, বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ সেই গবেষণাতেই ব্যস্ত। বড় বড় বিদ্বান্ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির এই অবস্থা। আমাদের মত অসংখ্য ক্ষুদ্র লোকের অবস্থা, কি? যাহাদের অন্ন-সংস্থান নাই, পরিশ্রম করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হয়, তাহারা অন্নচিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং শত্রুতাসাধনের অবসর তাহারা অল্পই পাইয়া থাকে। যাহাদের অন্নসংস্থান আছে, তাহাদের দুইটীমাত্র কার্য্য প্রধান—শত্রুকে আক্রমণ করা এবং শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করা। যাহারা ঢাল এবং তরবারি লইয়া বাস্তব এবং কল্পিত শত্রুর সঙ্গে দিবারাত্রি যুদ্ধকার্য্যে ব্যস্ত, তাহাদের এই নারকীয় জীবন যুদ্ধকার্য্যেই পরিসমাপ্ত হইবে, সুখশান্তি এবং আনন্দলাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। নিদ্রায় আট ঘণ্টা সময় বাদ দিয়া অবশিষ্ট যে ষোল ঘণ্ট থাকে তাহার পনর ঘণ্টা সময় বৈরনির্য্যাতনের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়, অবশিষ্ট একঘণ্টা বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য থাকে। সামাজিকতার অনুরোধে এবং ধর্ম্মকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দৈনিক উপাসনায় বসিবার অভ্যাস যদি থাকে, তবে সেই সময়টুকু লোকের সঙ্গে শত্রুতা এবং মামলা মোকদ্দমার পরিচিন্তনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়াই বোধ হয়। উপাসনার সময়ে যদি ঈশ্বরের কথা কখনও মনে পড়ে এবং তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবার কিছু থাকে, তবে তাহাও সেই শত্রুদমন। কেবল ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনেই ইহা সত্য নহে, বৃহৎ জাতিগত ব্যাপারেও ইহা একটা প্রত্যক্ষ বিষয়। কেবল ডাকাইতেরাই ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে কালী পূজা করিয়া কার্য্যের সফলতার জন্য বর প্রার্থনা করে না, পরন্তু বড় বড় জাতিও যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে,

গীর্জ্জায়, মসজিদে, মন্দিরে সমবেত হইয়া বিজয়ের জন্য বর প্রার্থনা করেন। মানুষ মনে করে, সে যখন ঈশ্বরের ভক্ত, তখন ঈশ্বরও তাহার দলস্থ, সুতরাং তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া যান কোথায়? কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের যে কি বিপদ্ তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। রাম শ্যামের সঙ্গে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য ৺বগলার পূজা করিতেছে, কিন্তু শ্যামও যে সেই দেবতার পূজা করিয়া সেই বরই চাহিতেছে, ইহা সে ভাবিয়া দেখে না।

বাস্তবিক মানুষ মানুষের শত্রু নহে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অন্যায়, অধর্ম্ম এই গুলিই মানুষের প্রকৃত শত্রু। রাম এবং শ্যামের ভিতরে এই সকল অশুদ্ধ ভাব পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করিতেছে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে শত্রুতা। যদি এইগুলি তাহাদের ভিতর হইতে দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহাদের মধ্যে শত্রুতা আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। বাস্তবিক শত্রুদমনের জন্য দেবারাধনের যদি কোন উপকারিতা, কোন সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে এই সকল শত্রুদমনের প্রার্থনাতেই তাহা পূর্ণ হইতে পারে। ইহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই মঙ্গল, এবং দেবতারাও এইরূপ প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মঙ্গলসাধনই দেবতার স্বভাব; যে সকল অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহা আমাদেরই কার্য্য। ঝড়ে, জলে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে মানুষ কষ্ট পায় এবং মরিয়া যায়, এই সকলকে আমরা অমঙ্গল মনে করি, এবং সেই জন্য দেবতাকে অমঙ্গলকারী মনে করি। আমাদের মতে বাঁচিয়া থাকাই মঙ্গল, এবং মরিয়া যাওয়াই অমঙ্গল; কিন্তু লীলাময় স্রষ্টার বুদ্ধিতে জীবন মরণে বড় পার্থক্য নাই। বাস্তবিক মরণশীল মানবের মরণে অমঙ্গল কিছুই নাই, কিন্তু হিংসা, দ্বেষ, অন্যায়, অধর্ম্মে তাহার যথেষ্ট অমঙ্গল আছে, এই সকল ঘোর শত্রু মানবের জীবনকে বিষময় করিতেছে,

তাহাকে মানবত্ব হইতে পশুত্বে টানিয়া নামাইতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, আমরা তত্ত্বজ্ঞান হইতে দূরে পড়িয়াছি, ইহ-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছি; কাজেই ঐহিক সুখ সৌভাগ্য এবং জয় পরাজয়ের মোহে পড়িয়া আমরা আত্মঘাতী হইতেছি।

এই অসার শত্রুতা সাধনে মানুষকে বিজিত বিপন্ন এবং বিধ্বস্ত করিবার চিন্তায় আমাদের যে পরিমাণ সময় অর্থাৎ জীবন যাইতেছে তাহা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে ব্যাকুলতায় পাগল হইতে হয়। এই চিন্তা, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় যদি মানবের প্রকৃত মঙ্গলসাধনের জন্য, শত্রুতা সাধনের পরিবর্ত্তে মিত্রতা সাধনের জন্য হইত, তাহা হইলে মানবসমাজের অবস্থা দেবসমাজের তুল্য হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে চিন্তা মনুষ্যবধের উপায় আবিষ্কারে ব্যয়িত হইতেছে, সেই চিন্তা যদি মনুষ্য রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যয়িত হইত, যে কষ্ট পরিশ্রম মনুষ্যের দুঃখ দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বীকার করা যাইতেছে, তাহা যদি মনুষ্যের সুখশান্তি বিধানে অবলম্বিত হইত, যে অর্থ সৈন্যপোষণে এবং অস্ত্রনির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে, তাহা যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী প্রকৃতই স্বর্গ হইত, এই সমাজ প্রকৃতই দেব সমাজ হইত। মানবসমাজে শত্রুতা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ইহার শেষ যে কোথায় হইবে তাহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। আমার বোধ হয়, মানবের এই মারণবিজ্ঞান এতদূর উন্নতি লাভ করিবে যে, বিদ্যুৎ বা অন্য কিছুর সাহায্যে এমন একটা সহজ ও সুলভ যন্ত্র উদ্ভাবিত হইবে, যাহা দুই চারি গণ্ডা পয়সা খরচ করিলেই সকলে রাখিতে পারিবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের আততায়ী হইয়া সেই অমোঘ অস্ত্রের প্রভাবে পরস্পর বিনষ্ট হইবে। তখন পৃথিবী নির্ম্মনুষ্য হইবার উপক্রম হইলে যদি মানুষের শুভ বুদ্ধি জন্মে এবং সেই বৈরভাব তিরোহিত হয়।

আত্মশুদ্ধির ক্রিয়াটী নিজের মধ্যেই আছে। আমাকে ভাল করিবার শক্তি কেবল আমারই আছে, আর কাহারও নাই। গুরুর কৃপা এবং পিতামাতা ও শিক্ষকের উপদেশ সহায়তা করে বটে, কিন্তু মঙ্গলের বীজ, ভাল হইবার সম্বন্ধ আমার মধ্যেই থাকা চাই। কেবল উপদেশেই যদি কার্য্য হইত, তাহা হইলে জগতে অসৎ কেহ থাকিত না। শিক্ষকেরা সর্ব্বদা সকলকে ভাল হইবার জন্যই উপদেশ দিতেছেন, অসৎ হও বা দুষ্ট হও বলিয়া তাঁহারা কোন ছাত্রকে উপদেশ দেন না। তথাপি ছাত্রেরা সকলে সৎ হয় না কেন? তাহারা শিক্ষকের উপদেশ শুনে বটে, কিন্তু দুষ্ট সঙ্কল্প তাহাদিগকে ত্যাগ করে না। কি বেদ, কি কোরাণ, কি বাইবেল কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই মানুষকে অধার্ম্মিক হইবার উপদেশ দেয় না; তথাপি হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাধু অধার্ম্মিকের সংখ্যাই বেশী। যদি কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশেই কাজ হইত, তাহা হইলে আমরা হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টান প্রভৃতির মধ্যে অন্ততঃ পনের আনা তিন পাই সাধু সজ্জন দেখিতে পাইতাম। সাধুসজ্জন হইবার সঙ্কল্প তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রও আমাদের নিকট অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কথায় বার্ত্তায় এবং পোষাক পরিচ্ছদে সকলেই সাধুসজ্জন এবং ধার্ম্মিক। কিন্তু আমরা যদি একবার এমন স্থানে এবং এমন অবস্থায় পড়ি যে, আমরা ইচ্ছামত কাজ করিতে পারি, আমাদের কোন কাজে বাধা দিতে আইন কানুন, পুলিশ, পাহারা কিছুই বর্ত্তমান নাই, তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইতে পারে, কে কত ধার্ম্মিক, কে কত সজ্জন।

এখন আত্মশুদ্ধির চেষ্টা নাই, কিন্তু পরশুদ্ধির পালা উপস্থিত হইয়াছে। আমার চরিত্র কিরূপ, আমি ভাল কি মন্দ, এ বিষয়ে আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিয়ম নাই, অবসর নাই। আমি যে ভাল,

আমি যে খুব বুঝি, ইহা ত জানাই আছে, সুতরাং এ বিষয়ে আর অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু আমি ছাড়া আর সকলেই যে দোষী, সুতরাং নিন্দাভাজন, ইহা একপ্রকার স্বীকার্য্য। এই ভাব সমাজে এত প্রবল হইয়াছে যে আমার হাতে সাধু অসাধু কাহারও নিস্তার নাই, সকলেই আমার সমালোচনার পাত্র। নবযুগের প্রকৃত মহাজন এমন কি মহাত্মা গান্ধী, সমালোচনা উপস্থিত হইলে, বোধ হয় তিনিও নিস্তার পান না।

আত্মশুদ্ধিতে অবহেলা এবং পরশুদ্ধিতে আগ্রহ যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন সমাজের মঙ্গল নাই। এই পাপ এখন আর ব্যক্তিতে নিবদ্ধ নহে, জাতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধে হিন্দু দেখিতেছেন মুসলমানের দোষ, আর মুসলমান দেখিতেছেন হিন্দুর দোষ; তবে মাত্রায় বেশীকম আছে, এই মাত্র। জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে, ভিতরে ভিতরে আগুণ জ্বলিতেছে, কেবল সভ্যতার আবরণে, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে এবং ভাষার চাতুর্য্যে তাহার ধূম ঢাকিয়া রাখিতেছে। যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়িয়া দাও, সৈন্য সামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র কমাইয়া ফেল, এই ধূয়া সকলেই ধরিয়াছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভবিষ্যৎ বিমানযুদ্ধের জন্য শক্তিনিচয় প্রস্তুত হইতেছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি এবং ধর্ম্মনীতি, সর্ব্বত্রই এই কপটতা অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির অভাব রাজত্ব করিতেছে। রাজা প্রজা, পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী এবং গুরু শিষ্যে পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, অন্যে পরে কা কথা! পৃথিবীতে মানবের এই অবস্থা দেখিয়া মনে আপনা হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, মানবসমাজই শ্রেষ্ঠ, না পশুসমাজ শ্রেষ্ঠ? পশু ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অধর্ম্ম করিতেছে না, স্বজাতির ধ্বংসসাধন করিয়া গর্ব্বিত হইতেছে না। পশু স্রষ্টার

নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছে তাহারই যথোচিত ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু মানুষ তাহার অনুচিত এবং বিপরীত ব্যবহার করিয়া পশু হইতেও অধম হইতেছে। মানুষ বুদ্ধির বলে এবং লেখনীর কৌশলে অন্যায়, অধর্ম্ম, মিথ্যা এবং নৃশংসতার ভূমিতে বিচিত্র সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া আত্ম-গৌরব অনুভব করিতেছে এবং নিজের সমাজের লোকের নিকট বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলিয়া বাহবা পাইতেছে, কিন্তু প্রতিপক্ষে লেখনী আবার সেই ধবল সৌধকে মসীলিপ্ত করিয়া অন্য লোকের চক্ষে ধরিতেছে এবং জগতের লোকে তাহা দেখিয়া উপহাস করিতেছে। সাহিত্যের এই সকল স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা জগতে কতদিন থাকিবে, কে তাহা বলিবে এবং কে সেই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নামগুলি মনে রাখিয়া মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিতে চাহিবে? মান্ধাতা, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি নাম এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, আর মিথ্যার সূতায় গাঁথা তোমার আমার রচিত কীর্ত্তিমালা স্থায়ী হইবে, আর লোকে তাহারই জন্য তোমার আমার নাম স্মরণ করিয়া ধন্য ধন্য বলিবে, এই আশা বিড়ম্বনা এবং আত্ম-প্রতারণা। কত বড় বড় লোকের বড় বড় কথা শুনিতেছি, এবং তাহাই লইয়া দিনরাত্রি আলোচনা করিয়াছি ও করিতেছি; কিন্তু তাঁহারা যখন চলিয়া যান, তখন কত জনে তাঁহাদের কথা মনে রাখে? ভারতে কত বড় বড় লাট পাঁচ বৎসরের হুন্দা লইয়া আসিতেছেন এবং পাঁচ বৎসরের পরেই চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রতাপ পৃথিবীর কোন সম্রাটের চেয়ে অল্প নহে। তাঁহারা যতদিন উপস্থিত থাকেন, বোধ হয় ততদিন দেবতার চেয়েও অধিক সম্মান এবং পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যেদিন তাঁহারা চলিয়া যান সেদিন হইতে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কে তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া থাকে? লর্ড কার্জ্জনের মত নামজাদা, জবরদস্ত লাট, বোধ হয়

ভারতে আর আসেন নাই; কিন্তু আজ কয়জনে তাঁহার নাম মুখে আনে? কার কি নাম এবং কে কখন এদেশে উপস্থিত ছিলেন, বালকেরা পরীক্ষার অনুরোধে তাহা মুখস্থ করে বটে, কিন্তু পরীক্ষা হইয়া গেলেই ভুলিয়া যায়।

এই সকল রাজ্য, ধন, যশ, মান, কীর্ত্তি, কাহিনী, দেহ এবং বিরাট কর্ম্মজাল, এই সমস্তই জলবিম্ববৎ ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ইহারা সকলেই অনিত্য, অস্থায়ী এবং ক্ষণভঙ্গুর; ইহাদের মধ্যে একটী মাত্র বস্তু নিত্য বা স্থায়ী, এবং তাহাই তোমার আমার আত্মা। এই নিত্য বস্তু শুদ্ধির জন্য যে ব্যাকুলতার সহিত যত্ন করিতে জানে, সেই বুদ্ধিমান, সেই সুধী, সেই ভাগ্যবান এবং সেই আনন্দের অধিকারী। যে গৃহস্থ বুদ্ধিমান, সে গাছের আম পাড়িয়া খায় এবং অন্যকেও বিতরণ করে, কিন্তু ফল পাইবার জন্য ডাল ভাঙ্গে না, গাছ কাটে না। মানব সমাজে যাহা দেখিতেছি, সে সমস্তই আমের মত অস্থায়ী ভোগের বস্তু; কিন্তু আমরা সেই অস্থায়ী ভোগ্যবস্তুর লোভে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া গাছটীকে কাটিয়া ফেলিতেছি—আত্মাকে অশুদ্ধিতে তাড়িত করিয়া তাহাকে অবনত, বিপন্ন করিতেছি; আমরা এমন কি বুদ্ধিমান!

প্রাচীনকালে গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য ছিল—মানব জাতির উপকার। শুদ্ধাত্ম ঋষিগণ সংসারের আকর্ষণ এবং কোলাহল হইতে দূরে থাকিতেন, এবং জীবনব্যাপী ধ্যান, ধারণা ও জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। তাঁহাদের তপস্যালব্ধ ফলগুলি তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন—কেবল আমাদের উপকারের জন্য, তাঁহাদের নিজের জন্য নহে। তাঁহারা নাম যশ ধন বা সমালোচনা কিছুই চাইতেন না, লোকে পড়িয়া উপকৃত হইবে, এই ভাবিয়াই তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। তাঁহারা

যে নাম-যশ চাহিতেন না, তাহার একটা প্রমাণ এই ;—অনেক পণ্ডিত, মহর্ষি বেদব্যাসের নামে পরিচিত অনেক গ্রন্থের ভাষা এবং রচনা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করেন, ঐ সকল গ্রন্থ মহর্ষি বেদব্যাসের লিখিত নহে, অন্যান্য গ্রন্থকার ঐ সকল গ্রন্থ লিখিয়া বেদব্যাসের রচিত বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। বেদব্যাসের নামে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িলেই তাঁহারা কৃতার্থ, নামের জন্য তাঁহারা লালায়িত নহেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। নিজে গ্রন্থ লিখিয়া অন্যের নামে পরিচিত করা মহত্ব, উদারতা এবং নিঃস্বার্থতার একটা প্রশস্ত উদাহরণ হইলেও, ইহাতে মিথ্যার একটা ব্যবহার রহিয়াছে, এবং এই মিথ্যাটুকু তাঁহাদের প্রাণে সহ্য হইত কিনা, তাহা ভাবিবার কথা। যাহা হউক, উচ্চ-হৃদয়ে নাম এবং যশের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত লঘু ও নগণ্য বলিয়া গণ্য, তাহার দৃষ্টান্ত নব্যযুগেও বিরল নহে। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ এবং রঘুনাথ নৌকায় গঙ্গা পার হইবার সময় রঘুনাথ গৌরাঙ্গের হাতে একখানি পুস্তক দেখিয়া উহা চাহিয়া লইয়া যখন দেখিলেন, তিনি নিজে যে গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন, উহাও সেই গ্রন্থের টীকা ; কিন্তু ইহা এত উৎকৃষ্ট যে, এই টীকার প্রচার হইলে তাঁহার টীকা কেহ পড়িবে না, এই ভাবিয়া তিনি বিমর্ষ হইলেন, এবং মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ তাঁহার বিমর্ষতা দূর করিবার জন্য নিজের টীকাখানি গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিলেন। এই কলিকালে যাহা সম্ভব, আর্ষ যুগে তাহা অসম্ভব হইবার কথা নয়। পরন্তু ঐ সকল গুপ্তনামা গ্রন্থকার যদি মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য হন, তাহা হইলে গুরুর নামে নিজের গ্রন্থ পরিচিত করা মিথ্যা বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে, কারণ শিষ্যের যাহা কিছু, সমস্তই গুরুর।

মহর্ষিগণ জীবনব্যাপী তপস্যায় যে সকল সত্য উপলব্ধি করিতেন, তাহাই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিতেন ; তাঁহাদের গ্রন্থের অধ্যয়ন ও জীবন-

ব্যাপী, অর্থাৎ তাঁহাদিগের গ্রন্থ বহুবার পাঠ করিলেও তাহা পুরাতন হয় না, আবার পড়িতে ইচ্ছা হয়, এবং তাঁহাদের কথা জীবনে পরিণত করিতে পারিলে পাঠক আপনাকে ধন্য মনে করেন। বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ যাহারা পড়ে না তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যাঁহারা পড়েন তাঁহাদের কাছে এই সকল গ্রন্থ চিরদিনই নূতন থাকে, এবং নূতন নূতন ভাব প্রকাশ পাইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করে। যাঁহারা এই সকল গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঐ সকল গ্রন্থের ভাবেই তাঁহাদিগের জীবন প্রভাবিত হইতেছে। আধুনিক যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, তাহাদ্বারা কাহারও জীবন প্রভাবিত হয় না, কেন না এ সকল গ্রন্থ তপস্যার ফল নহে। গ্রন্থাদি আজকাল বাণিজ্যের নিয়মে চাহিদা অনুসারে সরবরাহ হইতেছে। সত্যের উপদেশে শিক্ষা দিয়া পাঠকের জীবনগঠনে সহায়তা করা গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, পাঠককে আমোদ দেওয়াই উদ্দেশ্য; শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকে, তাহা এত প্রচ্ছন্ন যে তাহার দিকে পাঠকের চক্ষু পড়ে না, আমোদ পাইয়াই পাঠক সন্তুষ্ট। এই সকল গ্রন্থ একবারের বেশী লোক পড়ে না, কেহ ফিরিয়া পড়িতে চাহিলেও সে অবসর পায় না, কারণ ছাগলের নাদের মত গ্রন্থের সৃষ্টি হইতেছে, একখানা নূতন গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে আর পাঁচ খানা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে গ্রন্থলেখক এবং ব্যবসায়ী বিক্রেতার যদিও যথেষ্ট অর্থলাভ হইতেছে, তাহাতে পাঠকের যে বিশেষ লাভ হইতেছে এমন বোধ হয় না। একখানা নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলে হৃদয়ে তাহার যে ছাপ পড়ে, পরে অন্য একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ব্বে পঠিত গ্রন্থের ছাপটী মুছিয়া যায়, সামান্য আভাসটা কথঞ্চিৎ স্মরণ থাকে মাত্র। ইহার কারণ, বইগুলি আমোদের জন্য পড়া হয় মাত্র,

শিক্ষার জন্য অধ্যয়ন করা হয় না, আর ইহাতে অধ্যয়নযোগ্য পদার্থ যে বেশী কিছু আছে তাহাও নহে। মহর্ষিদিগের লিখিত গ্রন্থের একখানি অধ্যয়ন করিলে এবং ঘরে রাখিলে যে ফললাভ হয়, এই সকল গ্রন্থের লাইব্রেরী রাখিয়া দিনরাত্রি পড়িলেও তাহা হয় না। হয় না কেন? আধুনিক গ্রন্থে যে ন্যায়, সত্য, জ্ঞান, ধর্ম্মের উপদেশ একেবারেই থাকেনা তাহা নহে; তথাপি প্রাচীনধর্ম্মগ্রন্থে মানবহৃদয় যে খাদ্য পায়, যে রস উপভোগ করে, যে সত্য প্রত্যক্ষ করে, যে শক্তি লাভ করে, এ সকল গ্রন্থে তাহা পাইয়াও পায় না, দেখিয়াও দেখে না। ইহার কারণ যে বিশেষ যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় তাহা নহে। সত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কিন্তু সে আকর্ষণ কথার সঙ্গে নহে, বক্তার হৃদয়ের সঙ্গে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজদত্ত বহুবিধ উপকরণে যতটা সন্তুষ্ট হন নাই, বিদুরের ক্ষুদ খাইয়া ততটা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এ স্থলে দেখা যাইতেছে দাতা, বক্তা বা লেখকের শ্রদ্ধাই প্রধান জিনিষ। অনেকের মুখে অনেক উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ে তাহার ছাপ স্থায়ী হইয়া থাকে না। আবার যে উপদেশ শত সহস্র বার শুনিয়াও তাহা মনে রাখিতে পারি নাই, সেই উপদেশের কথা একদিন প্রজ্ঞানের মুখে শুনিলে তাহা এমন ভাবে হৃদয়ে লাগিয়া যায়, যে সহস্র চেষ্টাতেও তাহা দূর করিতে পারি না, সেই উপদেশই জীবনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। যে সকল নাটক নভেল বাহির হইয়া একটা নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, স্কুল পাঠশালার যে সকল পুস্তক কুটীরবাসী লেখককে হর্ম্ম্যবাসী করিতেছে, তাহাতে কি ভাল উপদেশ নাই? উপদেশ যথেষ্টই আছে, কিন্তু সে সকল উপদেশের ফল কিরূপ হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত যুবক এবং বালকদিগের জীবনেই জাজ্জ্বল্যমান। ন্যায়, সত্য, জ্ঞানভক্তি, দয়াশ্রদ্ধা প্রভৃতির এমন একটা

প্রভাব আছে যাহা বিনা উপদেশে উপলব্ধি হইতে পারে, যাহা বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। যে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলে না, তাহার চিন্তা, ভাব, কণ্ঠ, রসনা সমস্তই যেন সত্যে গঠিত; সে স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা বলিবে, তাহা শুনিলেই সত্য বলিয়া তোমার উপলব্ধি হইবে; সে যদি কোন কারণে জোর করিয়া একটা মিথ্যা বলিতে যায়, তখনই তাহার কণ্ঠ এবং রসনা, তাহার মুখের চেহারা এবং চক্ষের ভঙ্গী সে মিথ্যা ধরিয়া দিবে। এই প্রকৃতির লোকের উপদেশই ফলপ্রদ হয়। যাহারা নাট্য-লীলা অভ্যাস করিয়া অবলীলাক্রমে সত্যকে মিথ্যার সাজে এবং মিথ্যাকে সত্যের সাজে সাজাইবার অভ্যাস করিয়াছে, তাহারা বাক্যে বা কার্য্যে ধরা পড়িতে না পারে, কিন্তু ফলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। বিদ্যালয়ের পুস্তক যাঁহারা লিখেন, তাঁহাদের পুস্তকগুলি অবশ্যই উপদেশপূর্ণ; কিন্তু সে উপদেশ যে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত ছাত্রদিগের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন তাহা নহে। কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ চাহেন সেইরূপ হইতেছে কিনা, যে শ্রেণীর জন্য লিখিতেছি ভাব এবং ভাষা সেই শ্রেণীর উপযুক্ত হইতেছে কি না, পাঠ্য নির্ব্বাচন সমিতির মনোমত হইল কি না, পুস্তক পাঠ্যরূপে পরিগৃহীত হইলে তাহাতে যে লাভ হইবে তদ্বারা গৃহিণীর অলঙ্কার করিব, কি ছেলেকে বিলাতে পাঠাব, তিনতলা বাড়ী করিব, কি জমিদারী কিনিব, এই চিন্তাতেই মন ব্যাকুল থাকে; ছাত্রের জ্ঞান লাভ হউক, সমাজের মঙ্গল হউক, জগতের উন্নতি হউক, এই বলিয়া প্রাণের একটা একাগ্রতা এবং লেখার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট সরল প্রার্থনা যে থাকে এমন বোধ হয় না। শুদ্ধ অন্তঃকরণের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনাই পূর্ণ হয়। যাহার মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে তাহার আশীর্ব্বাদ এবং অভিসম্পাত দুইই ব্যর্থ হয়। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে লোকে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া থাকে। পুরোহিত যদি পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধা ভক্তি এবং

ব্যাকুলতার সহিত ক্রিয়াটী করেন, তবেই তাহাতে ফললাভের সম্ভাবনা ; কিন্তু পূজকের মন যদি পূজার তৈজসপত্রাদি উপহারে নিবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রার্থিত ফললাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। মন শুদ্ধ হইলে যে কাজে ফল পাওয়া যায়, হিন্দু সমাজে এ কথাটা সকলে স্বীকার করে ; কিন্তু সমাজের এই দুর্গতির দিনে সেরূপ ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করে। "শুদ্ধ পথে থাকরে কাণা, আঁধার রাতে মিল্‌বে দানা" এ কথা নিতান্ত অশিক্ষিত হিন্দুও বলিয়া থাকে ; কিন্তু ইহার ভিতরে যে সত্য টুকু আছে তাহার উপরে নির্ভর করিয়া কত জন শুদ্ধ পথে থাকে ? সত্য এবং জ্ঞানের উপদেশ বাক্যে খোল আনাই রহিয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের ভাবে তাহা একেবারেই মারা গিয়াছে।

আত্মশুদ্ধির অভ্যাস বাল্যকাল হইতেই করিতে হয়। কিন্তু যাহারা নিজে অশুদ্ধ, তাহারা অন্যকে কিরূপে শুদ্ধ করিবে ? ইংরাজি ভাষায় একটী উপদেশ আছে, " আমি যাহা বলি তাহাই কর, কিন্তু আমি যাহা করি তাহা করিও না।" ইহার মত অসার উপদেশ আর নাই। শিক্ষক এবং অভিভাবক যাহা করেন বালকেরা তাহাই করে, কেবল উপদেশ-বাক্যে তাহাদের শিক্ষা হয় না। যদি প্রকৃত দৃষ্টান্ত তাহারা দেখিতে পায়, তাহা হইলে উপদেশবাক্য না শুনিলেও তাহাদের শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু দৃষ্টান্ত কৃত্রিম না হইয়া বিশুদ্ধ হওয়া চাই। আমার মনে যদি মিথ্যা শয়তান লুকাইয়া থাকে, কেবল বালককে সত্যানুরাগী করিবার জন্য সত্যের দৃষ্টান্ত দেখাই, তাহাতেও ফল হইবে না। বালক আমার কপট আচরণে ভুলিবে না, আমার হৃদয়ে যে মিথ্যা রহিয়াছে, বালকের চতুর দৃষ্টিতে তাহা, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, ধরা পড়িবে।

এ সমস্যার উপায় কি ? কাল প্রভাবে রাজাপ্রজা, পিতামাতা,

গুরুপ্রভু, সকলেই অন্যায় অসত্য অধর্ম্মের সেবক ; ন্যায়পরতা সত্যবাদিতা, ধর্ম্মভীরুতা কাহারও নাই, এ কথা বলিলে মূলে মিথ্যা হইল না, তবে আইন আদালতের জোরে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। অন্যায় অসত্য অধর্ম্মের ব্যবহার সকলেই করিতেছেন, কিন্তু বাক্যে কেহই ধরা দিবেন না, সকলেই আপনাকে ন্যায়পর, সত্যবাদী এবং ধর্ম্মভীরু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন। একজন প্রকৃত সাধুকে মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি ভয়ে ভীত হইবেন, এবং কোথায় কবে কাহার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিলেন, এই চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়াই বিমর্ষ ভাবে অবস্থান করিবেন। তাঁহার অনুসন্ধান আপনার হৃদয়ে এবং আপনার জীবনে নিবদ্ধ থাকিবে, এবং হয় প্রকৃত ঘটনার স্মরণ, না হয় বক্তার মিথ্যাবাদিতার প্রতিপাদন, নিজের চিত্তে এই দুইটীর একটি অবধারণ না করা পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই শান্তি পাইবেন না। কিন্তু যে সর্ব্বদা মিথ্যাকথা বলিতেছে, হয়ত মিথ্যাকেই জীবিকার উপায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিলে ফল কি হইবে? সে তখনই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া প্রতিবাদ করিবে ; খুব সম্ভব মানহানির মোকদ্দমা করিয়া বক্তাকে লাঞ্ছিত এবং দণ্ডিত করিবে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যিনি এই কালে যুগাধিপতি তাঁহার প্রভাবেই সমাজের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সহজ উপায় কিছুই নাই। নিজে বিশুদ্ধ হইব বলিয়া হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প, এবং সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য মহাশক্তির নিকট ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা, ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

কিন্তু বিপদ যতই বড় হউক, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা মানুষের একটা স্বভাব, সে মৃত্যু পর্য্যন্ত এ স্বভাব ছাড়িতে পারে না। আমি যতই দুষ্কৃতিপরায়ণ হই না কেন, সমাজের আর সকলে সুনীতি-পরায়ণ হউক, এই ইচ্ছা সকলেই করে, অন্য সকলেও আমার মত নীতি-

হীন হউক এইরূপ ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক নহে। সমাজের সকলেই যে দুর্নীতির সেবক তাহা নহে, কিন্তু সুনীতিসেবকদিগের সংখ্যা এবং প্রভাব এত অল্প যে তাহা নগণ্য বলিলেও হয়, এবং এই নগণ্যতা ভাবিয়াই তাহারা অবসন্ন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা এবং পুণ্য পবিত্রতার শক্তিতে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি অবসন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে সমাজের প্রচুর উপকার হইতে পারে। বর্ত্তমান ঘোর দুর্নীতির অন্ধকারেও যে দুই একটী উজ্জ্বল আলোক দেখা যায়, তাহাতেই মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে নিরাশ হইতে দেয় না। এ স্থলে বর্ত্তমান যুগের প্রধান পুরুষ মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধু দাশের দৃষ্টান্ত আমাদিগের পক্ষে পরম উপকারী। এই দুই মহাত্মাকে আমি কেবল রাজনীতির আদর্শ মনে করিতেছি না, মনুষ্যত্বেরও আদর্শ মনে করিতেছি। যে যুগে যে দেশে যে জাতির মধ্যে ইঁহাদের মত লোকের উদ্ভব হইতে পারে, সে যুগে সে দেশে সে জাতির পক্ষে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোন কথা নাই। এই দুই মহাত্মা আমার বিবেচনায় কেবল রাজনীতির পথে না চলিয়া মানব-নীতির পথেই চলিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা জগদ্বাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের জন্য যে নীতি প্রচার করিয়াছেন, সে নীতি অবলম্বন করিলে পৃথিবীর সমস্ত জাতিই শান্তি লাভ করিতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর কেবল একটী কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। তিনি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগ না করিয়া যদি অসত্য, অন্যায় এবং অধর্ম্মের সঙ্গে অসহযোগ প্রচার করিতেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইত এবং তাঁহার পবিত্র জীবনের উপযুক্ত কার্য্য হইত, তাহার সম্পাদনও অপেক্ষাকৃত সহজ হইত।

যাহা হউক, যখন মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখনও আমরা নিরাশ

হই নাই, তখন আত্মশুদ্ধির জন্য সকলেরই কিছু কিছু চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা গান্ধী বা দেশবন্ধু দাশের মত নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমিক কর্ম্মবীর যে আমরা সকলেই হইব তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু আমরা যে যতই ছোট হই না কেন, সেই ছোটর মত বীরত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ সকলের জীবনেই ঘটে, এবং সেই সুযোগ অবহেলা না করিলে নিজের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া সকলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। ন্যায়, সত্য, দয়া, ধর্ম্ম, বীরত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রায় প্রত্যহই কাহার জীবনে উপস্থিত না হয়? কিন্তু আমরা সেই সকল সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকি কি?

৺শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ,।

(৯)

শান্তি।

যে গৃহে শান্তি নাই, সে গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি অসুখী; যে গ্রামে শান্তি নাই, তাহার প্রত্যেক অধিবাসী অসুখী; যে সমাজে শান্তি নাই, তাহার প্রত্যেক সামাজিক অসুখী; যে রাজ্যে শান্তি নাই, তাহার রাজাপ্রজা উভয়েই ঘোর অসুখী। শান্তি নাই, অথচ সুখ আছে—শান্ত নহে, অথচ সুখী হইয়াছে, এমন ব্যক্তি দেখি না, এমন অবস্থার কল্পনাও করিতে পারি না। দস্যু, তস্করাদি যাহারা সামাজিক অশান্তির স্রষ্টা, তাহারাও অশান্তির দংশনে অস্থির হইয়া থাকে, তাহাদের কল্পিত সুখ কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়। চোরের কি কষ্ট, তাহার জীবনের অবস্থা কি শোচনীয়! ঝড়ে, জলে, শীতে, অন্ধকারে, আপনার গৃহ, পরিবার, সুখ-শয্যা ছাড়িয়া, ভয়ে প্রাণটি হাতে লইয়া পরের ঘরে প্রবেশ করা—ইহা কি সুখের

অবস্থা? যদি বা ভাগ্যবশে বহুমূল্য দ্রব্য হস্তগত হইল, তাতেই বা কি? না আছে তাহা রাখিবার স্থান, না আছে তাহা লুকাইবার স্থান, না আছে তাহা বেচিবার স্থান! চোর চুরি করে একদিন. কিন্তু চুরির জিনিষ লুকাইবার অশান্তি তাহাকে ভোগ করিতে হয় বহুদিন; অবশেষে মাটির দরে সোণা বেচিয়া তবে সে কতকটা রক্ষা পায়। এই জন্যই আজন্ম চুরি করিয়াও কোন চোর ধনী হইতে পারে না। কিন্তু রাণীর অঙ্গের চন্দ্রহার পাঁচবুড়িতে বেচিয়াও চোরের অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি নাই, সে সকলের মুখেই পুলিসের চেহারা দেখে, কাহাকেও কাণাকাণি করিতে দেখিলে চোরের বুক দুড়্ দুড়্ করিয়া উঠে!

চোরের একটা দৃষ্টান্তমাত্র। যে অন্যের অশান্তি ঘটাইয়া নিজে সুখী হইতে চায়, সে সুখের পরিবর্ত্তে দারুণ অশান্তিকেই ডাকিয়া আনে। পরকে দৌড়াইতে গেলে নিজে দৌড়িয়া হয়রান হইতে হয়, প্রকৃতির ইহাই বিধান। সমাজে এত মামলা মোকদ্দমা বিবাদ বিসম্বাদ কি জন্য হয়? যে স্থলে দুই পক্ষেই ন্যায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়, সে স্থলে বিবাদ অসম্ভব, কেননা ন্যায় সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই এক। যেমন শত্রু মিত্র সকলের কাছেই শাদা চিরদিনই শাদা এবং কাল চিরদিনই কাল, সেইরূপ স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলের কাছে ন্যায় চিরদিনই ন্যায়। তবে বুদ্ধিতে যদি স্বার্থ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি বিকার জন্মে, তাহা হইলে অবশ্য ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া দেখায়। কিন্তু সে বিকারের অবস্থা।

যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত, তিনিও অন্যের অশান্তি ঘটাইয়া, অন্যের উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়া নিজে শান্তিভোগ করিতে পান না। পরাক্রান্ত জাপান নির্দ্দোষ কোরিয়াকে কুক্ষিগত করিয়া, তাহাকে হজম করা যে কি ব্যাপার, তাহা সবে মাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রুষিয়া এবং জার্ম্মানি পোলাণ্ডকে ভাগাভাগিতে গ্রাস করিয়া বুকের উপরে

কেবল বৃশ্চিকের বাসা বাঁধিয়াছেন মাত্র। আয়র্লাণ্ডকে বাঁধিয়া রাখিয়া ইংলণ্ড কত সুখে আছেন, বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

মানব শান্তির পক্ষপাতী। বুদ্ধির বিকারবশতঃ অশান্তি ঘটিলেও মানব-হৃদয়ের আবেগ শান্তির দিকে। ব্যবহার-দোষে রোগ জন্মাইয়াও মানব যেমন আরোগ্যেরই কামনা করে, সেইরূপ বুদ্ধির দোষে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াও মানব সর্ব্বদা শান্তির জন্যই ব্যাকুল থাকে। চোর চুরি করে, দস্যু দস্যুতা করে, নিরুদ্বেগে থাকিয়া সুখে জীবন কাটাইবার আশায়,—বুদ্ধির দোষে তাহারা বুঝে না যে স্বর্ণলতা ভ্রমে তাহারা সাপের মাথায় হাত দিতেছে, শীতল হইবার আশায় তাহারা জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেছে। না বুঝুক, শান্তিলাভ অদৃষ্টে না ঘটুক, কিন্তু শান্তি যে সকলেরই চরম লক্ষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শান্তি পদার্থটা কি? যে রাজ্যে, যে সমাজে, যে পল্লীতে, অথবা যে পরিবারে সকলে সদ্ভাবে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে, নিরুদ্বেগে, নির্ব্বিবাদে এবং নিরাপদে আপন আপন স্থিতি, উন্নতি, সুখ এবং সন্তোষের কার্য্য অবাধে করিতে পারে, আমরা বলিয়া থাকি সেই রাজ্য, সেই সমাজ, সেই পল্লী এবং সেই পরিবারে শান্তি বিরাজমান।

জগৎ শান্তি চায়, সমাজ শান্তি চায়, প্রত্যেক মানবের প্রাণ শান্তি চায়। এক একবার এক একটী ভীষণ অনির্দ্দিষ্টগতি ধূমকেতু কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ভয়ে শুষ্কমুখ হইতে থাকেন, গ্রহাদির জ্ঞান বুদ্ধি থাকিলে ভয়ে তাহাদেরও মুখ শুকাইবার কথা। মানব-প্রাণের যে অশান্তি, তাহা আমরা প্রত্যেকেই অহরহঃ অনুভব করিয়া থাকি। দয়া, ধর্ম্ম, রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, প্রীতি, ন্যায়, অন্যায়, সত্য, অসত্য প্রভৃতি বিবিধ ভাব এবং বিবিধ বৃত্তির মধ্যে যখনই বিরোধ

উপস্থিত হয়, তখনই আমরা জীবনে ঘোর অশান্তি অনুভব করি। যে পর্য্যন্ত না বিবিধ বৃত্তি, ভাব এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, সে পর্য্যন্ত মানবের পক্ষে প্রকৃত শান্তি উপভোগ করা অসম্ভব। এই সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলা বিধানের উপায় শিক্ষা এবং সংযম। শিক্ষা সামঞ্জস্যের উপায় বুদ্ধির নিকটে উপস্থিত করে, এবং সংযম অভ্যাসের সাহায্যে তাহাকে বাস্তবে পরিণত করে। বাস্তবিক শিক্ষা এবং সংযমই শান্তির প্রধান উপকরণ, এবং এই জন্যই শিক্ষিত এবং সংযত ব্যক্তিদিগকে আমরা শান্ত বলিয়া পরিগ্রহ করি।

জগতের শান্তি বা অশান্তিতে আমাদের কোন হাত নাই, সুতরাং বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহার আলোচনার মূল্য থাকিলেও আমাদের নিকট তাহা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেকের জীবনের শান্তি প্রত্যেকের আয়ত্ত—প্রত্যেকের সাধনসাপেক্ষ সুতরাং তাহাতেও উপদেশ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন সাহায্য অপরের দ্বারা চলে না। কিন্তু সমাজের শান্তিতে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ, সংস্রব এবং কর্ত্তব্য রহিয়াছে, সুতরাং প্রত্যেকেরই এবিষয়ে ভাবিবার বলিবার এবং করিবার অধিকার এবং দায়িত্ব রহিয়াছে। রাজাপ্রজা, ধনীদরিদ্র, স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ, বাঙ্গালীইংরাজ—কে শান্তির প্রয়াসী নহে; ইচ্ছা করিয়া অশান্তির জ্বালায় দগ্ধ হইতে কে বাসনা করে? শান্তির সঙ্গে সকলেরই যখন স্বার্থ এবং সুখ দুঃখ জড়িত রহিয়াছে, তখন মানবহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই দেশের এবং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এবং যাহাতে শান্তির উপকরণসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অশান্তির উপকরণগুলি বিদূরিত হয়, সকলেই সে যত্ন করিবেন এমন আশা করা যায়।

বাস্তবিক শান্তির জন্যই সমাজ। সভ্যতার ইতিহাসকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে যখন অসভ্য মানবেরা

শিক্ষা এবং সংযমের অভাবে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘোর অশান্তি ভোগ করিতেছিল তখনই তাহারা সর্ব্বপ্রথমে শান্তির প্রয়োজন উপলব্ধি করে, এবং তাহাদেরই পুরুষকারের সুফল স্বরূপ এই মঙ্গলময় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই অতি দুর্দ্দমনীয়; শিক্ষা এবং সংযম তাহাদিগকে দমন করিতে পারিয়াছে, তবেই শান্তির আধারস্বরূপ সমাজপ্রতিষ্ঠার সম্ভব হইয়াছে। সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই দেখা যায়, শান্তির এই সকল উপকরণ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রাজা, রাজবিধি, ধর্ম্মাধিকরণ, পুলিশপ্রহরা, বিদ্যালয়, হাট, বাজার প্রভৃতি বাণিজ্যব্যাপার, এ সমস্তই কেবল শান্তির জন্য—শাস্তির জন্য নহে। দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক, প্রতারক প্রভৃতি যাহারা শান্তির বিরোধী, তাহারাও প্রচ্ছন্নভাবে আপনাদের কুকর্ম্ম করে, কেননা প্রকাশ্যভাবে তাহা করিতে গেলেই সমগ্র সমাজ তাহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। শান্তিরক্ষা এবং শান্তি বিস্তারের জন্য যিনি যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি তাহা যথোচিতরূপে সম্পাদন না করেন, তবে তিনিও আপনার আসন স্থির রাখিতে পারেন না; সুশিক্ষার জন্য নিযুক্ত শিক্ষক যদি কুশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, সমাজরক্ষায় নিযুক্ত রক্ষক যদি ভক্ষকের কার্য্য আরম্ভ করেন, তবে তিনি দীর্ঘকাল আপনার আসনে স্থির থাকিতে পারেন না, শীঘ্রই অপসারিত হন, কেননা সমাজ সকলের চেয়ে বড়, এবং শান্তিতে বিঘ্ন সমাজের নিকট অসহ্য।

---

(১০)

কতকগুলি কবিতা।

সুলেখক।

স্পষ্ট, দ্রুত, শুদ্ধভাবে যে লিখিতে পারে,
বলেন পণ্ডিতগণ সুলেখক তারে।
সমানে অক্ষর গুলি হইলে সুন্দর,
সোণায় সোহাগা যেন মনোমুগ্ধকর।

কুলেখক।

পদে পদে বর্ণাশুদ্ধি, অস্পষ্ট অক্ষর,
ছোট বড় বর্ণ, পাঁতি অসম-অন্তর,
লিখিতে লিখিতে মুছি বিতিকিচ্ছি করে,
হাতটি অত্যন্ত ধীর—কলম না সরে;
লিখনেতে এত দোষ যাহার প্রকাশ,
কুলেখক বলি লোকে করে উপহাস।

সুপাঠক।

নড়ে না পা, হাত, সোজা দেহ নাহি দোলে,
যেখানে যে ভাব, স্বর তার মত চলে,
না থাকিবে অহঙ্কার, ভয় না থাকিবে,
চিহ্নে চিহ্নে যথা-যুক্ত বিরাম লইবে;
কৃত্রিমতা কর্কশতা করি পরিহার,
সহজে বলিবে, যেন কথা আপনার।

কুপাঠক।

না জানে দাঁড়াতে সোজা, হাত-পা চঞ্চল,
শব্দ উচ্চারিতে ভুল করে অবিরল,
শব্দের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না জানে,
দুই চারি ভিন্ন শব্দ বলে এক টানে,
চিহ্নের রাখেনা খোঁজ, নাহি অর্থ-বোধ,
না হইতে বাক্য শেষ করে স্বর-রোধ,
কিম্বা এক বাক্য পরে অন্য বাক্য ধরে,
কোথায় থামিতে হবে বুঝিতে না পারে;
অস্পষ্ট জড়িত স্বর বুঝা নাহি যায়,
কুপাঠ শুনিলে কার হাসি নাহি পায়?

সুরচক।

সংক্ষিপ্ত, সসার, আর সরল, সরস,
এই চারি গুণযুক্ত রচনার যশ।

কুরচক।

ভাব নাই, অর্থ নাই, লম্বা লম্বা কথা,
ছাঁদ নাই, বাঁধ নাই, নাই পাছা মাথা,
এক কথা না হইতে আর কথা পাড়ি,
গ্রন্থ গ্রন্থকার-নাম লেখে ঝুড়ি ঝুড়ি,
রস-শূন্য, মন্দ-রুচি, ব্যাকরণ-হীন,
জঘন্য রচনা লোকে নিন্দে চিরদিন।

সুকথক।

বলিবার বিষয়টী আগে স্থির করে,
কিরূপে বলিতে হবে ভাবে তার পরে ;
একে একে চিন্তাগুলি মনেতে সাজায়,
বলিবার কালে যেন ভুলিয়া না যায় ;

ভাবিয়া ভাবিয়া কথা ধীরে ধীরে বলে,
অথচ বাক্যের স্রোতঃ অনর্গল চলে ;
কথায় ভাবেতে ভাল ঐক্য যদি রয়,
সতেজ সরস বাক্য অবশ্যই হয়।

বিশ্বাস, দৃঢ়তা, আর থাকিলে বিনয়,
নিশ্চয় সে আকর্ষিবে শ্রোতার হৃদয়।
হইবে মনোজ্ঞভাবে অঙ্গের সঞ্চার,
না করিবে আস্ফালন, বিকট চীৎকার।

কুকথক।

মনে ভাব নাই তবু বলিবারে চায় ;
বাঙ্গালা কথার মাঝে ইংরাজী মিশায় ;
তার সঙ্গে মুদ্রা-দোষ থাকে ষোল আনা,—
'বুঝেছেন,' 'শুনেছেন,' 'বুঝিলেন কি না ;'

যে সব কথার মাঝে নাহি কিছু সার,
ফিরিয়া সে সব কথা বলে বার বার ;
'চুপকর' না বলিলে কথা নাহি ছাড়ে,
লজ্জা অপমান-বোধ কিছু নাই ধড়ে ;

বাগ্মিতায় হাস্যকর এরূপ প্রয়াস
যে করে, সকলে তারে করে উপহাস।

প্রদীপ।

রজনী হইলে ঘোর সকলি আঁধার,
ছোট বড় ভাল মন্দ সব একাকার।
আছে বস্তু সব, তবু কিছু যেন নাই ;
আছে চক্ষুঃ, দেখিবারে কিছুই না পাই।

আছে বস্তু বুঝি, যদি সাক্ষ্য দেয় কর,
হাতে যারে না পাই, সে যোজন অন্তর।
কাঁছে যদি প্রিয়জন কথা নাহি কয়,
দূরে বুঝি গেল ব'লে জনমে সংশয়।

বিবিধ সুন্দর বর্ণে বিচিত্র সংসার,
আঁধারে মিশিলে যেন কিছু নাহি আর।
ঘরে দ্বারে বিছানায় কত যেন সাপ,
ইঁদুর নড়িলে ভয়ে বলি বাপ বাপ!

একটি প্রদীপ যদি এমন আঁধারে
রহিয়া ঘরের কোণে মিট্ মিট্ করে,
ঘর হ'তে দূর হয় সকল আঁধার,
প্রিয়জন প্রিয়বস্তু নিরখি আবার।

রবি, শশী, তারা কত আছে ত সংসারে,
কি করে তাহারা মম নিশার আঁধারে?
বিপদে যে করে হিত, অভাব ঘুচায়,
সেই ত প্রকৃত বন্ধু ভালবাসি তায়।

নিন্দুক।

বড় উপকারী তুমি নিন্দুক রে ভাই!
তব সম হিতকারী আর কেহ নাই।
আপনার খাও তুমি, আপনার পর,
কোন লাভ নাই, তবু উপকার কর।

না লইয়া কপর্দ্দক করিছ চাকুরী,
কেমন নিঃস্বার্থ তুমি আহা মরি মরি!
আবর্জ্জনা দূরকারী, মেথরের মত,
মার্জ্জনী তোমার হাতে যদি না থাকিত;

অথবা প্রহরীর মত, হ'য়ে আত্মহারা,
চরিত্র-বাগানে তুমি না দিতে প্রহরা:
কিম্বা রক্ত পুঁজে তুষ্ট মক্ষিকার মত,
পর-দোষ দেখি তুষ্ট না হইতে এত;—

জমিত চরিত্রে মম কত আবর্জ্জনা,
কত কীট, কত ক্ষত, না হয় ধারণা!
বিনা প্রার্থনায় সাধ এত উপকার,
কিন্তু হায়! কি লভিছ বিনিময়ে তার?

সাধু-সহবাস ভাগ্যে ঘটে না তোমার;
অসাধুর গালি খাও, কখন প্রহার;
অপমান অভিশাপ সভায় সদরে,
কোন্দল অশান্তি পা঺ পাড়ার ভিতরে;

পিতা তব জল-পিণ্ড পায় বা না পায়,
অখাদ্য অস্পৃশ্য লোকে নিত্য দেয় তায়!
এত সহ তবু নাহি ছাড় উপকার,
তাই বলি, তব সম বন্ধু নাহি আর।

———

আত্মবল ও আত্মনির্ভর।

মাতা পিতা চিরদিন কার সঙ্গে থাকে?
শিক্ষক শাসনে কারে চিরদিন রাখে?
বাড়ী-ঘর, দাস-দাসী, বন্ধু, পরিজন,
এ সকল সঙ্গে সদা থাকে কি কখন?

মাতার সোহাগ আজি, কালি মাতৃহীন;
পিতার পালনে আজি, কালি পরাধীন;
দাস, দাসী, পরিজন আজি মন তোষে,
পথের প্রবাসী কালি, কেহ না জিজ্ঞাসে;

আপনার ঘরে আজি সুখের শয্যায়,
দরমা, মাদুর, চট, কালি ঘটা দায়!
আজি আছে কালি নাই যে সব সম্পদ,
নির্ভর করিলে তাতে নিশ্চয় বিপদ।

বিদ্যা, বুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা, সারল্য, সাধুতা,
মিষ্ট কথা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা,
সাহস, পৌরুষ, তেজঃ, নির্ভয় হৃদয়,
সদাচার, অনুরাগ, অপমানে ভয়,—

এ সকল আত্মবল আয়ত্ত যাহার,
এ জগতে কি বিপদ, কি ভয় তাহার?
অনায়াসে আপনাতে করিয়া নির্ভর,
অকূল বিপদে কূল পায় সেই নর।

স্মৃতি।

স্মৃতি বিনা মানবের কি আছে সম্পদ?
স্মৃতি-শূন্য ইতিহাস কল্পনাই সার,
স্মৃতি, ব্রত, ভাষা, কীর্ত্তি, সাহিত্য, বিজ্ঞান—
মানব-স্মৃতির এরা অক্ষয় ভাণ্ডার।

জাগ্রত স্মৃতির ভিত্তি দৃঢ়বদ্ধ যার,
দাঁড়ায়ে সে দৃঢ় পদে তাহারি উপরে,
বিচিত্র সৌভাগ্য-হর্ম্ম্য করিয়া নির্ম্মাণ,
জাতীয় মহত্ত্ব-গর্ব্ব মূর্ত্তিমান করে।

কিন্তু ভিত্তি শ্লথ যার, কম্পিত চরণে
দাঁড়াইয়া তদুপরি বাঁধে যে কুটীর,
মৃদুল পবনে তার ভাঙ্গি পড়ে চাল,
তপনের তাপে ভিত্তি হয় শতচির !

সভ্যতা-ভিখারী জাতি দেখ কি কৌশলে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি-খণ্ড যতনে সঞ্চিয়া,
সুদৃঢ় মর্ম্মরে যথা, গাঁথিছে প্রাসাদ,
বিস্ময়ে অবাক্ বিশ্ব দেখিছে চাহিয়া।

স্মৃতির অভাব কভু ছিল না ভারতে ;—
পর্ব্বতে-প্রান্তরে তার, মরু-নদী-নদে,
অনন্ত অতীত-স্মৃতি, রত্ন-স্তূপ যথা,
অযত্নে বিক্ষিপ্ত প্রতি গ্রামে, জনপদে।

কে করে আদর তার ? ভারত সন্তান,-
স্বর্ণমল স্বর্গধামে দেবশিশু যথা
ধুলিসম স্বর্ণরেণু অযত্নে উড়ায়—
স্বপ্নেও তুলে না মনে পূর্ব্ব-স্মৃতি কথা !

একত্রে স্মৃতির স্তূপ, গঠিতে প্রাসাদ,
জন্মিবে কি বিশ্বকর্ম্মা হেন কেহ আর ?
পতিত ভারত-সুতে স্মৃতির গৌরবে,-
মণ্ডিতে কি ইচ্ছা পুনঃ হবে বিধাতার ?

শুনি ত দর্শনে, শাস্ত্রে, লোকের প্রবাদে-
সাধনের সাধ্যাতীত এ জগতে নাই ;

ভাগ্যে যদি জাগিয়াছ আশীর্ব্বাদে মার,
সাধনে বারেক প্রাণ স'প দেখি ভাই!

যেখানে সে স্মৃতি-রত্ন আছে লুকাইয়া,
অন্বেষিয়া ধর তাহা লোকের নয়নে;
যেখানে যে স্মৃতি টুকু গিয়াছে মরিয়া,
জীয়াইয়া তুল তারে নবীন জীবনে।

কেবল গর্ব্বের নহে,—দুঃখের যে কথা,
দুর্গতির স্মৃতি-শেল ভুলিবার নয়;
যে যিশু দিলেন প্রাণ ঘাতকের হাতে,
ঘাতকেরি বাস্তু-ভূমে আজি তাঁর জয়!

সান্ত্বনা।

(খোরসেদপুরের মা-সম্বন্ধীয়)

১

কেন মা সংসারবাসে বিরাগ তোমার?
কি হেতু জাহ্নবীতীরে ইচ্ছা থাকিবার?
সংসার নন্দন বন
সুখে পূর্ণ অনুক্ষণ,
কেন মা ছাড়িয়া যাবে এ সুখ-উদ্যান?
সংসারে তোমার তরে মিলে না কি স্থান?

২

ভূমণ্ডল—ঈশ্বরের বিস্তৃত-ভুবন,
আনন্দে করিছে বাস জীব জন্তুগণ।
বস্ত্রাভাবে, অনাহারে,
গৃহ বিনে কেবা মরে ?
ঈশ্বর করেন দুঃখ-মোচন সবার,
শুনেছি পাষাণে কীট লভিছে আহার !

৩

মানুষ হইয়া কেন যাতনার ভয় ?
ঈশ্বরের জীব, তিনি পালেন নিশ্চয়।
বৃক্ষ যদি রস পায়,
পক্ষী যদি শস্য খায়,
মানুষ হইয়া তবে আমরা সকলে
দহিব কি চিরদিন অভাব অনলে ?

৪

দুঃখেতে অনেক দিন গিয়াছে তোমার,
এখনো চৌদিক-ব্যাপী দুঃখ পারাবার !
দুঃখানলে অশ্রুধার
ঢালিতেছ অনিবার,
একত্রিয়া রাখিতে পারিলে সেই বারি,
ডুবাতে পারিত বঙ্গ তরঙ্গ বিস্তারি !

৫

কিন্তু মা দুখের পরে সুখের উদয়,—
নিশাশেষে সূর্য্যোদয় চিরদিন হয়!
এ যে দুঃখে অহরহঃ
দহিছে তোমার দেহ,
হবে না কি এ দুঃখের অনল নির্ব্বাণ?
চির দুঃখ-ভোগ কি মা বিধির বিধান?

৬

কি জানি, আসিতে পারে হেন এক দিন,
যে দিন জীবনাকাশ হবে মেঘহীন!
মেঘে নভঃ ঢাকি রাখে,
ভীম্ বজ্র ঘন ডাকে,
উড়েনা কি মেঘরাশি প্রবল পবনে?
চিরদিন মেঘমন্দ্র পীড়ে কি শ্রবণে?

৭

সত্য বটে পুত্রকন্যা ধরিয়া উদরে,
ঘটিল না সুখ তব দিনেকের তরে!
নয়নের অশ্রুজল
পড়িতেছে অবিরল,
ভাবনায় স্বর্ণকান্তি মলিন হয়েছে,
দিবানিশি দুঃখানল হৃদয়ে জ্বলিছে!

৮

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে লঙ্ঘেছে কবে?
নিয়তির ভীমগতি কে রুদ্ধ করিবে?
রাম পুত্রে পুত্রবতী
হয়েও কৌশল্যা সতী
পুত্রশোকে আজীবন হাহাকার করে,
রামধনে দিয়া বনে পোড়া প্রাণ ধরে!

৯

রাজরাণী হ'য়ে যদি এত দুঃখ তার,
দরিদ্রা দুঃখিনী তুমি, কি সাধ্য তোমার?
ঈশ দয়া-রত্নাকর,
তাঁহাতে নির্ভর কর,
ছেড়ে দাও দেহ-তরী নিয়তির স্রোতে,
ঈশ্বর দিবেন স্থান সৌভাগ্য-কূলেতে।

১০

বলেছ আমায়,—আমি ভুলেছি তোমায়!
হৃদয় থাকিতে কিন্তু ভু'লে থাকা দায়।
ভুলিয়াছি জননীরে,
সহোদরা সহোদরে,
ভুলিয়াছি জন্মভূমি ভূ-স্বর্গ যে স্থান,
ভুলিলে ভুলিতে পারি আপনার প্রাণ!—

১১

কিন্তু মা! তোমারে আমি ভুলিব কেমনে?
ভুলিব তোমার দয়া কেমন পরাণে?
নিরাশ্রয়, অসহায়,
রোগে প্রাণ যায় যায়,—
এমন বিপদে যার রেখেছ জীবন,
সে দুর্ভাগা ভুলিতে কি পারিবে কখন?

১২

কতদিন—মনে হ'লে উথলে হৃদয়,
বিশুষ্ক নয়নে হয় অশ্রুর উদয়!—
কতদিন স্ব-উদরে
বঞ্চিয়া, আমার তরে
রাখিয়াছ আহারীয় করিতে আহার।
তাই কি গো স্নেহময়ি! কথা ভুলিবার?

১৩

পারিতাম ভুলিবারে, যদি গো জননি!
মাতা কিম্বা মাসী, কিম্বা হইতে ভগিনী।
সস্নেহে, কর্ত্তব্য-ডরে
আত্মীয়ে পালন করে;—
পর হয়ে পরপুত্রে যে করে পালন,
তারে কিগো ভুলা যায় থাকিতে জীবন?

১৪

নিঃস্বার্থ সে স্নেহ তব ভুলিবার নয়,
ভুলিব না যতদিন রহিবে হৃদয়!
অক্ষয় জলদক্ষরে
লিখিত আছে অন্তরে,
মুছিবে না যতদিন এদেহ আমার
হইবে না আগুনে পুড়িয়া ভস্মাকার!

১৫

বলিয়াছি বহুদিন, এখনো বলিছি,
চিরদিন এ প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে রেখেছি;—
ধরিয়া করঙ্গ করে
ভিক্ষা করি ঘরে ঘরে
পালিব তোমায়, তবু থাকিতে জীবন,
অকৃতজ্ঞ ব'লে দোষী হব না কখন।

১৬

দীনমাতা মহারাণী শরৎ সুন্দরী,
করিছেন বিদ্যাদান অর্থব্যয় করি;
পালিতে উদর তব
তবু কি অক্ষম হবু?—
অসংখ্য অনাথ বাঁচে কৃপাবলে যাঁর,
আমি তাঁর পদাশ্রিত কি ভয় আমার?

১৭

কিন্তু হায়! নরকুলে আমি কুলাঙ্গার,
কলঙ্কিতে নর-নাম জনম আমার।
জননীরে ভগিনীরে,
জ্বালায়েছি স্তরে স্তরে ;—
তুমি আছ, তোমারে করিতে পালন
রয়েছি বিরত আমি! ধিক এ জীবন!

১৮

হৃদয়! বিদীর্ণ হও, কি ফল থাকিয়া?
জীবন! নির্গত হও, কাজ কি বাঁচিয়া।
অনন্ত দুঃখের দিনে
বাঁচিলাম যার গুণে,
ঘুচাতে না পারিলাম তাহার রোদন, —
ধিক্ এ দেহের বলে, ধিক্ এ জীবন!

আমার স্বাধীনতা।

কে বলে আমার স্বাধীনতা নাই?
আমি হাত পা'ত নাড়ি চাড়ি,
তাতে কেউত দেয়নি বেড়ী,
নিজের গলায় ছুরি দড়ি যদি দিতে চাই,
আমায় তাতে বাধা দেয়, এমন ত কেউ নাই।
আমি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে অবাধে বেড়াই,

পথে লাল পাগ্‌ড়ী দেখলে বটে আতঙ্কে পালাই,
কিন্তু পালাইলেও পর ঘরে নয়, নিজের ঘরে যাই।

কুকুর, বিড়াল, গরু, বাছুর, আমার যত আছে,
মার খেয়ে আর ধমক খেয়ে—জব্দ আমার কাছে;
আমায় তারা সবাই মানে,
আমার কথা সবাই শুনে,
তেড়ে আসে যদি আমায় দুষ্ট বোঁচা গাই,
আমি তার কাণ ধরে ঠেকাই;
কেবল অজ্ঞ লোকে বলে আমার স্বাধীনতা নাই।

চূড়াধড়ার পেথম ধরে আফিসেতে যাই,
ঘরে ঢুকে জড়সড়, ভয়ে লেজ গুটাই,
কথায় কথায় কত ধমক, লাথি খাই,
কত গুঁতা, কত জুতা, লেখাজোখা নাই;
পেটে সে সব আস্ত থাকে, যখন যাই বাড়ী।
ছেলে মেয়ের গালে পিঠে সকল ঝাল ঝাড়ি।
পরিবারকে আচ্ছা ক'রে দুকথা শুনাই,—
ভাল ক'রে আফিসের অভিনয় দেখাই;—
কোন্ আহাম্মক বলে আমার স্বাধীনতা নাই?

আমি মদ গাঁজা খাই, যথা তথা যাই,
অপমানের ভয় রাখি না, দুবেলা বেড়াই;
আমায় যারা হেরে,
বরং তারাই লাজে মরে,

আমার লাজলজ্জা সঙ্কোচের কোন বালাই নাই।
কে পারে কি করতে আমার, কাউকে না ডরাই।
সব চেয়ে প্রভুত্ব আমার বঙ্গ ভাষার কাছে।
কলম হাতে ধর্‌লে ধরা দেখি সরা খান,
কালা পাহাড় আমার মত নয়কো কীর্ত্তিমান্।
নাকি কাণ কাটিয়া তার করেছি প্রমাণ,
জীবন্ত শরীরে তায় করেছি মৃত্যুদান।
নাকে থাড়ু, কানে বাজু, পায়ে কণ্ঠহারে,
নূতন সাজে সাজায়েছি বাঙ্গালা ভাষারে।
নব্য বঙ্গে আমি একটা মস্ত অবতার,
ভাষার জন্মদাতা ব'লে সুখ্যাতি আমার।
সাহিত্য মঞ্চেতে সত্য আমার এ বড়াই—
আমার জন্য লক্ষ যুবক করিবে লড়াই।
আমার নিন্দা ক'রে কেউ কি সরে যেতে পারে?
আমার পোষা গুণ্ডার দল শিক্ষা দিবে তারে।

ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার-ভাষার বালাই যত,
করেছি সব ছারখার, লঙ্কা-পোড়ার মত।
আমার কলম পাগ্‌লা ঘোড়া, যেদিক সেদিক ছুটে,
আমি রাজা বঙ্গভাষার—কে দাঁড়ায় তার চোটে?
বিধির কলম এক খোঁচা লঙ্ঘনীয় নয়,
আমার তেমনি বজ্রলেপ, একবারে যা' হয়।
লিখ্‌তে হবে 'গ্রন্থশ্রেণী,' ভস্ম কিবা ছাই,
ভাবতে গেলে হয় না লেখা, সময় যে নাই।

রেশমী কাপড় সোণার লেখা, বাঁধা চমৎকার,
দশ টাকার বই টাকায় বেচি, ফাউ উপহার।
পড়্‌লে পড়ুক, বুঝ্‌লে বুঝুক, না পড়ে না বুঝে—নাই,
কিন্‌লে বই গাবেই গুণ, সেইটিই আমি চাই।
ধন্য ধন্য আমার জন্ম, ধন্যরে বিধাতা,
হয়েছিলাম বাঙ্গালী, তাই এত স্বাধীনতা।

---

(১১)

শরচ্চন্দ্রের লিখিত গ্রন্থগুলির সমালোচনা করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীহট্টের মাসিকপত্র "শিক্ষাসেবকের" বাঙ্গালা ১৩৩৪ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় "শরচ্চন্দ্রের সাহিত্য সেবা" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের অধিকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

১। **মহাপূজা**—১২৮৮ (ইংরাজী ১৮৮১) সনে শ্রীহট্টে একটি মেলা হয়—এই কবিতাটি ঐ মেলার উপলক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল। শরৎ বাবু এই জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং পুরস্কারের অর্থেই উহা ঐ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মেলার অনুষ্ঠানটি—শ্রীহট্টের পক্ষে এক অভিনব বিষয় ছিল—শরৎচন্দ্র ইহাকেই "মহোৎসব আজি শ্রীহট্ট যুড়ি" সঙ্গীত করিয়া, আহ্বান করিয়াছেন—

"চলরে সকলে কে আছ কোথায়,
জনম ভূমির করিতে পূজা।"

পুস্তকখানি ইদানিং দুর্লভ ছিল—শ্রীহট্ট নর্ত্তনগ্রামস্থিত কুলজা সাহিত্য মন্দির হইতে ১৩৩২ সালে পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতার 'Motto' স্বরূপ দুইটি মহাবাক্য রহিয়াছে। এক—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"; অপর—Sir Walter Scott এর :—

"Breathes there a man, with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own—my native land?

ইহাতেই এই ক্ষুদ্র কাব্যের 'স্পিরিট' বুঝা যাইবে।

নূতন সংস্করণে কবির চিত্র আছে।

* * * এই 'মহাপূজা' শরৎ বাবুর ছাত্রাবস্থার রচনা; ঐ সময়কার রচিত ও প্রচারিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কবিতা-পুস্তকের সংবাদ আমরা পাইতেছি—যথা 'আর্য্য সঙ্গীত,' 'চিতোরের বীর গান", এবং সুপ্রসিদ্ধ ৺ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কারাগারে গমন করিলে, দেশময় যখন হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তখন 'সুরেন্দ্র-কারাবাস' লিখিয়াছিলেন। * *

২। শিক্ষাপরিচয়—এই পত্রিকাখানি শরচ্চন্দ্রের যশঃসোপান ছিল। ইদানীং 'দেবী-যুদ্ধ' প্রণেতা বলিয়া তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে 'শিক্ষা-পরিচয়' সম্পাদক বলিয়া তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন।

১২৯৬ (ইং ১৮৮৯) সনে বৈশাখ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া তিন বৎসর কাল প্রকাশের পর কিছুদিন ইহা বন্ধ থাকে; তারপর ১৩০১ (ইং ১৮৯৪) সনে পুনরায় প্রচারিত হইয়া দুই বৎসর কাল চলিয়াছিল। * * *. তখন তিনি রাজসাহী পুঁটিয়ায় থাকিয়া তত্রত্য হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টারী করিতেন। পত্রিকার কভারের উপর লিখিত ছিল—'আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎ সুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত'।

কভারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় অনেকগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃত উপদেশ-বাক্য উদ্ধৃত ছিল—নিম্নে ঐ গুলি প্রদত্ত হইল,—ঐ সকল হইতে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও বিষয়ের ভাব অনেকটা বুঝা যাইবে :—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

(বিষ্ণুশর্ম্মা)

"Train up a child in the way he should go; and when he is old he will not depart from it." Eng : Bible.

"The master is the best book, the most natural and efficient channel of communication." D. Stow.

"Be exact in your thoughts." Lord Reay.

"The child is father of the man." Wordsworth.

"The subject which involves all other subjects, and therefore the subject in which education should culminate, is the Theory and Practice of Education." H. Spencer.

"True education is practicable only by a true philosopher." H. Spencer.

"All branches of the laws of health are physical sins." H. Spencer.

"What is needed for the rooting out of vices is not legislation so much as education, aided of course by example." Hope.

"It is the greatest curse of ignorance, it knows not how ignorant it is." Christian Life.

অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

"A sound mind in a sound body." Locke

প্রথম বর্ষে শরচ্চন্দ্র একাকী সম্পাদক ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে কেহ কেহ সহায়ক থাকিলেও, পত্রিকার ভার তাঁহাকেই বহন করিতে হইত—লেখা প্রায় সমস্ত তাঁহারই ছিল।

এখানিকে সদুপদেশপূর্ণ করিবার জন্য শরৎ বাবু যথেষ্ট যত্নচেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে গদ্যে ছোট ছোট বাক্যে 'উপদেশ কথা' এবং পদ্যে 'সুবাক্য ভাণ্ডার', থাকিত, সে গুলি বড়ই উপাদেয় ছিল।

আর একটি বিশেষত্ব ছিল—সাধারণকে, তথা ছাত্র ও মহিলাদিগকে রচনার্থে প্রোৎসাহিত করা। সেই নিমিত্ত পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল।

দ্বিতীয় বর্ষে 'শিক্ষাপরিচয়' পত্রিকার 'শিক্ষাপরিচয়-সমিতি' গঠনের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়; উহা 'শিক্ষা পরিচর্য্যা এবং জাতীয় সাহিত্য বিস্তার প্রভৃতি' মহৎ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহোদয় উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। রামপুর-বোয়ালিয়া ইহার কার্য্যালয় ছিল। এই সমিতির অস্তিত্ব বোধ হয় বেশীদিন ছিল না। এই সমিতি হইতে প্রকাশিত 'কাঙ্গালের নিবেদন' শীর্ষক একখানি অতি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হয়। * * * * *

ইহা যে স্বয়ং শরচ্চন্দ্রের রচনা তাহাতে ভুল নাই। ইহার প্রথম ও

শেষ বাক্য দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝা যাইবে :—

(আরম্ভ)	(সমাপন)
সত্যবীর দাশরথি	উঠ তবে উঠ ভাই
	বিলম্বের কাজ নাই
জনমিয়া পুণ্যময়	সুশিক্ষা সাধন মন্ত্র
করেছিলে যেই দেশ,	ভারতে প্রচার কর,
আজি তথা হাহাকার	কুশিক্ষার ইন্দ্রজালে
অসত্যের অত্যাচার	আর থাকিও না ভুলে
অধর্ম্মের মহোৎসব	সুশিক্ষা সাধন কর
দুর্দ্দশার এক শেষ।	জড় ভাব পরিহর।

প্রকাশের সন তারিখ নাই। তবে ইহা 'শিক্ষাপরিচর সমিতি'র জন্মের বৎসর (শিক্ষাপরিচর পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসরে) প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঈদৃশ আরও পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

এই দ্বিতীয় বর্ষেরই "শিক্ষাপরিচর" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া "বঙ্গভাষার আশ্রয়ভিক্ষা" নামক প্রবন্ধ বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ (ডিসেম্বর ১৮৯০ ইং) মাসের শিক্ষাপরিচরে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

উপসংহারে ছিল—'বঙ্গবাসী দেশ হিতৈষী মহোদয়গণ আসুন * * * * একবার সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া দেখি, মাতৃভাষার জন্য তাহা উন্মুক্ত হয় কি না। * * আর আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে যিনি বর্ত্তমান সহকারী সদস্য (অর্থাৎ ভাইস্ চ্যান্সেলার)

তিনিও গুণে পূজনীয়, চরিত্রে বরণীয়, ও স্বদেশপ্রেমে অনুকরণীয়। অতএব আসুন আমরা সহস্র সহস্র বাঙ্গালী মিলিয়া মাতৃভাষার জন্য শত শত আবেদন উপস্থিত করি, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ক্রন্দন উপেক্ষা করিবেন না।'

তখন পুণ্যশ্লোক সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। ১২৯৭ সালের মাঘ মাসে (১৮৯১ ইং, ২৪শে জানুয়ারী তারিখে) কনভোকেশনে তদীয় বক্তৃতায় ছিল—'I also deem it not merely desirable, but necessary, that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their Kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worth study. * * * In laying stress upon the importance of the study of our Vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment, excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have a thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our Vernacular'.

পুণ্যাত্মা গুরুদাসের এই বাণী এখানেই পর্যবসিত হয় নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যে বঙ্গভাষার সমাদরলাভ হইয়াছে—তাহার মূলে তিনি কতটা যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন—ইহার বিবরণ দেখিতে হইলে, নব্যভারত ১৩২৩ সালের মাঘ সংখ্যায় "বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলন" প্রবন্ধ অথবা তাহা হইতে সমুদ্ধৃত হইয়া "প্রবাসীতে" (চৈত্র ১৩২৩) প্রকাশিত "কষ্টি পাথর" প্রকরণে "বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে?" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখিবেন।

আর সার গুরুদাসের এতদ্বিষয়ে দৃষ্টিআকর্ষণ যে শরচ্চন্দ্রই করিয়াছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলা আবশ্যক যে গুরুদাস বাবু "শিক্ষাপরিচর" পড়িতেন—দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকারই কভারে (তৃতীয় পৃষ্ঠায়) তাঁহার এই পত্রিকা সম্বন্ধে অভিমত আছে—"উদ্দেশ্য অতি সাধু, লেখা অতি সরল ও সুন্দর।"

"শিক্ষাপরিচর" সম্পর্কে আর একটি অনুষ্ঠানের সংবাদ আমরা পাইতেছি—তাহা "শিক্ষাতত্ত্ব সঙ্কলন।" ইহা ১৩০১ সালে পুনর্জ্জীবিত "শিক্ষাপরিচরে" প্রথম সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। অধ্যাপক কলডারউড (Calderwood) লিখিত "On teaching—its ends and means" নামক নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ। পরে উহা "অধ্যাপন" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার বাল্যশিক্ষক বাবু হরিনাথ দাস মহাশয়ের নামে ঐ পুস্তক উৎসর্গ করা হইয়াছিল। উৎসর্গপত্রখানি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় (পদ্যে) লিখিত হইয়াছিল—দূরদেশে সঙ্গিহীন বিদেশী এক বালক অনাহারে অনিদ্রায় রোগশীর্ণ দেহে কিরূপে এই শিক্ষক মহাশয়ের সুমধুর আশ্বাসবাণী লাভে কৃতার্থ হইয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য—ইহা শরচ্চন্দ্রেরই বাল্য-জীবনের কথা। ইহা "শিক্ষাতত্ত্ব-সঙ্কলন প্রথম সংখ্যা" রূপে প্রচারিত হয়। ঐ সিরিজের দ্বিতীয় সংখ্যা ছিল "জর্ম্মন উচ্চশিক্ষা"—মেথু আরনলড্ কৃত। এই সংখ্যা প্রকাশের সন তারিখ নাই এবং ইহাতে "শিক্ষাপরিচর হইতে পুনর্মুদ্রিত' এ কথাও লিখিত হয় নাই; কেবল আছে "অনুবাদক শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, শিক্ষাপরিচ -সম্পাদক," কিন্তু তখন বোধ হয় "শিক্ষাপরিচর" খানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

ইহা তাঁহার "দাদামহাশয়"—লালনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামধেয় ব্যক্তি বিশেষের নামে মর্ম্মস্পর্শী পদ্যে স্নেহের প্রতিদানস্বরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

"শিক্ষাপরিচর" খানি দুই বারে মোট পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল। প্রথমতঃ তিন বৎসর কথমপি চলিয়া অধিকাংশ গ্রাহকের মূল্য অনাদায় হেতু উঠিয়া যায়। * * দ্বিতীয়তঃ যখন পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন "জনৈক সদ্বংশজাত সুশিক্ষিত বড়লোক" অযাচিতভাবে অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। তাঁহার নাম অপ্রকাশিত রহিয়াছে। কিন্তু নানাকারণে অনুমান করা যায় যে, ইনি উত্তরপাড়ার জমীদার বংশের কেহ হইবেন। তখন শরৎ বাবু পুঁটিয়া ছাড়িয়া উত্তরপাড়াতেই অবস্থান করিতেছিলেন।

৩। বর্ণশিক্ষা প্রণালী ১ম ও ২য় ভাগ ও বর্ণশিক্ষা পরিশিষ্ট। বর্ণশিক্ষা প্রণালী প্রথম ভাগ যে কখন লিখিত হইয়াছিল অধুনা প্রাপ্তব্য সংস্করণের মুখবন্ধাদিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় ভাগখানি ১৩০১ (ইং ১৮৯৫) সনে (মাঘ মাসে) উত্তরপাড়ায় থাকিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'মুখবন্ধ' হইতে জানা যাইতেছে। 'পরিশিষ্ট'—ইহার সাত বছর পরে স্বীয় জন্মস্থান (বেগমপুর—শ্রীহট্ট) হইতেই প্রকাশ করা হইয়াছিল। প্রত্যেকখানির "মুখবন্ধ" শিক্ষাব্যবসায়ীর পড়িবার জিনিষ — দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে অধিকন্তু শিক্ষকের প্রতি যে নিবেদন ছিল তাহা 'শিক্ষাপরিচর' সম্পাদকের সম্যক উপযুক্তই হইয়াছিল।

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে ভিক্টর হিউগোর যথাক্রমে এই দুই বাণী উদ্ধৃত ছিল :—"The two important functionaries of the State are the nurse and the school-master" এবং "The future of mankind is in the hand of the school-master,"

গ্রন্থকার তাঁহার এই বর্ণশিক্ষায় (১ম ও ২য় ভাগে) যে নীতি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় ভাগের 'মুখবন্ধের" উপসংহারে আছে—

"কথাগুলি কাজের জিনিষ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে।

সাধারণ লোক দরিদ্র সুতরাং লেখাপড়া শিখিলেই গাড়ীঘোড়া চড়িবে আর বড় লোক হইবে, একথা বলিয়া তাহাদের সন্তানদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলা নিরাপদ মনে করি নাই; বরং শ্রমে যে মহত্ত্ব এবং দারিদ্র্যেও যে সুখশান্তি আছে, সুযোগ পাইলে সে কথাটি বলিতে ছাড়ি নাই।"

দুই ভাগ বর্ণশিক্ষাপ্রণালী শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে পাঠ্যরূপে বহুদিন প্রচলিত ছিল। পাঠ্য হইবার পর শিশুদের মনোরঞ্জনার্থ চিত্র সংযোজিত হয় এবং দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্তবর্ণের সমধিক অনুশীলনার্থ প্রত্যেক পাঠের পর অনেক শব্দ যোজনা করিয়া দেওয়া হয়।

প্রথমভাগখানির উপস্বত্ব গ্রন্থকারের পত্নীর স্মরণার্থ "মুক্তকেশী-ভাণ্ডার" গঠনে বিনিযুক্ত হয়। "বঙ্গবাসিনী মহিলাদিগের সংস্কৃতশিক্ষা ও শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য অনুষ্ঠানে" ইহা ব্যয়িত হইবার বিধান হয়। মুক্তকেশী বালিকাবিদ্যালয় একটি সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঐ ভাণ্ডার সংস্থাপনের পরে বোধ হয় পাঠ্যপুস্তকরূপে ইহা আর বেশী দিন না চলাতে ভাণ্ডার ও ঐ বিদ্যালয় উভয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে।

এখন পাঠ্য-নির্ব্বাচন রীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সরকারের অর্ডার মতে পুস্তক তৈয়ার হয় এবং তাহা পাঠ্যতালিকায় স্থান পায়। তাই বর্ণশিক্ষাপ্রণালী এখন আর পাঠ্য নাই—কিন্তু তথাপি নিজগুণে ইহা (অন্ততঃ দ্বিতীয় ভাগখানি) এখনও কোনও কোনও স্থানে চলিতেছে।

বর্ণশিক্ষা-পরিশিষ্ট ছাত্রদের জন্য লিখিত হয় নাই, তবে ইহাতে শিক্ষকগণ কিরূপে ছাত্রগণের উচ্চারণগত দোষ এবং শব্দপ্রয়োগে ভুল সংশোধন করিবেন, তাহা অতি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "বানান সমস্যা" প্রভৃতি লিখিত হইবার বহু পূর্ব্বে শরৎ বাবু

এইখানি লিখিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এখন আর পুস্তকখানি পাওয়া যায় না।

৪। **দেবীযুদ্ধ**—শকুন্তলা যেমন কালিদাসের—দেবীযুদ্ধও তেমনি শরচ্চন্দ্রের "সর্ব্বস্ব"। এই মহাকাব্য শরৎ বাবু স্বীয় জন্মস্থানে—বেগমপুরে থাকিয়াই রচনা করিয়াছিলেন—এবং পিতামাতার নামে ইহা উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গপত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত—অন্যত্র কুত্রাপি তিনি এই ছন্দের অবতারণা করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না। ইহাতে গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে এই আছে :—

> "তোমারি রোপিত এই বকুলের তলে
> হে পিতঃ! নিরাশ প্রাণে সজল নয়নে
> রুদ্ধকণ্ঠে বিকম্পিত লেখনী ধরিয়া—
> অস্পষ্ট প্রাণের কথা এই যে বলিছি"—

ইত্যাদি; কিন্তু কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন কিছুই ঐ উৎসর্গ ব্যপদেশে লিখিত 'নিবেদনে' পাওয়া যায় না।

"দেবীযুদ্ধের" সমালোচনা অনেকই হইয়াছিল—তন্মধ্যে প্রদীপ (১৩০৮, মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায়) শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সি. আই. ই, মহোদয় লিখিত সমালোচনা এবং 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় প্রকাশিত পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের অভিমত, এই দুইটিই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় পণ্ডিতরাজের লেখাটুকু এখন দুষ্প্রাপ্য। তাহাতে তিনি তিন চন্দ্রের (হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রের) তুলনায় আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরীক্ষায় কেবল শরচ্চন্দ্রই উত্তীর্ণ। কারণ (যতটা স্মরণ হয়) এই যে শরচ্চন্দ্রের রচনায় ছন্দঃ ও অলঙ্কারগত এবং শব্দাদির প্রয়োগ বিষয়ে কোনও দোষ পরিলক্ষিত হয়

নাই। এই অনন্যসুলভ তাল-মান-লয় বিশুদ্ধতাই পণ্ডিত-রাজের তাদৃশ উচ্চ প্রশংসার বিষয় ছিল। 'দেবীযুদ্ধ' এখন আর পাওয়া যায় না—নিঃশেষে বিক্রীত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজনের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কবির জীবদ্দশায় তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। শুনিয়াছি ঐ দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য একটা মুখবন্ধ না কি তিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

৫। **শ্রীহট্টস্থ মহাপীঠের প্রকাশ**—ইং১৯০৩ সনের জুন মাসে পরিদর্শক পত্রে প্রবন্ধাকারে ইহা প্রকাশিত হয়, তাহার পরে পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। নামেই ইহার পরিচয়; গোটাটিকর জৈনপুরে ঐ সময় সর্ব্বানন্দ ভৈরব, মহালক্ষ্মী ভৈরবী প্রকটিত হইবার বিবরণ প্রমাণাদি সহ সাধক শরচ্চন্দ্র প্রকাশিত করেন। ঐ পুস্তিকাখানিও এখন দুষ্প্রাপ্য, তবে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রণীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ, প্রথম ভাগ, ৯ম খণ্ড তীর্থস্থান প্রসঙ্গে শরৎ বাবুর প্রবন্ধের অনেকটা উদ্ধৃত হইয়াছে। (১০৬-১১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৬। Boys, Daily Companion (বালকের দৈনিক সহচর) **being a direct** communicator between the Teacher and the guardian about the daily, monthly and yearly progress, attendance, comparison etc. of the school boy by an Experienced Teacher. এইখানি বোধ হয়, ইং ১৯০৫ কি ১৯০৬ সনে প্রকাশিত হয়। (ইহাতে সন তারিখ নাই)

* * * *

৭। **নীতিহারঃ**। সংস্কৃত শ্লোকসমষ্টি। দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত। শরচ্চন্দ্র যে বাঙ্গালা কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি সংস্কৃতেও সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। "নীতিহারের

সমস্ত শ্লোকই তাঁহার স্বরচিত। এ গুলি চাণক্য-শ্লোকের ন্যায় অষ্টোত্তর শত শ্লোকাত্মক কোষকাব্য এবং তাদৃশ নীতিশিক্ষার সহায়ক। ইহা সুবিখ্যাত পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ পত্রের তারিখ ১৮৩০ শকাব্দা— বাঙ্গালা ১৩১৫ সাল, ইংরাজী ১৯০৮। কিন্তু আমরা ইহা এই সেদিন মাত্র দেখিতে পাইয়াছি।

নমুনা স্বরূপ প্রথম শ্লোকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"স্বধর্ম্মং চিন্তয়েন্নিত্যং নিত্যং কর্ম্মাবধারয়েৎ।
বিবেকং বোধয়েন্নিত্যং নিত্যং শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ।"

৮। **পল্লীব্যবস্থা**:—১৩১৮ (ইং ১৯১১) সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এখানি নব-পর্য্যায়ের "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ - ঐ প্রবন্ধ আবার তৎপূর্ব্বে রাজসাহী শাখা সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন বিশেষে পঠিত হইয়াছিল।

ইহাতে পল্লীসমিতি গঠনের উপদেশ দেওয়া আছে এবং ইহার কাজই বা কি হইবে, তাহার ব্যবস্থা আছে। উপসংহারে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে রাজপুরুষদিগের মুখের দিকে না তাকাইয়া লোকসাধারণ নিজ নিজ উন্নতির ব্যবস্থা নিজেরাই করিবে, ইহাই তাঁহার উপদেশ।

"অতএব যে পর্য্যন্ত আপনার ব্যবস্থা আপনি না বুঝিবে, এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত রাজা কি ধনী কেহই তাহার দুর্দ্দশা দূর করিতে পারিবেন না। প্রজাকে এই সাধনে যিনি যে পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন, তাঁহারু দানবহিতৈষিতা

সেই পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইবে, তাঁহার দেশহিতৈষী নাম সেই পরিমাণে সার্থক হইবে।"

৯। ব্রহ্মচর্য্য—শিলচরে একবার একটা সাহিত্য ও সমাজ সেবার আয়োজন হয়; সেখানে "এরিয়েন্ প্রেস" সংস্থাপিত হইয়া "সুরমা" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়—সৎসাহিত্যের প্রকাশার্থও প্রযত্ন হয়। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক "শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল" সঙ্কলিত এবং শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক "ব্রহ্মচর্য্য" লিখিত হইয়া প্রকাশিত হয়। "ব্রহ্মচর্য্য" ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইলেও অতিশয় উপাদেয় হইয়াছিল। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত, প্রথমতঃ তাহা বিবৃত করিয়া কলিতে কেবল শুক্রধারণই যে ব্রহ্মচর্য্য - এ কথা বলিয়া, আজীবন ব্রহ্মচারী শরৎ বাবু ইহা কিরূপে সম্ভাবিত ও অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে কেবল শরৎ বাবুর প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এ ছাড়া তিনি নানা পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন নানা সভায় বহু বক্তৃতা লিখিত ও অলিখিত) দিয়াছেন—সে সব একত্র সঙ্কলিত হইতে পারিলে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইত। দৃষ্টান্তস্থলে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

(১) সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক কনফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ। (২) শ্রীহট্ট সাহিত্য সম্মিলনের করিমগঞ্জ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। (৩) শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। (৪) একখানি পুস্তক সমালোচনা, বঙ্গদেশে হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত "দীক্ষা ও সাধনা" বিষয়ক প্রবন্ধ। (৫) ঐতিহাসিক চিত্রে প্রাকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ

"ভবানীপুরের ভবানী মাতা"। (৬) কুঞ্জলাল গুপ্ত প্রণীত "মধুকুপা বা জীবনযজ্ঞ" পুস্তকের ভূমিকা। (৭) অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রামপ্রসাদ" গ্রন্থের ভূমিকা। (৮) 'আত্মশুদ্ধি' (অমুদ্রিত নিবন্ধ)। (৯) "স্বাস্থ্যরক্ষায় মূল মন্ত্র"। (১০) "ভারত লক্ষ্মীর উৎসাহ দান"। (১১) 'অনল-তর্পণ।' (১২) "প্রায়শ্চিত্ত" ইত্যাদি।

মহাত্মা শরচ্চন্দ্র কৃত :—

১। মহাপূজা — ।০ চারি আনা।
২। নীতিহার (সংস্কৃত) — ৵০ দুই আনা।
৩। ব্রহ্মচর্য্য — ৵০ দুই আনা।
৪। পল্লীব্যবস্থা — ৴১০ দেড় আনা।

(এই কয়খানি পুস্তিকার অল্প সংখ্যা মাত্র বাকী আছে)

(১) সুবাক্য ভাণ্ডার (২) অঞ্জলি—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
(৩) 'দেবীবুদ্ধ' প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বর্ণশিক্ষাপ্রণালী, ১ম, ও ২য় ভাগ এবং পরিশিষ্ট আবশ্যক হইলে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—

কলিকাতায় এজেন্ট—(১) মনমোহন লাইব্রেরী।
নং ২০৩।২, নং ১৯৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসামের এজেন্ট—(২) কুলজা সাহিত্য—মন্দির।
৩০ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।